আরিফ

জীববিজ্ঞান

১ম খণ্ড

জীবনের রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি

প্রথম সংস্করণ

প্রচ্ছদ ছবি

প্রচ্ছদ ছবিতে একটি উজ্জ্বল জেব্রাফিশ (Zebrafish) প্রদর্শিত হয়েছে। মাছটির দেহ অন্ধকার পটভূমির মধ্যে উজ্জ্বল, নিয়ন সবুজ আলোর মতো দীপ্তিমান, যা তাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। তার শরীরের স্বচ্ছতা এবং ভেতর থেকে জ্বলে ওঠা আলো জীবপ্রযুক্তির আধুনিক প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে। এই আলোকোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি স্বাভাবিক নয়; বরং নির্দিষ্ট জিন (Gene) সংযোজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে মাছটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি অন্ধকার পরিবেশে এটি জ্বলজ্বল করে। ছবিটি জীববিজ্ঞানের জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering), আণবিক পরিবর্তন এবং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির (Biotechnology) শক্তিশালী প্রয়োগের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

জেব্রাফিশ (*Danio rerio*) বাংলাদেশের স্থানীয় মাছ, এছাড়াও এটি ভারত, নেপাল, পাকিস্তান এবং মায়ানমারের মতো অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও পাওয়া যায়। এর প্রাকৃতিক আবাসস্থল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত। এই অঞ্চলে মাছটি সাধারণত অগভীর, ধীর গতিশীল বা স্থির পানির জায়গা যেমন খাল, বিল, পুকুর এবং ধান ক্ষেতে বাস করে। বাংলাদেশের প্লাবিত অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে, বন্য জেব্রাফিশের দেখা মেলে।

জেব্রাফিশ (*Danio rerio*) প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করেন স্কটিশ চিকিৎসক ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন (Francis Hamilton), ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত তাঁর ১৮২২ সালের গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনায় “নীল ও রুপালি ডোরাযুক্ত সুন্দর মাছ” হিসেবে উল্লেখিত এই প্রজাতিটি পরবর্তীতে *Cyprinus* এবং *Brachydanio* সহ বিভিন্ন ল্যাটিন নামের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে *Danio rerio* নামে স্বীকৃত। "জেব্রাফিশ" নামটি এসেছে মাছটির শরীরে থাকা ডোরাকাটা দাগ থেকে, যা জেব্রা প্রাণীর গায়ের ডোরাকাটা দাগের মতো দেখতে। মাছটির বৈজ্ঞানিক গণ নাম (*Danio*) এসেছে মূলত "ধানি" শব্দটি থেকে। বাংলা "ধানি" শব্দের অর্থ হলো "ধান ক্ষেতের", যা মাছটির প্রাকৃতিক আবাসস্থল অগভীর পুকুর বা ধান ক্ষেতের পানির কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯৬০-৭০-এর দশকে ইউনিভার্সিটি অব ওরেগনের (University of Oregon) জর্জ স্ট্রাইসিঞ্জার (George Streisinger) পরীক্ষাগারে জেব্রাফিশের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তুলেন। বর্তমানে জেব্রাফিশ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গবেষণাগারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জীব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জেব্রাফিশের মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ জিন শনাক্ত হয়েছে, মানব রোগের কার্যপ্রণালী বোঝা গেছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে জৈব-চিকিৎসা গবেষণায় এর ভূমিকা আরও বিস্তৃত হবে।

ভূমিকা

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

জীববিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা জীবনের রহস্য, জীবের কাজ, গঠন, বৃদ্ধি, উৎপত্তি এবং তাদের জীবনপ্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করে। আধুনিক জীববিজ্ঞান আজ কেবল জীব ও তাদের গঠন নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আণবিক স্তর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবমণ্ডলের কার্যক্রম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ও দ্রুত বিকাশমান বিষয়কে সহজ, প্রাঞ্জল এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এই বই রচিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি (Genetic Engineering and Biotechnology) বিভাগে স্নাতক পড়ার সময় আমি প্রথমবারের মতো *র‍্যাভেন বায়োলজি (Raven Biology)* এবং *ক্যাম্পবেল বায়োলজি (Campbell Biology),* জীববিজ্ঞানের উপর ইংরেজিতে লেখা, বই দুইটি পড়ি। *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* এবং *র‍্যাভেন বায়োলজি* উভয়ই বিশ্বজুড়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সর্বাধিক পঠিত ও প্রামাণ্য দুটি পাঠ্যপুস্তক। স্নাতক বা উচ্চতর জীববিজ্ঞানের ধারণাকে সহজ ও সাবলীলভাবে বুঝতে এই বই দুটির বিকল্প নেই। *র‍্যাভেন বায়োলজির* কিছুটা অংশ বিভাগের প্রথম বর্ষে আমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল। আর চতুর্থ বর্ষে থাকাকালীন *ক্যাম্পবেল বায়োলজি (Campbell Biology)* পড়া হয়েছিল জীববিজ্ঞানের উপর বিষয়ভিত্তিক জিআরই (Subject GRE) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। বিষয়ভিত্তিক বা সাবজেক্ট জিআরই হলো একটি বিশেষায়িত পরীক্ষা, যা আমেরিকা, কানাডা বা অন্যান্য দেশে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে, যেমনঃ গণিত, পদার্থবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানে কতটুকু দক্ষতা এবং জ্ঞানের গভীরতা আছে তা যাচাই করার জন্য নেওয়া হত। বাংলাদেশে তখন এই পরীক্ষাটি দেয়া যেত না, ইন্ডিয়া গিয়ে দিতে হত।

ঢাবির বিজ্ঞান গ্রন্থাগার থেকে *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* বইটি নিয়ে পড়েছিলাম। বইটির সরল বর্ণনা, গভীরতা ও স্পষ্টতা আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল, যা আমাকে বাংলায় একটি অনুরূপ জীববিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনা বা অনুবাদ করার অনুপ্রেরণা দেয়। যদিও স্নাতক শেষ করার পর থেকে আমি জীববিজ্ঞানের উপর একটি পাঠ্যপুস্তক লেখার কথা ভেবেছি, কিন্তু এমন একটি বৃহৎ ও বিস্তারিত পাঠ্যপুস্তক লেখা বা অনুবাদ করা একজন ব্যক্তির জন্য ছিল বিশাল এবং কঠিন একটি কাজ। *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* ও *র‍্যাভেন বায়োলজি* রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায় দুইশ লোক জড়িত ছিল। তবে সৌভাগ্যবশত, বর্তমানে ইন্টারনেটে আধুনিক ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি নতুন করে আশা জুগিয়েছে। এগুলোর সাহায্যে, বাংলায় *র‍্যাভেন বায়োলজি* ও *ক্যাম্পবেল বায়োলজির* মত একটি আধুনিক জীববিজ্ঞানের বই লেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

র‍্যাভেন বায়োলজি ও *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* বই দুইটি মূলত আটটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড একঃ জীবনের রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি (The Chemical and Molecular Basis of Life); দুইঃ কোষ (Cell); তিনঃ বংশাণুবিজ্ঞান (Genetics); চারঃ বিবর্তন (Evolution); পাঁচঃ জৈব বৈচিত্র্য (Biological Diversity); ছয়ঃ উদ্ভিদের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া (Plant Form and Function); সাতঃ প্রাণীর গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া (Animal Form and Function); আটঃ বাস্তুবিজ্ঞান (Ecology)। এই খন্ডগুলো আধুনিক জীববিজ্ঞানের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এই বইতে *ক্যাম্পবেল বায়োলজি ও র‍্যাভেন বায়োলজির* যেসমস্ত বিষয়গুলো ইন্টারনেটে উন্মুক্তভাবে পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করে মূলত, “জীবনের রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি”, প্রথম খণ্ডটি অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই

খণ্ডে জীবনের রাসায়নিক সংগঠন, জৈব অণু, কোষের আণবিক কার্যক্রম এবং জীবনের মৌলিক জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হয়েছে, যা জীববিজ্ঞানের অন্যান্য জটিল বিষয়সমূহ বোঝার জন্য ভিত্তি (Foundation/Primer) হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞানের লেখাগুলো আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে তার প্রাঞ্জলতা হারায়, তাই এই বইয়ে মূলত ভাবানুবাদ করা হয়েছে বা বলা যেতে পারে বইটি *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* এবং *র‍্যাভেন বায়োলজি*-এর আদলে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিষয়বস্তু অনেকক্ষেত্রে নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বইয়ের লেখনী প্রধানত *ক্যাম্পবেল বায়োলজি* গ্রন্থের ভাবনা, বিন্যাস এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। পাশাপাশি বিভিন্ন অধ্যায়ে *র‍্যাভেন বায়োলজি* সহ অন্যান্য আধুনিক জীববিজ্ঞানের উৎস থেকেও ধারণা ও ব্যাখ্যার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

যদিও বইটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে পাঠক স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিষয়গুলো বুঝতে পারেন, তবুও একজন শিক্ষক বা জীববিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কারো তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করলে বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা সহজ হবে। বইটির লেখাগুলো মূলত হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য। অবশ্য যারা জীববিজ্ঞানে আগ্রহী, শিখতে বা শিক্ষাদানের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রাসঙ্গিক লেখনী খুঁজছে, এবং গবেষণাকে পেশা হিসেবে নিতে চায়, তারাও এই বইটি থেকে উপকৃত হতে পারে। এই বইয়ের লেখাগুলো বোঝার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, রসায়ন, পদার্থ, এবং জীববিজ্ঞান জানা জরুরি। পাঠকের বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্য বইটির অনেক স্থানে বাংলা ও ইংরেজি শব্দ বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার পড়ার সময় সাবলীল পাঠের সুবিধার্থে পাঠক চাইলে সেসব বন্ধনীর শব্দ সাময়িকভাবে উপেক্ষা করা যেতে পারে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বইয়ের কিছু শব্দ, পরিভাষা এবং বাক্য ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এটি কোনো সম্পাদনাগত ত্রুটি নয়; বরং শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুগুলো আরও সহজে বুঝতে, গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো মনে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদে আয়ত্ত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। শিক্ষণ ও স্মৃতিধারণের (Memorization) ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি একটি কার্যকর পদ্ধতি, এবং সেই বিবেচনায় বইটির বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে।

বিজ্ঞানের কোনও লেখা সাধারণত মৌলিক নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক যেকোনো লেখা সর্বদাই তার পূর্বের লেখার উপর নির্ভরশীল। সাহিত্যিকরা সাধারণত তাদের লেখাকে জটিল শাব্দিক কারুকার্য দিয়ে অলংকৃত করেন, কিন্তু বিজ্ঞানীদের লেখার মুল উদ্দেশ্য থাকে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে সহজে উপস্থাপন করা। এই বইটির ভাষা এমনভাবে নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং জীববিজ্ঞানে আগ্রহী সাধারণ পাঠক সবাই উপকৃত হতে পারেন। জটিল ধারণাগুলোকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে পাঠক আন্তর্জাতিক জীববৈজ্ঞানিক ভাষার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারেন।

বইটি সম্পর্কিত পাঠকদের যেকোনো গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ পাঠানো যাবে এই ইমেল -এ: arifbiology@gmail.com। বর্তমান সংস্করণটি বইটির একটি খসড়া সংস্করণ (Draft/Beta Edition)। ভবিষ্যতে বিষয়বস্তুর সম্পাদনা, ভাষাগত পরিমার্জন, ও পাঠকদের মতামতের ভিত্তিতে এটি সংশোধন ও উন্নত করা হবে। আশা করা যায়, সম্পাদিত ও পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ খুব শিগগিরই প্রকাশিত হবে। আমার বিশ্বাস, বইটি অর্থাৎ এই ১ম খণ্ডটি, শুধু জীবনের রাসায়নিক ও আণবিক ভিত্তি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে না, বরং জীববিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতেও ভূমিকা রাখবে।

র‍্যাভেন বায়োলজি ও *ক্যাম্পবেল বায়োলজির* মত প্রামাণিক, সুগভীর, বিস্তৃত ও সহজবোধ্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক বই কোনো লেখকের একার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে রচনা করা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই

ধারাবাহিকের আরও এক বা দুইটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা রাখছি। তবে ভবিষ্যতে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও গবেষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য খণ্ডসমূহ রচিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে।

এই বই রচনার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক মানুষের অবদান, উৎসাহ ও সহযোগিতা রয়েছে। সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁর অনুগ্রহ, দয়া ও শক্তি ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আমার পরিবারকে বিশেষ ধন্যবাদ, যাঁদের ভালোবাসা, ধৈর্য, সমর্থন এবং উৎসাহ এই দীর্ঘ কাজের পথে আমাকে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে। আমার শিক্ষকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, যাঁদের জ্ঞান, দিকনির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণা আমার চিন্তাভাবনা ও শিক্ষাজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। জীববিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা গড়ে তুলতে তাঁদের অবদান অপরিসীম। বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ, আলোচনা এবং মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে পাশে ছিলেন। এছাড়াও, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিনীত -

ডঃ মাহমুদ আরিফ
২৯ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মাহমুদ আরিফ, এমএস, এমফিল, পিএইচডি (জীববিজ্ঞান)
সহকারী অধ্যাপক (গবেষণা)
মেডিসিন বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় শিকাগো
৮৪০ সাউথ উড স্ট্রিট, ল্যাব নং–১১৩৩, অফিস নং–১১৪০
শিকাগো, ইলিনয়, ৬০৬১২
ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (ইউএসএ/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: জীববিজ্ঞানঃ জীবনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। - ১
(Biology: The Scientific Inquiry of Life)

১.১ জীবনের অধ্যয়ন – জীববিজ্ঞান। - ৩
১.২ জীবনকে সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। - ৩
১.৩ জীববিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিজ্ঞান। - ৬
১.৪ জীবনের মৌলিক ধারণাসমূহ। - ৭
১.৪.১ জীবিত ব্যবস্থাগুলো শ্রেণীবদ্ধ এবং অনুক্রমিকভাবে সংগঠিত হয়। - ১০
১.৪.২ গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। - ১৪
১.৪.৩ জীবিত ব্যবস্থা শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর করে। - ১৬
১.৪.৪ জীবন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের অধীন। - ১৭
১.৪.৫ জীবিত ব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে। - ১৮
১.৪.৬ জীবিত ব্যবস্থা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। - ২৪
১.৪.৭ বিবর্তন জীবনের ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে। - ২৯

অধ্যায় ২: বিজ্ঞানের স্বরূপ। - ৪৫
(The Nature of Science)

২.১ বিজ্ঞানের প্রকৃতি বা সরূপ। - ৪৭
২.২ প্রকৃতিকে বা জীবদেরকে অধ্যয়নের সময়, বিজ্ঞানীরা অনুকল্প (Hypothesis) তৈরি করেন এবং তা পরীক্ষা করেন। - ৪৭
২.৩ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল হচ্ছে অনুকল্প তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা। - ৫২
২.৪ একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। (A Scientific Inquiry) – ৫৬
২.৫ বিজ্ঞান বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একে-অপরের সহযোগিতা থেকে লাভবান হয়। - ৬০
২.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ। (Science, Technology, and Society) – ৬৩

অধ্যায় ৩: জীবনের রাসায়নিক প্রেক্ষাপট। - ৬৭
(The Chemical Context of Life)

৩.১ পদার্থ (Matter)। - ৬৯
৩.২ মৌলের গুণাবলি ও পরমাণুর গঠন। - ৭২
৩.৩ রাসায়নিক বন্ধন ও যৌগ গঠন। - ৮১
৩.৪ রাসায়নিক বিক্রিয়া। - ৯১
(Chemical Reactions)

অধ্যায় ৪: পানি এবং জীবন। - ৯৬
(Water and Life)

৪.১ পানিঃ জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য (Vital) যৌগ। - ৯৮
৪.২ পানির অণুতে মেরু সমযোজী (Polar Covalent) বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি করে। - ৯৮
৪.৩ পানির চারটি উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) পৃথিবীতে জীবনের উপযোগিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। - ৯৯
৪.৪ পানির অম্লীয় (Acidic) ও ক্ষারীয় (Basic) অবস্থা জীবের শারীরিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে। - ১১০

অধ্যায় ৫: কার্বন এবং জীবনের আণবিক বৈচিত্র্য। - ১১৯
(Carbon and the Molecular Diversity of Life)

৫.১ জীবনের উৎপত্তিতে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) গুরুত্বপূর্ণ। - ১২১
৫.২ কার্বন (Carbon) পরমাণু চারটি অন্যান্য পরমাণুর সাথে বন্ধন (Bond) গঠন করে বৈচিত্র্যময় (Diverse) অণু তৈরি করতে পারে। - ১২১

৫.৩ অণুর কার্যকারিতার জন্য কয়েকটি রাসায়নিক কার্যকরী মূলক (Chemical Functional Groups) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। - ১২৯

অধ্যায় ৬: বৃহৎ জৈব অণুর গঠন ও কার্যাবলি। - ১৩৮
(The Structure and Function of Large Biological Molecules)

৬.১ ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) বা বৃহৎ জৈব অণুগুলি পলিমার (Polymer), যা মনোমার (Monomer) দিয়ে গঠিত। - ১৪০

৬.২ কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং গঠনমূলক উপাদান হিসেবেও ভূমিকা রাখে। - ১৪২

৬.৩ লিপিড (Lipid) বা চর্বি জাতীয় পদার্থ হলো জলবিমূখ বা হাইড্রোফোবিক অণুর একটি বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী। - ১৪৯

৬.৪ প্রোটিন (Protein) বা আমিষ জাতীয় পদার্থ বিভিন্ন ধরনের গঠন ধারণ করে, যার ফলে এদের কার্যাবলিও অত্যন্ত বহুবিধ। অর্থাৎ, প্রোটিন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। - ১৫৮

৬.৫ নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) বংশগত তথ্য সংরক্ষণ, পরিবহন এবং প্রকাশে সহায়তা করে। - ১৭৭

৬.৬ জিনোমিক্স (Genomics) ও প্রোটিওমিক্স (Proteomics) জৈববৈজ্ঞানিক গবেষণা ও এর প্রয়োগকে আমূল পরিবর্তন করেছে। - ১৮৫

পাঠ নির্দেশিকা

- বইটি শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বইটির বিষয়বস্তু এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটি অধ্যায়ের ধারণা পরবর্তী অধ্যায় বুঝতে সাহায্য করে। অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও ধারণা প্রথম দিকের অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা পরবর্তী বিষয়গুলো বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাঝখান থেকে বা এলোমেলোভাবে পড়া শুরু করলে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। ধাপে ধাপে শুরু থেকে পড়লে বইটির বিষয়গুলো আরও সহজে, স্পষ্টভাবে এবং গভীরভাবে বুঝা যাবে।

- বইয়ের বিষয়গুলো বোঝার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, রসায়ন, পদার্থ, এবং জীববিজ্ঞান জানা জরুরি। বইটির অনেক স্থানে বাংলা ও ইংরেজি শব্দ বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার পড়ার সময় সাবলীল পাঠের সুবিধার্থে সেসব বন্ধনীর শব্দ সাময়িকভাবে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

- জীববিজ্ঞানের শিক্ষক বা জীববিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কারো তত্ত্বাবধানে বইটি অধ্যয়ন করলে বইটির বিষয়গুলো বোঝা সহজ হবে।

অধ্যায় ১

জীববিজ্ঞানঃ জীবনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। (Biology: The Scientific Inquiry of Life)

এই অধ্যায়ের মূল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

১.১ জীবনের অধ্যয়ন – জীববিজ্ঞান।

১.২ জীবনকে সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

১.৩ জীববিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিজ্ঞান।

১.৪ জীবনের মৌলিক ধারণাসমূহ।

১.৪.১ জীবিত ব্যবস্থাগুলো শ্রেণীবদ্ধ এবং অনুক্রমিকভাবে সংগঠিত হয়।

১.৪.২ গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে।

১.৪.৩ জীবিত ব্যবস্থা শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর করে।

১.৪.৪ জীবন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের অধীন।

১.৪.৫ জীবিত ব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে।

১.৪.৬ জীবিত ব্যবস্থা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

১.৪.৭ বিবর্তন জীবনের ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে।

চিত্র ১: জীবের দেহের রং ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রায়ই তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ফল, যা তাদের শিকারির দৃষ্টি এড়াতে এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার সমুদ্রতীরবর্তী উজ্জ্বল সাদা বালুর টিলা এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সৈকতঘাসের পরিবেশে বসবাসকারী এই ইঁদুর (Beach Mouse, *Peromyscus polionotus*)-এর শরীরের হালকা ও ছোপছোপ সাদা বর্ণ তাকে তার আবাসস্থলের সঙ্গে মিশে যেতে সাহায্য করে। একই প্রজাতির যেসব ইঁদুর কাছাকাছি লোকালয়ে বাস করে, তাদের দেহের রং তুলনামূলকভাবে অনেক গাঢ় বাদামি হয়। এই গাঢ় বর্ণ তাদের আশপাশের মাটি ও উদ্ভিদের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন বর্ণের ইঁদুরগুলো কীভাবে জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলোকে তুলে ধরে?

সৈকত বা সমুদ্রতীরের ইঁদুর

দীর্ঘ সময় ধরে **প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে সংঘটিত বিবর্তনের** ফলে এই দুই ধরনের ইঁদুরের লোমের রং তাদের নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। এর ফলে তারা শিকারিদের দৃষ্টি এড়িয়ে বেশি সুরক্ষা লাভ করে।

স্থলভাগের ইঁদুর

একটি ইঁদুরের জৈবিক সংগঠনের **প্রতিটি স্তর সংগঠিত** এবং এর **গঠন তার কার্যকারিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ**।

কোষের **ডিএনএ-তে (DNA) সঞ্চিত বংশগত বা জিনগত তথ্য** ইঁদুরের লোমের রং নির্ধারণ করে।

সূর্য থেকে আগত শক্তি (Energy) উদ্ভিদের মাধ্যমে ইঁদুরের দেহে যায়। অন্যদিকে পদার্থ (Matter) ইঁদুর এবং তার পরিবেশের মধ্যে ক্রমাগত চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এভাবে **জীবিত ব্যবস্থা শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর** করে এবং এক্ষেত্রে **রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়ম** মেনে চলে।

উদ্ভিদ ইঁদুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ইঁদুর আবার বাজপাখির শিকারে পরিণত হয়। এভাবে জীবেরা একটি বাস্তুতন্ত্রে **পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে** যুক্ত থাকে।

১.১ জীবনের অধ্যয়ন - জীববিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান (Biology) হল আমাদের চারপাশের জীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন। জীববিজ্ঞান শব্দটি গ্রিক শব্দ βίος (bíos, *বায়োস*) যার অর্থ জীবন (Life) এবং λογία (logia, *লোগিয়া*) যার অর্থ অধ্যয়ন (Study) থেকে উদ্ভূত। এটি বিজ্ঞানের একটি শাখা যা জীবনের মধ্যকার যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, কাঠামো, কার্যকারিতা, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, বিবর্তন, এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। জীববিজ্ঞান হচ্ছে জীব এবং জড়ের রসায়নের অধ্যয়ন। জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ, প্রাণ আছে বা প্রাণহীন বস্তু, এবং যা তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, এসমস্ত বিষয়ের উপর গভীরভাবে জানা বা জানানোই হচ্ছে জীববিজ্ঞানের মুল লক্ষ্য।

যদিও অতীতে জীববিজ্ঞান প্রাচীন সভ্যতার পর্যবেক্ষণ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে নিহিত ছিল, মধ্যযুগ থেকে ধীরে ধীরে বিগত কয়েক শতাব্দীতে জীববিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে (Agriculture) এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে (Medicine) জীববিজ্ঞান অসাধারণ এক বিপ্লব ঘটায়। বর্তমানে জীববিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে, যা প্রাণ ও প্রাণের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। কোষের (Cell) অভ্যন্তরে জটিল প্রক্রিয়াগুলি বোঝার জন্য রয়েছে *আণবিক জীববিজ্ঞান* (Molecular biology), অন্যদিকে *পরিবেশবিদ্যা* (Ecology) জীব এবং তাদের পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। বংশবিদ্যা বা *জেনেটিক্স* (Genetics) উত্তরাধিকার ও বৈচিত্র্যের অধ্যয়ন করে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যগুলির স্থানান্তরের নিয়ম ব্যাখ্যা করে। শারীরতত্ত্ব (Physiology), অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology), প্রাণীবিজ্ঞান (Zoology), উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany), এবং বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানও (Evolutionary biology) জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

জীববিজ্ঞান হল জীবনের পাঠ, যা জীবিত সমস্ত কিছুর আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা দেয়। জীববিজ্ঞান বিশ্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা, কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং জৈবপ্রযুক্তির (Biotechnology) অগ্রগতিতে জীববিজ্ঞানের গবেষণা অবদান রাখে। ভ্যাকসিনের উন্নয়ন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে, জীববিজ্ঞান মানবজাতি এবং পরিবেশের ভবিষ্যৎ রূপায়ণে অবিচ্ছেদ্য। জীববিজ্ঞান ক্রমাগত অগ্রগতি মানবজাতির পৃথিবীকে বোঝার প্রচেষ্টা এবং এই জ্ঞানকে সমাজ ও পরিবেশের উন্নতির জন্য ব্যবহারের প্রতিফলন।

১.২ জীবনকে সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

কোনো কিছুকে কখন বলা যায় যে এর 'জীবন' আছে? আমরা যে কেউই সহজে বুঝতে পারি যে একটি দৌড়ানো ঘোড়া জীবিত কিন্তু একটি গাড়ি নয়। আবার একটি গাড়ি নড়তে পারে এবং একটি নৌকাও পানিতে ভাসতে পারে। কিন্তু আমরা বুঝি এগুলি অবশ্যই জীবিত নয়। এমনকি একটি শিশুও বুঝতে পারে যে একটি গাছ বা একটি গরু জীবিত, কিন্তু মাটি বা মাটির বানানো বাড়ি নয়। তবুও, আমরা যাকে জীবন (Life) বলি তা সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আমরা জীবনের অস্তিত্বকে সনাক্ত করি জীবিত জিনিসগুলোর কিছু আচরণ বা বৈশিষ্ট্যের (Characteristics) মাধ্যমে। যদিও আমরা একটি সহজ বাক্যে জীবন সংজ্ঞায়িত করতে পারি না, তবে আমরা এমন ছয়টি

বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারি যা জীবিত বস্তুগুলোকে চিনতে সাহায্য করে:

১) সুবিন্যস্ততা (Orderliness): জীবনের অধিকারী সমস্ত কিছু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল (Ordered) এবং সুসংগঠিত (Organized)। প্রাণীর শরীরের যে বিন্যাস তা মূলত বিভিন্ন কোষ (Cell) দিয়ে তৈরি। যদিও এক বা একাধিক কোষ নিয়ে গঠিত প্রাণগুলো খুব ছোট হয়, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তারাও জীবনের মৌলিক কার্যক্রম সম্পাদন করে।প্রতিটি কোষ একটি পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে যা এটিকে তার চারপাশ থেকে আলাদা করে। প্রতিটি কোষের আবার জটিল (Complex) আণবিক গঠন রয়েছে। যদিও অনেক অজীব বস্তু জটিল হতে পারে, তবে এরা এই মাত্রার সুশৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে না।

চিত্র ১.২.১: বেলি ফুলের (ইংরেজি: Arabian jasmine, বৈজ্ঞানিক নাম: Jasminum sambac) সুসজ্জিত পাঁপড়িগুলো জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সুবিন্যস্ততাকে তুলে ধরে।

২) বৃদ্ধি, বিকাশ এবং প্রজনন (Growth, Development and Reproduction): সমস্ত প্রাণ বৃদ্ধি পায়, প্রজনন করে এবং বিকশিত হয় । জীবিত যেকোনো কিছু তাদের নিজস্ব প্রজাতিকে পুনরুৎপাদন করে।তারা বংশগতির অণু (DNA) বা জিন (Gene)-গুলো বহন করে, যা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রেরিত হয় এবং নিশ্চিত করে যে তার পরের জনি বা বংশরা (Generation) একই প্রজাতির হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বংশগতির অণু বা জিনগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দিয়েই একটি জীবনের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে।

ক)

খ)

চিত্র ১.২.২: (ক) বাংলার বাঘ (ইংরেজি: The Bengal Tiger, বৈজ্ঞানিক নাম: *Panthera tigris*) এবং তার ছানারা। (খ) নারিকেল গাছের বীজে তার জীবনের বৃদ্ধি এবং বিকাশের তথ্য রয়েছে যা দিয়ে বীজ (Seed) থেকে প্রথমে চারা তারপর পূর্ণ একটি নারিকেল গাছ তৈরি হয়।

৩) সংবেদনশীলতা (Sensitivity): সমস্ত জীবিত বস্তু উদ্দীপনায় (Stimuli) সাড়া দেয়। যেমন উদ্ভিদ তার আলোর উৎসের দিকে বৃদ্ধি পায়, বরফ ছুঁলে ঠাণ্ডা অনুভূত হয় বা কেউ অন্ধকার ঘরে ঢুকলে তার চোখের মণি প্রসারিত হয়। জীবিত যেকোনো কিছু তার চারপাশের পরিবেশকে অনুভব করে, মিথস্ক্রিয়া করে (Interaction), এবং পরিবেশ থেকে বিভিন্ন সংকেত (Signal) বা উদ্দীপনা পেলে তার প্রতিক্রিয়া (Response) করে।

ক)

খ)

চিত্র ১.২.৩: (ক) লজ্জাবতী (Mimosa) গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত প্রজাতি হলো *Mimosa pudica*। এর পাতা ছোঁয়া মাত্র সংকুচিত হয়ে যায়। তাপের প্রভাবে বা সন্ধ্যা বেলাতেও এর পাতা বন্ধ হয়ে যায়। (খ) ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ (ইংরেজি: Venus flytrap, বৈজ্ঞানিক নাম: Dionaea muscipula) হল একটি মাংসাশী (Carnivorous) উদ্ভিদ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে উত্তর ক্যারোলিনা এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার নাতিশীতোষ্ণ এবং উপক্রান্তীয় জলাভূমিতে পাওয়া যায়। এই মাংসাশী উদ্ভিদের পাতাগুলোর প্রান্তগুলো চোয়ালের মতো হয়। যখন কোনো পোকা এর উপর বসে তখন চোয়ালটা বন্ধ হয়ে যায় এবং একাজটি খুব দ্রুত, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটতে পারে।

৪) শক্তি প্রক্রিয়াকরণ (Energy Utilization): সমস্ত জীব শক্তি (Energy) গ্রহণ এবং শক্তিকে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার (Utilize) করে। আমাদের শরীরের প্রতিটি পেশি আমাদের খাদ্য থেকে প্রাপ্ত শক্তির দ্বারা চালিত হয়।

চিত্র ১.২.৪: প্রজাপতি (Butterfly) তার ছোট শুঁড়ের (Nectar) মাধ্যমে ফুল থেকে তার খাবার সংগ্রহ করে এবং তা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে।
প্রজাপতির খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে উড়া এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদন করে।

৫) সুস্থিতি (Homeostasis, হোমিওস্ট্যাসিস): জীবিত যেকোনো কাঠামো তার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে একটি স্থির অবস্থায় বজায় রাখে বা নিয়ন্ত্রণ (Regulation) করে, আপেক্ষিকভাবে যা তার বিদ্যমান পরিবেশের থেকে আলাদা হয়। হোমিওস্ট্যাসিস হল এমন একটি ব্যবস্থা (System) বা জীবদেহের বিশেষ এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার ফলে জীবের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যেন অভ্যন্তরীণ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের শরীরের তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ। আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা, ৩৭ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট। আমাদের শরীরের এই তাপমাত্রা অভ্যন্তরীণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যার কারণে বাহ্যিক তাপমাত্রার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের শরীরের তাপমাত্রা স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে।

চিত্র ১.২.৫: জ্যাক খরগোশ (Jack Rabbit) যা উত্তর আমেরিকার উষ্ণ মরু অঞ্চলে অনেক দেখা যায়। এদের কানগুলো বড় এবং কানগুলোতে অসংখ্য

রক্তনালী রয়েছে। এই রক্তনালীর মাধ্যমে এরা আশেপাশের বাতাসে তাপ বিকিরণ করে এবং পরবর্তীতে ঠাণ্ডা রক্তগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা স্থির রাখতে সাহায্য করে।

৬) বিবর্তনীয় অভিযোজন (Evolutionary Adaptation): জীবন আছে এসমস্ত কিছুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অভিযোজন (Adaptation) করে বিবর্তিত হয়। জীবিতরা তাদের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এই মানিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় শারীরিক বা আচরণগত দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন (Change) ঘটে, যাকে বলা হয় অভিযোজন । অভিযোজনের ফলে জীবিতরা যেসমস্ত নতুন গঠনগত ও কার্যগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং তা যদি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিস্তার লাভ করে, তবে তা হচ্ছে বিবর্তন (Evolution)।

ক)

খ)

চিত্র ১.২.৬: ঠাণ্ডা পরিবেশের জীবগুলি উষ্ণ পরিবেশের জীবের চেয়ে সাধারণত বড় হয়, যা বার্গম্যানের সূত্র (Bergmann's rule) হিসেবেও পরিচিত। মূলত

অভিযোজন আর বিবর্তনের মাধ্যমে এবিষয়টি ঘটে। বড় আকৃতির দেহগুলো শরীরে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। আবার এদের শরীরের যেসমস্ত অংশ থেকে তাপ বিকিরিত হয়, যেমন হাত বা পা, তা সাধারণত পুরো দেহের তুলনায় বা অনুপাতে ছোট হয়। ঠান্ডা পরিবেশে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়। অন্যদিকে ছোট আকৃতির দেহগুলোর বহির্ভাগ যা তাপ বিকিরণ করে তা বেশী অনুপাতে থাকে, যা তাদের শরীরের তাপ কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই ধরনের অভিযোজন (Adaptation) অসংখ্য প্রজন্মের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়, যেখানে সফল প্রজননকারী জীব এক্ষেত্রে যে তার শরীরের তাপমাত্রাকে পরিবশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে সেই টিকে থাকে। (ক) অস্ট্রেলিয়া দেশের পেঙ্গুইন, যারা মূলত উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে। এদের ওজন সাধারণত ২ কেজি এবং উচ্চতা সাধারণত ১.৫ ফুট হয়। (খ) অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের পেঙ্গুইন। ঠাণ্ডা পরিবেশে বেড়ে ওঠা এদের ওজন সাধারণত ৪০ কেজি এবং উচ্চতা ৪ ফুট হয়। এটা বলা যেতে পারে যে পেঙ্গুইনগুলোর দৈহিক গঠন অভিযোজিত এবং বিবর্তিত হয়েছে তাদের পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার সাথে মানিয়ে নিতে।

১.৩ জীববিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত (Unify) করে জীবন বা প্রকৃতিকে অধ্যয়ন হচ্ছে জীববিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্রগুলোর বিভিন্ন সূত্র (Principle), তথ্য (Information) ও উপকরণ (Tool) ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানকে অধ্যয়ন বা পড়া হয়। জীববিজ্ঞান যত ধরনের বিজ্ঞান রয়েছে বা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Science) একটি সংযোগ। এর কারণ হচ্ছে একটি জীব বা প্রাণের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে তা অত্যন্ত জটিল (Complex) একটি ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর সমস্ত জীববৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাসায়ন (Chemistry) ও পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। তাই জীবন বা প্রকৃতিকে বোঝার জন্য আমাদের বিজ্ঞানের সকল শাখার দ্বারস্থ হতে হয়। আরেক ভাবে বলা যায়, জীবের জটিলতা এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। মূলত, জীববিজ্ঞান হচ্ছে সমস্ত বিজ্ঞানের সংযোগস্থল।

জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃতির কোনো নতুন নিয়ম তৈরি করা সম্ভব নয়, তবে জীববিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্য শাস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে প্রকৃতির বিদ্যমান নিয়মগুলোর কার্যপ্রণালীকে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ তুলে ধরে, যাতে আমরা জীবনকে সহজে বুঝতে পারি। যেমন, প্রাণী কোষের জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য রাসায়নবিজ্ঞানের সূত্র ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১.৩.১: জীববিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয় যা রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে সংযুক্ত।

একইভাবে, তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) মাধ্যমে আমরা জানতে পারি প্রাণের প্রতিটি স্তর শক্তির (Energy) পরিবর্তনের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় বা জীবনের সাথে জড়িত যেকোনো কিছুই শক্তি রূপান্তরের সূত্রগুলো মেনে চলে । জীববৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাগুলো কোনো নতুন ধরনের পদার্থ (Matter) গঠন করে না বরং একটি থেকে আরেকটিতে পরিবর্তন করে একটি জটিল বিন্যাস বা ব্যবস্থা তৈরি করে। জীবনের এই জটিলতা সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের একটি অবিচ্ছিন্ন শক্তির উৎস রয়েছে, যেটি হচ্ছে সূর্য (Sun)। উদ্ভিদ সূর্যালোককে জৈব অণুতে রূপান্তর করে নিজের বা অন্য প্রাণীর খাদ্য তৈরি। এই প্রক্রিয়াটি রাসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম শৈল্পিক ও জটিল বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি, যা সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) নামে পরিচিত। অর্থাৎ, জীববিজ্ঞানকে বুঝতে হলে আমাদের রাসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্য শাস্ত্রগুলোর মৌলিক বিষয় (Basic Concept) সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Challenge) মোকাবিলার জন্য গবেষণার পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞান এখন আরও আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) হয়ে উঠছে, যেখানে বিভিন্ন প্রচলিত শাখা ও নতুন উদীয়মান ক্ষেত্র, যেমন জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology), একসঙ্গে কাজ করছে। জীববিজ্ঞান এখন একটি বহুমাত্রিক বিষয়, কারণ জীববৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বিভিন্ন শাখার দক্ষতা (Skill) একত্রিত করা প্রয়োজন।

১.৪ জীবনের মৌলিক ধারণাসমূহ। (Basic Concepts of Life)

বর্তমানে জীববিজ্ঞান হল জ্ঞানের এক বিশাল ক্ষেত্র। প্রতিদিন নতুন-নতুন, অবাক করা, ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক জীববৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে। জীববিজ্ঞানে নিত্য-নতুন বিভিন্ন তথ্যযুক্ত হচ্ছে এবং এর পরিধি বাড়ছে। কিন্তু এই যে বিপুল পরিমাণ তথ্য, সেটিকে কীভাবে সহজে জানা বা বোঝা যায়? একটি উপায় হচ্ছে জীববিজ্ঞানের বিশাল তথ্যসমুদ্রকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সংগঠিত করা। যেমনঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অণুজীব বিজ্ঞান ইত্যাদি।কিন্তু জীববিজ্ঞানের বিষয়ের সংখ্যা এখন এত বেশি এবং গভীর যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো প্রথমে সহজে নাও বুঝতে পারে। এর চেয়ে ভালো উপায় হলো শিক্ষার্থীদের প্রথমে জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ (Basic Concept) দেয়া। মূলত জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো কিছু মৌলিক ধারণাগত কাঠামোর (Conceptual

Framework) মাধ্যমে সংগঠিত করা যায় বা সাজানো যায়, যাতে করে জীববিজ্ঞানের সব বিষয়গুলো সহজে বোধগম্য হয়।

জীববিজ্ঞানের যত জ্ঞান বা তথ্য আছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীববিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত যেকোনো বিষয়ই (Theme) কয়েকটি মৌলিক (Basic Concept) ধারণা দিয়ে বোঝা যায়। জীবনের অধ্যয়ন বা জীববিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন তথ্য একত্রিত (Unify) করে পর্যবেক্ষণ করলে কিছু সূত্র বা মৌলিক ধারণা পাওয়া যায়। যেমনঃ একটি হাতুড়ি, একটি সূর্যমুখী ফুল এবং একটি পাখি দেখতে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে এগুলো দেখলে বোঝা যায় এদের আকৃতি বা গঠন তৈরি হয়েছে তারা যে কাজ করে বা তাদের দারা যে কাজ সম্পাদন হয় তা সঠিকভাবে করার জন্য। একটি হাতুড়ির লম্বা হাতল এবং ভারী মাথা রয়েছে যাতে জোরে জোরে পেরেক ঠোকা যায়। সূর্যমুখী ফুলের বিস্তৃত পাতা রয়েছে যা সালোকসংশ্লেষণের (Photosynthesis) জন্য আলো শোষণের ক্ষমতা বাড়ায়। একটি পাখির ডানা থাকে যাতে সে আকাশে উড়তে পারে। এখান থেকে আমরা একটা মৌলিক ধারণা নিতে পারি যে, কোনোকিছুর আকৃতি দিয়ে তার কাজ কি হবে তা বোঝা যায়। অর্থাৎ জীবনের গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে বা কোনো কিছুর কার্যকারিতা তার গঠন থেকে নির্ধারিত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষায় জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে । কারণ জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলো থাকলে, ভবিষ্যতে জীববিজ্ঞানের নতুন যেকোনো জ্ঞান বা তথ্য এই মৌলিক ধারণাগুলো দিয়ে একটি কাঠামোর মধ্যে আনা যাবে এবং তা সহজে বোঝা যাবে। এখানে জীববিজ্ঞানের ছয়টি মৌলিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ

১। জীবিত ব্যবস্থাগুলি শ্রেণীবদ্ধ এবং অনুক্রমিকভাবে সংগঠিত হয়। (Living systems are classified and organized hierarchically)

২। গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। (Structure determines function)

৩। জীবিত ব্যবস্থা শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর করে। (Living systems transform energy and matter)

৪। জীবন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের অধীন। (Life is subject to chemical and physical laws)

৫। জীবিত ব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে। (Living systems depend on exchange of information)

৬। জীবিত ব্যবস্থা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। (Living systems depend on interactions)

৭। বিবর্তন জীবনের ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে। (Evolution explains the unity and diversity of life)

উপরের উল্লেখকৃত মূল ধারণাগুলো জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এই মৌলিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে অন্যান্য জীববিজ্ঞানের আরও নির্দিষ্ট গৌণ বা দ্বিতীয় স্তরের ধারণাগুলোকে (Secondary Concept) নির্ণয় বা সংগঠিত করতে ব্যবহৃত হয়, যা জীববৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ (Observation) ও পরীক্ষার (Experiment) মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, **"গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে"** এই মূল ধারণা থেকে একটি গৌণ ধারণা হতে পারে **"হাঁড় বা অস্থি শরীরের কাঠামো তৈরি করে এবং চলাচলে সহায়তা করে।"** বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যাবচ্ছেদ করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তাদের আকৃতি দানকারী কঙ্কালগুলো হাঁড়ের তৈরি এবং হাঁড়ের গঠন দেখে বোঝা যায় যে শরীরে হাড়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কিছু গৌণ বা দ্বিতীয় স্তরের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে পারি , যেমন

- যেকোনো জীবে, হাঁড় দিয়ে তৈরি কঙ্কাল তার শরীরকে একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে এবং শরীরের নরম অঙ্গগুলিকে (যেমন মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, এবং ফুসফুস) আঘাত থেকে রক্ষা করে।
- দাঁড়ানো অবস্থায় শরীরকে ধরে রাখার জন্য এবং হাঁটতে বা দৌড়াতে শরীরকে নাড়াচাড়া করার জন্য হাঁড় ব্যবহারিত হয়। হাঁড় শরীরের পেশীর সাথে লেগে থেকে কাজগুলো করে।

এভাবে, মৌলিক ধারণাগুলোর ভিত্তিতে জীববিজ্ঞানের বিশাল তথ্যভান্ডারকে সংগঠিত করা বা বোঝা সহজতর হয়। পরবর্তী অংশে জীববিজ্ঞানের প্রতিটি মৌলিক ধারণা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

চিত্র ১.৪.১: দেখা যাক নিচের বিড়ালগুলো কীভাবে জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলোকে তুলে ধরে করে?

এই দৃশ্যটিতে খাদ্যজালে (Food web) শক্তির একমুখী প্রবাহকে (Flow) চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে সূর্য থেকে উদ্ভিদ, সেখান থেকে ইঁদুর এবং তারপরে বিড়ালের মধ্যে শক্তি স্থানান্তরিত হয়।যখন বিড়াল সরাসরি উদ্ভিদ খায় বা ইঁদুর যারা উদ্ভিদের কাণ্ড চিবিয়ে খেতে পারে তাদেরকে খেয়ে ফেলে তখন সূর্য থেকে অধীকৃত (Captured) শক্তি বিড়ালটির মধ্যে চলে আসে। এটি জীবিত ব্যবস্থার শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর করার একটি উদাহরণ যা রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো মেনে চলে। একইসঙ্গে, এই উদাহরণটি বিভিন্ন জৈব উপাদান বা পদার্থের চক্রাকার (Cycle) প্রবাহকেও নির্দেশ করে, যেখানে বিড়াল ইঁদুরকে শিকার করার মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলে পদার্থের পুনঃপ্রবাহ নিশ্চিত করে। এই চিত্রটি প্রকৃতির শিকারি-শিকার সম্পর্ক এবং বাস্তুতন্ত্রে (Ecosystem) শক্তি ও পদার্থের আন্তঃসংযোগকে (Relationship) সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

বন্য বিড়ালরা লতাপাতা খেয়ে থাকে। আবার বাজ পাখি বিড়ালকে শিকার করে তার খাবার হিসেবে।
এটি জীবিত ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interaction) একটি উদাহরণ।

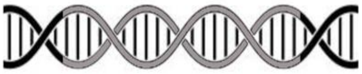

ধূসর রঙের জিন

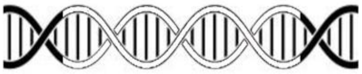

সাদা রঙের জিন

ডিএনএ-তে (DNA) সঙ্কেতাক্ষরে লিখা (Encoded) থাকা জিনগত (Gene) তথ্য (Information) একটি বিড়ালের লোমের রঙ নির্ধারণ করে যা সে বংশানুক্রমে তার বাবা-মার কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

বিড়ালের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গঠন (Structure) সুবিন্যস্ত (Ordered) ও সুসংগঠিত (Organized) যা তার দৈনন্দিন কাজের (Function) সাথে মানানসই (Fit)।

পোষা বিড়াল

বন্য বিড়াল

যখন বিড়াল বন্য প্রাণী থেকে গৃহপালিত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, তখন তাদের লোমের রঙ বিবর্তিত হয়ে আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। বন্য বিড়াল প্রধানত শিকার করার জন্য ছদ্মবেশের উপর নির্ভর করে, যার জন্য বিবর্তনের (Evolution) কারণে তাদের লোমের রঙ ছদ্মবেশের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে।

১.৪.১: জীবিত ব্যবস্থাগুলো শ্রেণীবদ্ধ এবং অনুক্রমিকভাবে সংগঠিত হয়। (Living systems are classified and organized hierarchically)

আমাদের এই বিশ্ব একটি অনুক্রমিক (Hierarchical) কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে জীবনের প্রতিটি স্তর তার নিম্নতর স্তরের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। এই কাঠামোতে জীবিত ব্যবস্থাগুলো সুসংগঠিত, সুবিন্যস্ত, এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে (Class) বিভক্ত। যেকোনো জৈবিক সংগঠনে অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বহুকোষ দিয়ে তৈরি প্রাণী বা উদ্ভিদ সবকিছু সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে। যেমনঃ পরমাণুগুলি (Atom) একত্রিত হয়ে অণু (Molecule) গঠন করে, যা আরও জটিল কাঠামো যেমন অঙ্গাণু (Organelle) তৈরি করে। এগুলো একত্রে বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা (Subsystem) গঠন করে, যা বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে। কোষসমূহ একত্রে টিস্যু (Tissue) তৈরি করতে পারে, যা পরবর্তীতে অঙ্গ (Organ) ও অঙ্গতন্ত্র (Organ system) গঠন করে। এই জীবিত ব্যবস্থাগুলো সম্প্রসারিত হয়ে জনসংখ্যা (Population), সম্প্রদায় (Community), বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) এবং সর্বশেষে জীবমণ্ডল (Biosphere) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ক্ষুদ্র অণু এবং কোষ থেকে শুরু করে পুরো জীবমণ্ডল জৈবিক কাঠামোগুলোর অন্তর্ভুক্ত। জীববিজ্ঞানীরা জীবনের এই বিশাল ক্ষেত্রকে খণ্ডতাবাদ বা হ্রাসবাদের (Reductionism)-এর ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন, যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি। হ্রাসবাদ হলো একটি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা পদ্ধতি, যেখানে বড় বা জটিল কোনো জিনিসকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়। এটি জীববিজ্ঞানে খুবই কার্যকর পদ্ধতি, যা ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের কঠিন এবং জটিল বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বা সহজে বোঝা যায়। তবে, হ্রাসবাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। হ্রাসবাদ জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র দেয় না, শুধুমাত্র জীবনের একটি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবিত ব্যবস্থাগুলোর অনেক বৈশিষ্ট্য শুধু এর আলাদা আলাদা অংশগুলো দেখলেই বোঝা যায় না, জীবিত ব্যবস্থাগুলোকে সামগ্রিকভাবেও (Holistically) দেখতে হবে। জীবিত ব্যবস্থাগুলো যত উপরের স্তরে যাওয়া হয়, তাতে দেখা যায় নিম্নস্তরে সংঘটিত বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার ফলে উপরের স্তরে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। এই নতুন বৈশিষ্ট্যকে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) বলা হয়, যা নিম্নস্তরে ব্যবস্থাগুলো থেকে পূর্বানুমানযোগ্য নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র উদ্ভিদের একটি কোষ বিশ্লেষণ করলে পুরো উদ্ভিদের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য যেমন তা কি ফল দিবে তা বোঝা সম্ভব হয় না। আবার উদ্ভিদের পাতার কোষের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নামের একটি অঙ্গাণু থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্টগুলো যা দিয়ে তৈরি যেমন ক্লোরোফিল বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অণুগুলো একত্রে যদি জৈবিকভাবে সংগঠিত না হয়, তাহলে সালোকসংশ্লেষণ সম্পন্ন হবে না। যেমন তাদেরকে যদি শুধু একটি পরীক্ষার পাত্রে এমনি রেখে দেয়া হয়, তাহলে সালোকসংশ্লেষণ ঘটবে না। অর্থাৎ, শুধু ক্লোরোফিল বা এর সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোকে দেখলে ক্লোরোপ্লাস্টের মুল কাজ বা বৈশিষ্ট্য নাও বোঝা যেতে পারে। ক্লোরোফিল বা এর সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো যখন কোনো কোষের মধ্যে জৈবিকভাবে সংগঠিত হয়ে পুরো একটি ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন করে তখন তা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে, যা ক্লোরোপ্লাস্টের একটি উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties)। জীবিত ব্যবস্থাগুলোকে এভাবে সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন বা বোঝাকে বলা যেতে পারে সামগ্রিক বা পুরোবাদ (Holism)। পুরোবাদ বা হলিজম হলো একটি দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা যাতে কোনও ব্যবস্থা শুধু তার বিভিন্ন অংশগুলোর যোগফল নয়, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু। কোনও জীবিত ব্যবস্থার প্রকৃত পরিচয় বা উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) তার বিভিন্ন অংশগুলো একত্রিত হয়ে যে সামগ্রিক রূপ তৈরি করে, তার মধ্যে নিহিত থাকে।

উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য শুধু জীবজগতে বা জীবনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় নয়, উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য জীবনের বাহিরেও অনেক জায়গায় দেখা যায়। যেমন, যদি একটি বাইসাইকেলের সব যন্ত্রাংশ আলাদা রাখা হয়, তাহলে তা চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলো সঠিকভাবে জোড়া লাগালে, যে কেউ বাইসাইকেল চালিয়ে চলাচল করতে পারে। এখানে বাইসাইকেল চালিয়ে চলাচল করতে পারাটা হচ্ছে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য। তবে, জীবিত ব্যবস্থাগুলো আরও জটিল, যার জন্য জৈবিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য গুলো বোঝা কঠিন হয়। জীবজগতের উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই "জীবন" কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, তা নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। জীবিত ব্যবস্থার উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাই ভালোভাবে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা **সিস্টেমস বায়োলজি (Systems Biology) বা সাংশ্রয়িক জীববিজ্ঞান** নামক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এটি জীবের বিভিন্ন অংশ কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে। যেমনঃ একটি পাতার কোষ, একটি বিড়াল, একটি পিঁপড়ের দল, বা একটি মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র—সবকিছুই একেকটি জৈবিক ব্যবস্থা। **সিস্টেমস বায়োলজি** এইসব ব্যবস্থার ভেতরের জটিল সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করতে বা বুঝতে সাহায্য করে।

চিত্র ১.৪.১.১-এ মহাকাশ (Space) থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ (Mangrove) বন বা লবণাক্ত বনাঞ্চল সুন্দরবন কিভাবে জৈবিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরগুলো ধারণ করে তা বড় স্তর থেকে ছোট ছোট স্তরে বিভিন্ন ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে।

জীবিত ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের বা জৈবিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং সংগঠন সম্পর্কে জানা জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের ভূমিকা বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। পরবর্তী অংশে, বিজ্ঞান কি বা বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

চিত্র ১.৪.১.১: জৈবিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর।

জৈবিক সংগঠনের স্তর
Levels of Biological Organization

(১) জীবমণ্ডল The Biosphere

(২) বাস্তুতন্ত্র স্তর The Ecosystem Level

(৩) জনসংখ্যাগত স্তর The Population Level

জীবমণ্ডল (The Biosphere)

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা জীবমণ্ডলকে দেখতে পাই যাতে রয়েছে জীবনের বিভিন্ন চিহ্ন। জীবমণ্ডল (Biosphere) হচ্ছে পৃথিবীর সকল জীব ও তাদের পরিবেশের সমষ্টি। জীবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পৃথিবীর সকল ভূমি, বনভূমি, জলাশয়, বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর এবং এমনকি সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিচের অংশও।

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystems)

জীবমণ্ডলের পরের স্তর হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem), যেমন বাংলাদেশের সুন্দরবন। এরকম আরও অনেক বাস্তুতন্ত্র রয়েছে, যেমন তৃণভূমি, মরুভূমি, এবং প্রবালপ্রাচীর। একটি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সেখানে বসবাসকারী সব জীব এবং জীবনকে প্রভাবিত করা সমস্ত অজীব উপাদান যেমন মাটি, পানি, বায়ুমণ্ডলের গ্যাস, ও আলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জৈবিক সম্প্রদায় (Biological Communities)

কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সমস্ত জীব একসঙ্গে জৈবিক সম্প্রদায় (Biological community) গঠন করে। সুন্দরবনে বসবাসকারি বিভিন্ন গাছপালা, নানা প্রকার প্রাণী যেমন হরিণ, বাঘ অথবা নদীতে থাকা মাছ, ছত্রাক, এবং অসংখ্য অণুজীব (যেমন ব্যাকটেরিয়া) সম্মিলিতভাবে একটি জৈবিক সম্প্রদায়। একটি সম্প্রদায় (Community) আসলে একটি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জনসংখ্যার সমষ্টি।

জনসংখ্যা (Populations)

জনসংখ্যা (Population) হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী একই প্রজাতির সব জীবের সমষ্টি। প্রজাতি (Species) হচ্ছে তারা যারা নিজেদের মধ্যে প্রজনন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুদরবনে চিত্রা হরিণের জনসংখ্যা রয়েছে, যারা শুধু নিজেদের মধ্যে বংশবিস্তার করে।

জীব (Organisms)

জৈবিক সংগঠনে অবস্থিত প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকে (Living being) জীব (Organism) বলা হয়। সুদরবনে থাকা প্রতিটি উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, ও ব্যাকটেরিয়া এরা একেকটা নিজ নিজ জীব।

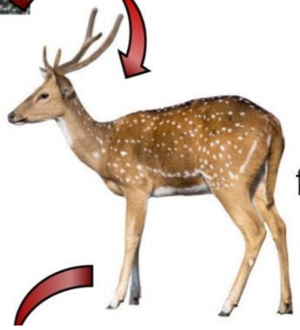

চিত্রা হরিণ

(৪) অঙ্গীয় স্তর (The Organismal Level)

অঙ্গ (Organs)

জটিল বহুকোষী জীবগুলো ব্যাবচ্ছেদ করলে আমরা দেখব তা বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ (organ) দিয়ে গঠিত। যেমন মস্তিষ্ক দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। একাধিক অঙ্গ একসঙ্গে কাজ করে গঠন করে অঙ্গতন্ত্র (Organ System)। যেমন, স্নায়ুতন্ত্রে (Nervous System) মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, এবং অন্যান্য সংবেদনশীল অঙ্গ একত্রে সংকেত আদান-প্রদান করে।

মস্তিষ্ক বা স্নায়ুকেন্দ্র (Brain)

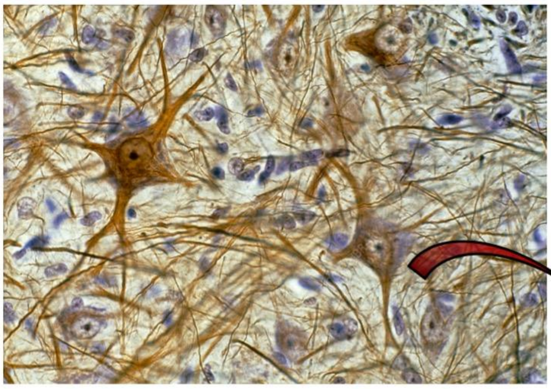

কোষকলা বা টিস্যু (Tissues)

কোষকলা বা টিস্যু হলো কোষের একটি দল, যারা একসঙ্গে কাজ করে এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। প্রতিটি অঙ্গ নির্দিষ্টভাবে সাজানো কিছু টিস্যু দিয়ে তৈরি, যা সেই অঙ্গের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। যেমন মস্তিষ্ক (Brain) হলো একটি অঙ্গ, যা স্নায়ুকোষ (Nerve cells) ও অন্যান্য টিস্যুর মাধ্যমে গঠিত।

(৫) কোষীয় স্তর (The Cellular Level)

কোষ (Cells)

কোষ (Cell) হলো জীবনের গঠনতান্ত্রিক ও কার্যকরী মূল একক। অনেক স্বাধীন জীব শুধুমাত্র এককোষী (Unicellular) হয়, যারা একটি মাত্র কোষ জীবনের সব কাজ সম্পন্ন করে। বহুকোষী (Multicellular) জীবের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত কোষ থাকে। যেমন, স্নায়ুকোষ বা নিউরন হল স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক ও কার্যকরী মৌলিক একক যা জীবের বিভিন্ন অংশ থেকে সংকেত আদান-প্রদানের কাজ করে থাকে। কোষগুলো তৈরি হয় আরও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অঙ্গাণু (Organelles) দিয়ে, যেমন কোষ কেন্দ্রিকা (Cell Nucleus)।

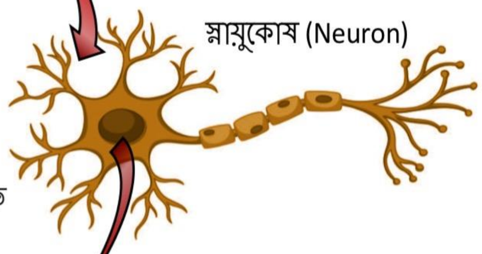

স্নায়ুকোষ (Neuron)

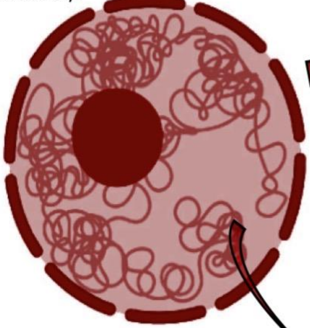

কোষ কেন্দ্রিকা (Cell Nucleus)

অঙ্গাণু (Organelles)

অঙ্গাণু হলো কোষের ভেতরের ক্ষুদ্র কার্যকরী অংশ, যা কোষের নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা কোষ কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস দেখতে পারি। নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে ঘন, পর্দাঘেরা এবং প্রায় গোলাকার একটি অংশ। নিউক্লিয়াস কোষের সব জৈবনিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

অণু (Molecules)

জীবনের ক্ষুদ্রতর স্তরে আমরা অণু (Molecule) পাই। যদিও পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে এর থেকেও ক্ষুদ্র স্তর রয়েছে। একটি অণু হলো দুই বা ততোধিক পরমাণুর (Atom) সমন্বয়ে তৈরি রাসায়নিক গঠন। রাসায়নিকভাবে নিউক্লিয়াস মূলত প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত। এতে অন্যান্য উপাদানও থাকে। যেমনঃ প্রোটিন (Protein), আরএনএ (RNA), ডিএনএ (DNA)। ডিএনএ বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic Acid) হচ্ছে একটি অণু যা কোষের তথা সমস্ত জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ ধারণ করে।

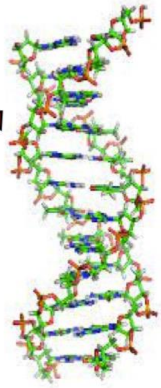

ডিএনএ (DNA)
ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড
(Deoxyribonucleic Acid)

১.৪.২ গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। (Structure determines function)

জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা হলো গঠন ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে সম্পর্ক। জৈবিক কাঠামোর প্রতিটি পর্যায়ে, গঠন ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation) দেখা যায়। অণু, কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে শুধুমাত্র তাদের সুনির্দিষ্ট গঠনের কারণে। যেমন, একটি পাতা সাধারণত বিস্তৃত ও চ্যাপ্টা আকৃতির হয়, যাতে পাতায় থাকা ক্লোরোপ্লাস্ট সহজে এবং বেশী করে সূর্যের আলো শোষণ করতে পারে । যেহেতু জীবজগতের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে গঠন ও কার্যপ্রণালীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই কোনো জীবের গঠন বিশ্লেষণ করলে তার কাজ কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে হামিংবার্ডের শারীরিক গঠন বিবেচনা করা যেতে পারে। হামিংবার্ড (Hummingbird) দ্রুত উড়তে সক্ষম ছোট একটি পাখি যাদের ডানার দ্রুত গতির কারণে এক ধরনের গুনগুন শব্দ হয়। এই ছোট পরিযায়ী (Migrating) পাখিগুলোকে আমেরিকাতে পাওয়া যায় এবং এরা একমাত্র পাখি যারা পিছনের দিকে উড়তে পারে। হামিংবার্ডের শারীরিক গঠনই তাকে সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে উড়তে সাহায্য করে **(চিত্র ১.৪.২.১)**। হামিংবার্ডের ডানাগুলি কাঁধের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত, যা তাকে পিছন দিকে উড়তে এবং স্থির থেকে উড়তে সক্ষম করে যা অন্যান্য পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। স্থির থাকা অবস্থায়, হামিংবার্ডরা তাদের লম্বা ও সরু ঠোঁট ফুলের গভীরে প্রবেশ করিয়ে মধু আহরণ করতে পারে।

চিত্র ১.৪.২.১: হামিংবার্ড ফুল থেকে মধু আরোহণ করছে।

যখন আমরা একটি জীবের কোনো নির্দিষ্ট গঠনের কার্যপ্রণালী জানি, তখন যদি আমরা অনুরূপ (Similar) গঠন অন্য কোনো জীবে পাই, তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে এই অনুরূপ গঠনটির কার্যপ্রণালীও জানা গঠনের কার্যপ্রণালীর মত হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি মানব শরীরে থাকা ফুসফুসের (Lung) গঠন কেমন হয়। ফুসফুস প্রাণীর একটি অঙ্গ যা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শ্বাসযন্ত্রটির প্রধান কাজ হলো বাতাস থেকে অক্সিজেনকে (Oxygen, O_2) রক্তপ্রবাহে নেওয়া এবং রক্তপ্রবাহ হতে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে (Carbon dioxide, CO_2) বাতাসে নিষ্কাশন করা। এখন আমরা যদি ফুসফুসের মত অনুরূপ একটি গঠন অন্য একটি প্রাণীর, যেমন হরিণের দেহে খুঁজে পাই, তাহলে আমরা ধারণা করতে পারি যে এই গঠনটি হরিণেও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে, আমরা হরিণ, মানুষ ও সকল জীবের মধ্যে তাদের গঠন ও কাজের মধ্যে অনেক মিল পাই যা তাদের সৃষ্টির এক উৎসের দিকেই ইঙ্গিত করে। গঠন ও কাজের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ধারনা, তা বিভিন্ন রোগ নির্ণয় বা প্রতিকারেও সাহায্য করতে পারে। যদি জীবের গঠনে কোনো পরিবর্তন আসে, তাহলে তার কার্যপ্রণালীও ব্যাহত হতে পারে, যা শারীরে রোগের সৃষ্টি করতে পারে। আবার কার্যপ্রণালীও দেখেও ধারনা করা যেতে পারে জীবের গঠনে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। যেমন, কোনো প্রাণী যদি ঠিকমত শ্বাস-প্রশ্বাস না নিতে পারে তাহলে আমরা ধারনা করতে পারি যে তার ফুসফুসে কোনো সমস্যা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসার কথা চিন্তা করতে পারি।

'গঠন কার্যকারিতা নির্ধারণ করে' - এটিকে জীববিজ্ঞানের একীকরণকারী মূলনীতিও (Unifying theme) বলা যায় কারণ এই মৌলিক ধারণাটি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যদিও এই ধারণাটি সাধারণ মনে হতে পারে, তবে জীববিজ্ঞান বোঝার ক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। জীববিজ্ঞানের অন্যান্য মৌলিক

ধারণাগুলোর মত এই ধারণাটিও জীববিজ্ঞানের জটিল ও বৈচিত্র্যময় দিকগুলোকে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

কোষঃ জীবের গঠন ও কার্যকারিতার মৌলিক ক্ষুদ্রতম একক।

কোষ (Cell) হল জীবনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সংগঠনিক একক, যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে পারে। কোষতত্ত্ব (Cell Theory) প্রথমবারের মতো ১৮০০ সালের দিকে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ১) সমস্ত জীব কোষ দ্বারা গঠিত , ২) কোষই জীবনের মৌলিক একক, এবং ৩) জীবের সমস্ত কর্মকাণ্ডই কোষের কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল **(চিত্র ১.৪.২.২)**।

উদাহরণস্বরূপ, যখন এই কেউ বাক্যটি পড়ছে, তখন তার চোখের পেশী কোষ (Muscle cells) ও স্নায়ু কোষে (Nerve cells) একসঙ্গে কাজ করে তাকে পড়ার অনুভূতি দিচ্ছে। এমনকি, কার্বন পরমাণুর পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ বা পুনঃচক্রায়ন (Carbon recycling)-এর মতো বড় একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়াও কোষের কাজের মাধ্যমেই ঘটে। যেমন, পাতার কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) সূর্যের আলো ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়া চালায়, যা এই চক্রেরই অংশ। সালোকসংশ্লেষণ হচ্ছে একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষের ক্লোরোপ্লাস্টে, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে, পরিবেশের বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও পানির (H_2O) বিক্রিয়ায় শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় এবং গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন (O_2) পরিবেশে নির্গত হয়।

প্রতিটি কোষের কিছু না কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি কোষ একটি ঝিল্লি (membrane) দ্বারা আবৃত থাকে, যা কোষ ও তার পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, কোষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ১) **আদিকেন্দ্রিক বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ** (Prokaryotic Cell) ২) **প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ** (Eukaryotic Cell)।

প্রোক্যারিয়টিক বা আদিকেন্দ্রিক কোষগুলো সাধারণত দুই ধরনের এককোষী জীবে দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়া [Bacteria, singular (একবচন): *bacterium (ব্যাকটেরিয়াম)*] এবং আর্কিয়া [Archaea, singular (একবচন): *archaean* (আর্কিয়ান)] এই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। আদিকেন্দ্রিক কোষে কোষকেন্দ্র (Nucleus, নিউক্লিয়াস) অথবা ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণু (Membrane-bound organelles) নেই। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য জটিল জীবরা

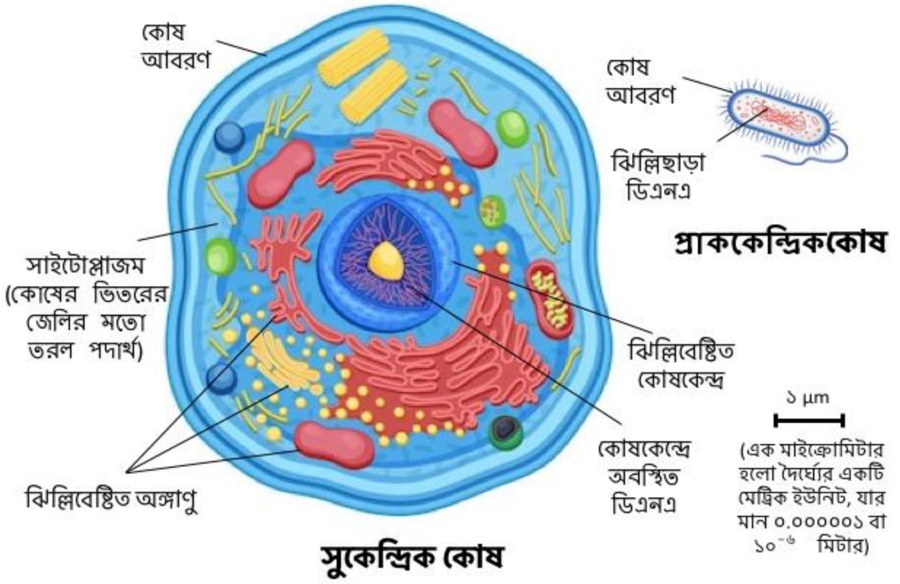

চিত্র ১.৪.২.২: ইউক্যারিওটিক এবং প্রোক্যারিয়টিক কোষের আকার ও জটিলতার তুলনা করা হয়েছে। এখানে কোষগুলো মাপনীতে (Scale) দেখানো হয়েছে। ১ মাইক্রোমিটার (μm) দাগটি দিয়ে ইউক্যারিওটিক এবং প্রোক্যারিয়টিক কোষকে তুলনা করলে বোঝা যাবে ইউক্যারিয়টিক কোষ সাধারণত প্রোক্যারিয়টিক কোষের তুলনায় আকারে অনেক বড় হয়।

সাধারণত ইউক্যারিয়টিক বা সুকেন্দ্রিক কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষে নিউক্লিয়াস এবং ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণু থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লোরোপ্লাস্ট শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় এবং এটি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রোক্যারিয়টিক কোষ সাধারণত ইউক্যারিয়টিক কোষের তুলনায় আকারে ছোট হয় **(চিত্র ১.৪.২.২)**।

১.৪.৩ জীবিত ব্যবস্থা শক্তি ও পদার্থ রূপান্তর করে। (Living systems transform energy and matter)

জীব সবসময় কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে। জীবের নড়াচড়া, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং কোষীয় বিভিন্ন কার্যক্রম —এসবই কাজ (Work), এবং কাজের জন্য শক্তি (Energy) প্রয়োজন। শক্তির প্রবাহ, প্রধানত সূর্যের আলো থেকে শুরু হয়ে, এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়ে জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখে **(চিত্র ১.৪.৩.১)**। উদ্ভিদের পাতা যখন সূর্যালোক শোষণ (Absorb) করে, তখন পাতার কোষের বিশেষ অণুগুলো সেই আলোর শক্তিকে রাসায়নিক (Chemical) শক্তিতে রূপান্তরিত করে, যা খাদ্য (যেমন শর্করা বা চিনি (Sugar)) হিসেবে সংরক্ষিত হয়।

এই রাসায়নিক শক্তি উদ্ভিদ ও অন্যান্য সালোকসংশ্লেষী জীব (উৎপাদক, Producer) থেকে ভোক্তা (Consumer) প্রাণীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। ভোক্তা হলো এমন জীব, যারা অন্যান্য প্রাণী বা উদ্ভিদ বা তাদের অংশ খেয়ে জীবনধারণ করে। যখন কোনো জীব রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে কোনো কাজ সম্পাদন করে, যেমন পেশি সংকোচন বা কোষ

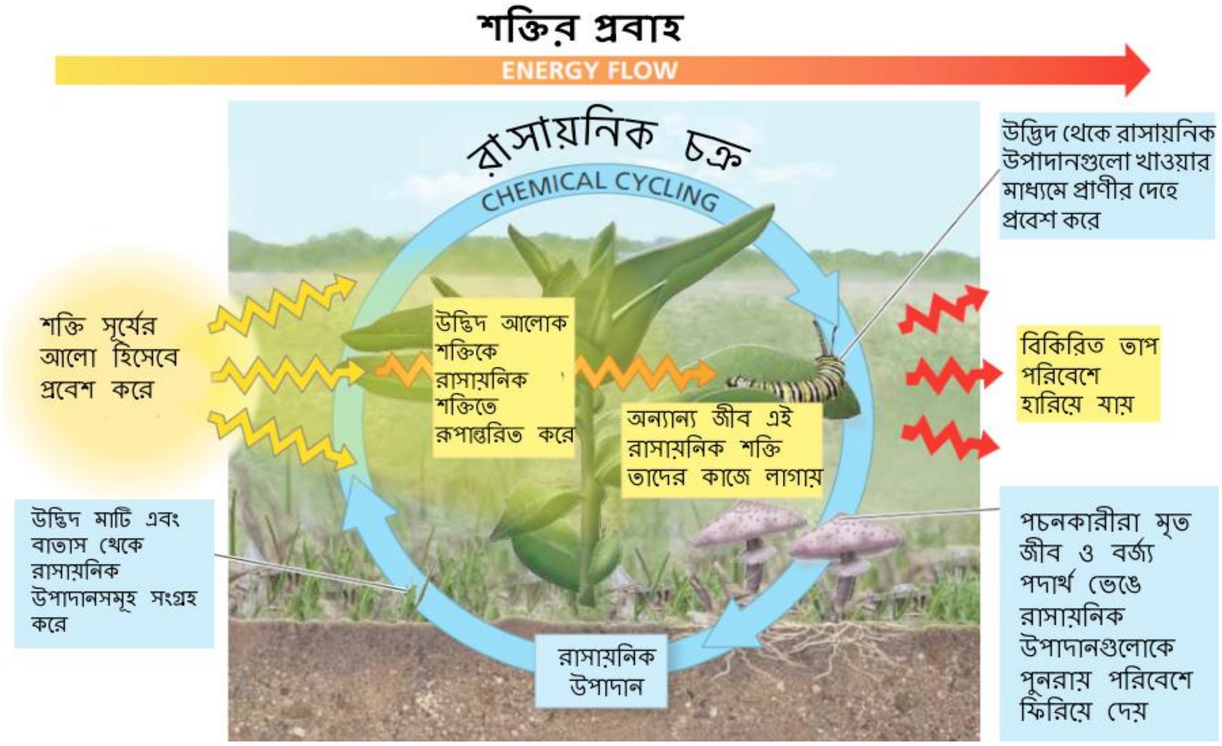

চিত্র ১.৪.৩.১: শক্তির প্রবাহ এবং রাসায়নিক চক্র (Energy Flow and Chemical Cycling)। পরিবেশে বা বাস্তুতন্ত্রে শক্তি একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়। সালোকসংশ্লেষণের (Photosynthesis) মাধ্যমে উদ্ভিদ সূর্যের আলো থেকে শক্তি গ্রহণ করে এবং এটিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করে (যা শর্করা ও অন্যান্য খাদ্য অণুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে)। এই রাসায়নিক শক্তি উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাপ আকারে পরিবেশে বিকিরিত হয়। অপরদিকে, রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রবাহ শক্তির মতো একমুখী নয়, বরং এটি জীব ও ভৌত পরিবেশের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন জীবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিবেশের অংশ হয়ে আবার জীবদের মধ্যে ফিরে আসে এবং এভাবে রাসায়নিক চক্র সম্পন্ন হয়।

বিভাজন, তখন সেই শক্তির কিছু অংশ পরিবেশে তাপ (Heat) আকারে হারিয়ে যায়। ফলে শক্তি বাস্তুতন্ত্রের বা জৈবিক কাঠামোগুলোর মধ্যে একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়—সাধারণত শক্তি সূর্যের আলো হিসেবে প্রবেশ করে এবং তাপ হিসেবে নির্গত হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন শক্তির প্রবাহের কারণেই জীবিত ব্যবস্থা (Living Systems) তাপীয় সাম্যাবস্থায় (Thermodynamic Equilibrium) থাকে না। যখন কোনো ব্যবস্থা তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন এর ভেতর এবং পরিবেশের সাথে শক্তি ও পদার্থের কোনো আদান-প্রদান থাকে না। অর্থাৎ, তখন এটি একটি স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু জীবিত ব্যবস্থা হলো উন্মুক্ত ব্যবস্থা (Living Systems are Open Systems), অর্থাৎ তারা পরিবেশের সাথে ক্রমাগতভাবে যোগাযোগ রাখে—শক্তি ও পদার্থ গ্রহণ করে এবং বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে। জীবিত ব্যবস্থাগুলো তাদের জটিল ও সুসংগঠিত কাঠামো ও কার্যপ্রণালি বজায় রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন শক্তি গ্রহণ করে। তবে, এই শক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কার্যকরী নয়, কারণ এর কিছু অংশ তাপ আকারে অপসারিত হয়। এর ফলে, তারা কখনোই সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় না এবং বিকিরিত তাপের কারণে পুরো পরিবেশের এনট্রপি Entropy বা বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যদি কোনো জীবিত ব্যবস্থা বা জীব সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যায়, তবে সেটি কেবল তা যা দিয়ে গঠিত অর্থাৎ তার রাসায়নিক উপাদানগুলোর যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acids), নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) ও অন্যান্য ছোট অণুর একটি মিশ্রণ হয়ে থাকবে। যেহেতু তার মধ্যে আর শক্তির কোনো আদান-প্রদান থাকেবনা, তাই সেটিও আর কোনো গতিশীল ও জটিল ব্যবস্থা হিসেবে থাকবে না।

অপরদিকে রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রবাহ (Flow) ভিন্ন। রাসায়নিক উপাদানগুলো পরিবেশের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে—সেগুলো ব্যবহার করা হয় এবং পুনরায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয় (চিত্র ১.৪.৩.১)। উদ্ভিদ যখন বাতাস বা মাটি থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান গ্রহণ করে, তখন সেগুলো উদ্ভিদের দেহে সংযুক্ত হয় এবং সেই উদ্ভিদ খেলে তা প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে, যখন এই প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা যায়, তখন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মতো অপঘটকরা বা পচনকারীরা (Decomposer) মৃতদেহ ও বর্জ্য পদার্থ ভেঙে রাসায়নিক উপাদানগুলোকে পুনরায় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এরপর সেই উপাদানগুলো আবার উদ্ভিদের দ্বারা শোষিত হয়, ফলে এটি একটি পুনরাবৃত্ত চক্র (Cycle) তৈরি করে।

১.৪.৪ জীবন রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের অধীন। (Life is subject to chemical and physical laws)

জীবিত ব্যবস্থা সকল রাসায়নিক (Chemical) ও ভৌত (Physical) নীতিগুলোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যদিও সুস্পষ্ট মনে হতে পারে, তবে এটি জোর দিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, জীববৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আসলে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রয়োগ। জীববিজ্ঞানে কোনো নতুন রাসায়নিক বা ভৌত আইন নেই; বরং এটি পরিচিত রাসায়নিক নীতিগুলোর ধারাবাহিক প্রয়োগ মাত্র।এজন্য, পরমাণুর গঠন, রাসায়নিক বন্ধন, তাপগতিবিদ্যা, গতিবিদ্যা এবং মৌলিক রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জীববিজ্ঞান বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শুধুমাত্র "কোষ ও অণুসমূহ" সম্পর্কিত অধ্যায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক, কিন্তু বাস্তবে, এই নীতিগুলো পুরো জীববিজ্ঞান জুড়েই প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদের ভেতরে পানির প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে পানির মৌলিক রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল, বৃক্ক বা কিডনি (Kidney) একটি আস্রবণশীল (Osmotic) যন্ত্র, জৈবিক কাঠামোতে বা বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টি চক্র তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক মৌল (Element) বা রাসায়নিক উপাদান (Chemical) জৈবরাসায়নিক চক্রের (Biogeochemical cycles) মধ্য দিয়ে পরিবেশে আবর্তিত (Cycle) হয়।

১.৪.৫ জীবিত ব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে। (Living systems depend on exchange of information)

জীবিত ব্যবস্থা বা জীব কি রকম হবে, প্রকৃতিতে নিজেকে কিভাবে টিকিয়ে রাখবে, বা বংশবিস্তার করবে তা নির্ভর করে জীবের নিজের মধ্যে থাকা তথ্য এবং পরিবেশে থাকা বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের উপর। জীবিত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত তথ্যের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো বংশগতীয় বা জেনেটিক তথ্য (Genetic Information), যা প্রতিটি কোষে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, DNA) অণু আকারে সংরক্ষিত থাকে। ডিএনএ-তে সংরক্ষিত তথ্য জীবের কোষীয় উপাদান তৈরির নির্দেশনা প্রদান করে যা কোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। জীবের কোষ হলো অত্যন্ত জটিল ক্ষুদ্র যন্ত্র বা ন্যানোমেশিন (Nanomachine), যা তথ্য গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। কোষের মাধ্যমেই জীবিত ব্যবস্থা তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানায়। যেমন, কেউ যখন এই বাক্যটি পড়ছে, তখন তার চোখের এবং মস্তিষ্কের কোষগুলো সমস্ত তথ্য গুলো সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করে তাকে পড়ার অনুভূতি দিচ্ছে।

কোষ তাদের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ করে, এবং সংকেত স্থানান্তর (Signal transduction) ব্যবস্থা ব্যবহার করে কোষের আকৃতি, আচরণ বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনে। এই বিষয়গুলো পরবর্তীতে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

ডিএনএ: জীবনের বংশগতীয় উপাদান যা জীবের গঠন, কাজ ও বংশবিস্তারের তথ্য ও নির্দেশাবলী সংরক্ষণ করে।

জীব মূলত রাসায়নিক মৌল, জৈব অণু এবং কোষের সমন্বয়ে গঠিত। জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জৈবিক অণুগুলি (Biomolecules) চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত যায়। এগুলো হচ্ছেঃ প্রোটিন (আমিষ, Proteins), কার্বোহাইড্রেট (শর্করা, Carbohydrates), লিপিড (চর্বি বা তেলজাতীয়, Lipids), এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (এক ধরনের জৈব অম্ল যা কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের প্রধান উপাদান, Nucleic Acids)। প্রোটিন হচ্ছে জৈব উৎসেচক বা এনজাইম, হরমোন এবং কোষের গঠন বা আকৃতি তৈরির প্রধান উপকরণ। কোষের শক্তির প্রধান উৎস, যেমন গ্লুকোজ ও স্টার্চ, এগুলো হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। লিপিড কোষের আবরণ, শক্তি সংরক্ষণ ও হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। কোষকেন্দ্রর ক্রোমোসোমে (Chromosome, বাংলায় 'ক্রোমোজোম' ও লেখা হয়) থাকা ডিএনএ (DNA) ও ডিএনএ থেকে প্রতিলিপির মাধ্যমে তৈরি আরএনএ (RNA) হচ্ছে এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড, যারা জেনেটিক তথ্য এবং প্রোটিন তৈরির নির্দেশাবলী সংকেত আকারে নিজেদের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখে। ডিএনএ-তে থাকা নির্দেশাবলিই কোষের পরিচয় ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। সর্বোপরি, জৈবিক অণুগুলির সম্মিলিত কাজের মাধ্যমেই জীবনীশক্তি বজায় থাকে, জীব তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে এবং প্রকৃতিতে বিস্তার লাভ করে।

মানুষের জীবন শুরু হয় একটি কোষ থেকে যা তার মাতা-পিতার ডিম্বানু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে তৈরি হয়। এই কোষ তার পিতা-মাতার থেকে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম তন্তুসদৃশ বস্তু বা ক্রোমোসোমগুলো (Chromosome) ধারণ করে। প্রতিটি ক্রোমোসোমে এক দীর্ঘ ডিএনএ অণু থাকে, যেখানে হাজার হাজার বংশাণু বা জিন (Gene) থাকে । এই জিনগুলো ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট কিছু অংশ, যা বংশগতির একক (Units of Inheritance) হিসেবে কাজ করে। পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের কাছে এই জিনগুলো স্থানান্তরিত হয় এবং কোষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জৈবিক অনু তৈরির নির্দেশ সংরক্ষণ করে। প্রতিটি কোষ বিভাজনের পূর্বে ডিএনএ-এর অনুলিপি তৈরি হয় এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি কোষ তৈরি হয় যা মানুষের শরীর গঠন করে **(চিত্র ১.৪.৫.১)**। কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির সময়, ডিএনএ-তে থাকা জেনেটিক তথ্য মানুষের

শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিচালনা করে **(চিত্র ১.৪.৫.২)**।

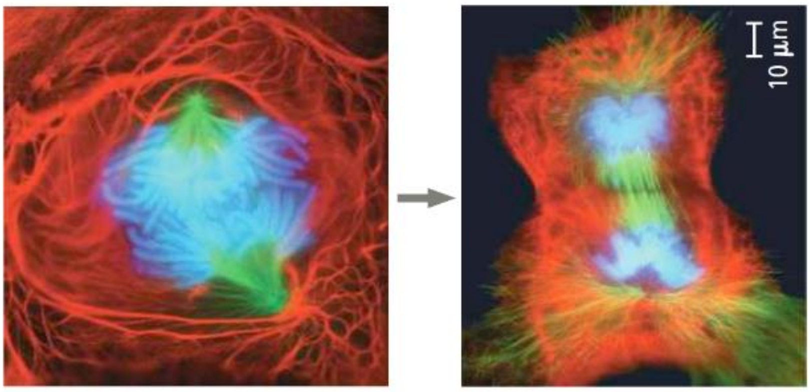

চিত্র ১.৪.৫.১: কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি ক্ষুদ্রতর কোষ তৈরি করে, যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে আবার বিভাজিত হয়। কোষ বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হলে, বিশেষ রঞ্জক ব্যবহার করে ক্রোমোসোমগুলোকে দৃশ্যমান করা যায়। এখানে রঞ্জকগুলো ক্রোমোসোমের ডিএনএ-এর সাথে যুক্ত হয়ে নীল রঙ ধারণ করেছে যার কারণে দেখা যাচ্ছে কিভাবে নতুন ক্রোমোসোমগুলো বিভক্ত হয়ে নতুন কোষে যাচ্ছে।

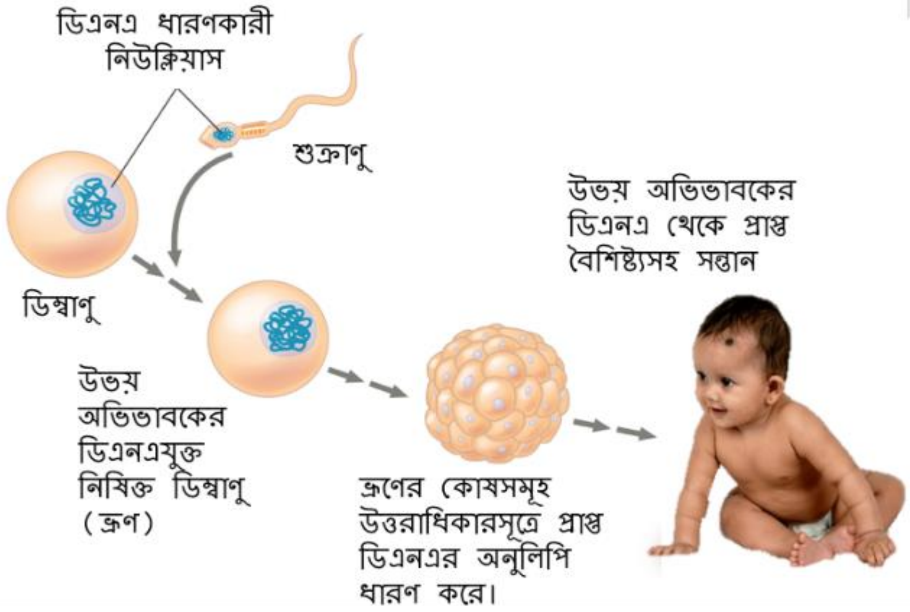

চিত্র ১.৪.৫.২: পিতা-মাতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ডিএনএ একটি জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশকে পরিচালিত করে।

ডিএনএ তার গঠনের মাধ্যমে কোষের প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংরক্ষণ করে।

ডিএনএ কিভাবে তথ্য নিজের মধ্যে ধরে রাখে তা বুঝতে হলে তার আণবিক গঠনকে (Molecular Structure) বুঝতে হবে। ডিএনএ-এর আণবিক গঠনই তার তথ্য সংরক্ষণের সক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করে। ডিএনএ হচ্ছে বৃহদাণু (Macromolecule) যা দুটি দীর্ঘ সুতা বা তন্তু (Strand) জাতীয় যৌগিক অণু দ্বারা গঠিত। এই তন্তু দুটি সর্পিল আকারে পেঁচিয়ে ডিএনএ-কে একটি শৃঙ্খল বা শিকলের আকৃতিতে বিন্যস্ত করে। ডিএনএ-এর এই গঠনকে বলা হয় ডাবল হেলিক্স (Double Helix)। প্রতিটি তন্তু চার ধরনের নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) উপাদান দ্বারা তৈরি, তা হল অ্যাডেনিন (Adenine), সাইটোসিন (Cytosine), গুয়ানিন (Guanine) এবং থাইমিন (Thymine)। এগুলোকে সংক্ষেপে A, T, C, এবং G দ্বারা সাঙ্কেতিকভাবে লেখা হয় **(চিত্র ১.৪.৫.৩)**। এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় অ্যাডেনিন (A) শুধুমাত্র থাইমিনের (T) সাথে এবং গুয়ানিন (G) শুধুমাত্র সাইটোসিনের (C) সাথে যুক্ত হয়। নিউক্লিওটাইডগুলো একটির সাথে আরেকটি পরস্পর লেগে থাকে

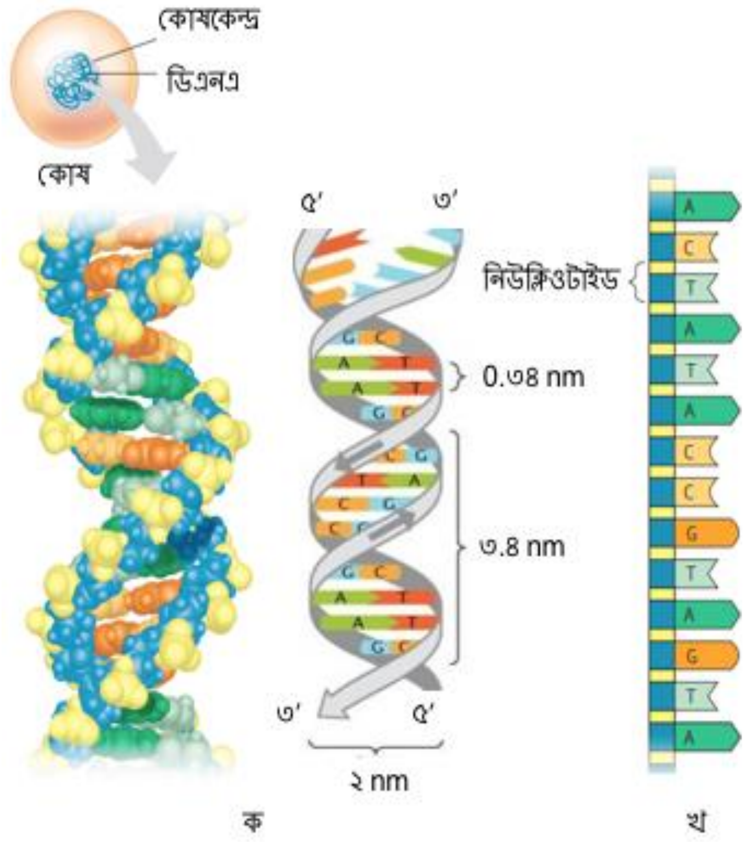

চিত্র ১.৪.৫.৩: ডিএনএ বা বংশগতীয় উপাদানের আণবিক গঠন। ক, জৈব অণু ডিএনএ দুটি দীর্ঘ শৃঙ্খল তন্তু (Strand, স্ট্র্যান্ড) দ্বারা গঠিত, যা নিউক্লিওটাইড নামক মৌলিক উপাদান (Building block, বিল্ডিং ব্লক) দ্বারা তৈরি। তন্তু দুটি সর্পিল আকারে পেঁচিয়ে এটি ত্রিমাত্রিক আকৃতি বা আদল (Model) ধারণ করে যা ডাবল হেলিক্স মডেল (Double Helix Model) নামে পরিচিত।। ডিএনএ-র বিভিন্ন অংশের মাপ nm (Nanometer, ন্যানোমিটার বা ১০$^{-৯}$ মিটার) এককে দেখানো হয়েছে। খ, ডিএনএ অণুর একক স্ট্র্যান্ডের নিউক্লিওটাইডগুলোর বিন্যাস প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ডিএনএতে চার ধরনের নিউক্লিওটাইড নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত থাকে, যা বংশগত বা জিনগত তথ্য সংরক্ষণ করে। এই চারটি নিউক্লিওটাইডের সংক্ষিপ্ত নাম হলো A, T, C, এবং G।

এবং বিভিন্ন ক্রম বা বিন্যাসে সাজানো থাকে, যেমন ATGCTAGTCGATATA। ডিএনএ-তে থাকা এরকম একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড বিন্যাস (Nucleotide Sequence) প্রোটিন বা কোষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংকেত আকারে নিজের মধ্যে লিপিবদ্ধ (Encode, এনকোড) করতে পারে । আর এই তথ্য লিপিবিদ্ধ বা ধারণকৃত নিউক্লিওটাইড বিন্যাসকে বলা হয় বংশানু বা জিন (Gene)। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ-তে থাকা জিনসমূহ এমন প্রোটিনজাতীয় উৎসেচক (Enzyme, এনজাইম) তৈরি করতে পারে যা চিনির অণু (Sugar Molecule) ভাঙতে সাহায্য করে। আবার, মানুষের জিনসমূহ প্রোটিনজাতীয় প্রতিরক্ষিকা (Antibody, অ্যান্টিবডি) তৈরি করতে পারে যা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নিউক্লিওটাইডগুলো অনেকটা ভাষার বর্ণমালার মতো কাজ করে—যেমন, "RAT" শব্দটি প্রাণী বড় ইঁদুর জাতীয় প্রাণীকে বোঝায়, কিন্তু একই অক্ষর দিয়ে "ART (শিল্প)" লেখা হলে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়।

একইভাবে, ডিএনএ-র চার ধরনের নিউক্লিওটাইডগুলো হচ্ছে একধরনের বর্ণমালা বা সংকেত (Four-letter Code) যা বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত হয়ে জিন গঠন করতে পারে। জিনের নিউক্লিওটাইড বিন্যাস বা ক্রম কোষের বিভিন্ন প্রোটিন তৈরির নীল নকশা (Blueprint, ব্লুপ্রিন্ট) হিসেবে কাজ করে।

ডিএনএ-এর জিন থেকে প্রোটিন উৎপাদনের প্রক্রিয়া

জিনের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ বা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জিন প্রকাশ (Gene Expression) বলা হয় **(চিত্র ১.৪.৫.৪)**। জিন প্রকাশ পরোক্ষভাবে (Indirectly) ঘটে, যেখানে আরেক ধরনের জৈব অম্ল, আরএনএ (RNA), মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। এই আরএনএগুলো উৎসেচক বা এনজাইমের মাধ্যমে ডিএনএ থেকেই তৈরি হয়। আমরা জানি কোষের বিভিন্ন দরকারি উপাদান ডিএনএ-এর মধ্যে জিন হিসেবে সাংকেতিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। জিন থেকে কোষের ঐ দরকারি উপাদান যেমন প্রোটিন তৈরির

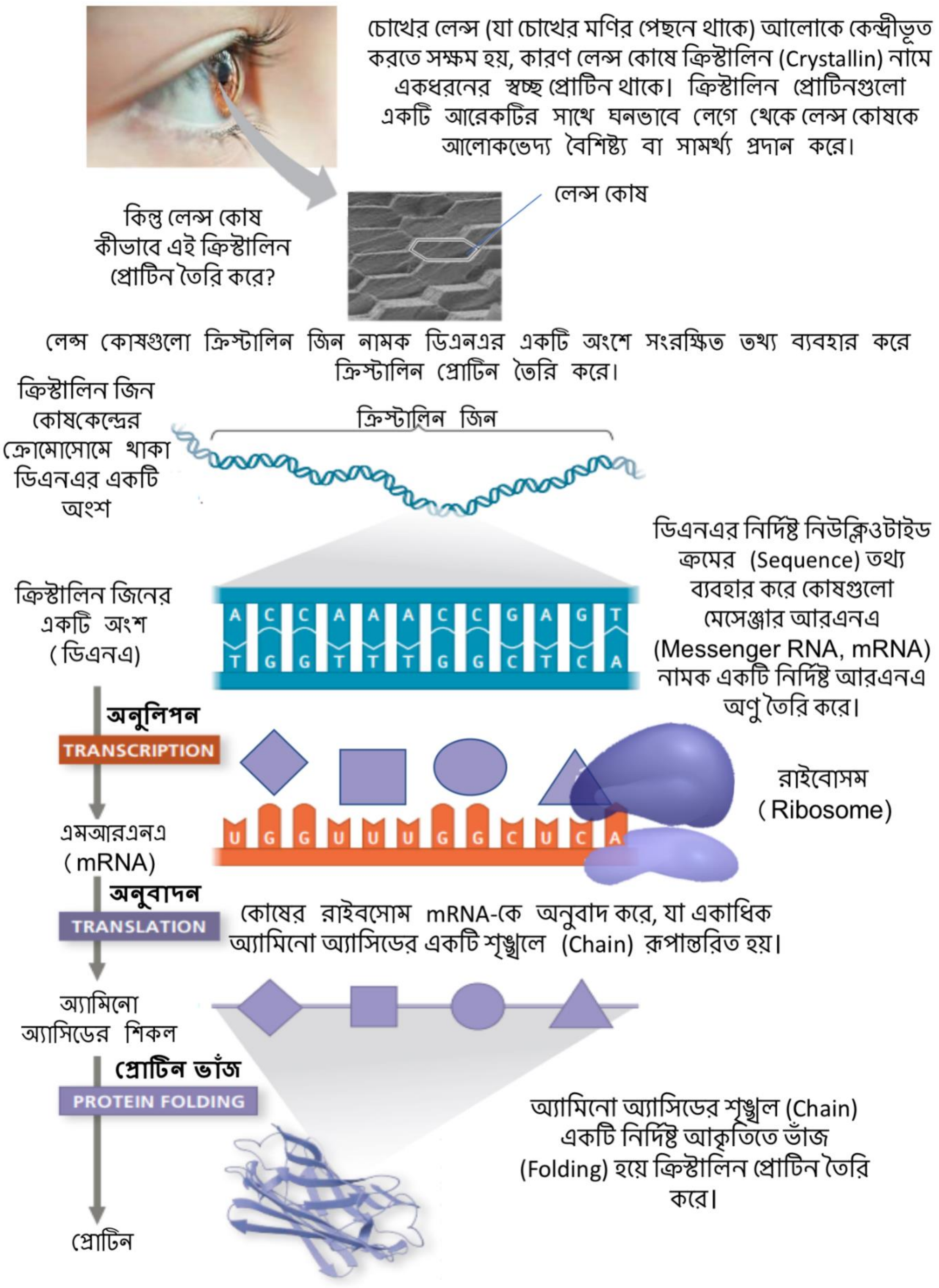

চিত্র ১.৪.৫.৪: জিন প্রকাশ (Gene Expression)। কোষ একটি জিনে সঞ্চিত তথ্য ব্যবহার করে তার দরকারি, উপযোগী এবং কার্যকরী প্রোটিন তৈরি করে।

প্রথম ধাপ হচ্ছে জিনটির নিউক্লিওটাইড ক্রম থেকে এনজাইম দ্বারা একধরনের বিশেষত বার্তাবাহী আরএনএ (Messenger RNA, mRNA) তৈরি করা যা সাংকেতিকভাবে প্রোটিন তৈরির নির্দেশাবলী বহন করে । ডিএনএ থেকে আরএনএ-এর প্রতিলিপি তৈরির এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুলিপন বা ট্রান্সক্রিপশন (Transcription)। এমআরএনএ (mRNA) তৈরি হয়ে গেলে তা কোষে অবস্থিত রাইবোসমের দিকে ধাবিত হয়। রাইবোসমে হচ্ছে কোষের প্রোটিন তৈরির যন্ত্রাংশ যা এমআরএনএ-তে লিপিবদ্ধ বংশগতীয় সাংকেতিক নিউক্লিওটাইডগুলো বা জেনেটিক কোডগুলোকে (Genetic Code) প্রোটিনে অনুবাদ করতে পারে। এই প্রোটিন অনুবাদন (Translation) হচ্ছে এমন একটি বিক্রিয়া যেখানে এমআরএনএ-তে থাকা জেনেটিক কোডগুলোর নির্দেশ অনুযায়ী রাইবোসম (Ribosome) জৈব যৌগ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে (Amino Acid, প্রোটিন তৈরির মৌলিক উপাদান) শিকলেরমত সাজিয়ে এবং একত্রিত করে আরও বৃহৎ জৈব যৌগ (Macromolecule) প্রোটিন করে। জেনেটিক কোডগুলো এমআরএনএ-তে থাকা চার ধরনের নিউক্লিওটাইডঃ অ্যাডেনিন (Adenine, A), গুয়ানিন (Guanine, G), সাইটোসিন (Cytosine, C) ও ইউরাসিল (Uracil, U) দিয়ে গঠিত হয়। তিনটি নিউক্লিওটাইড মিলে একটি সাঙ্কেতিক একক বা জেনেটিক কোডন (Codon) গঠন করে, যা প্রোটিন সংশ্লেষণের পরবর্তী ধাপে কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড যোগ করতে হবে, তা নির্ধারণ করে।যেমন, UGG কোডনটি ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan, Trp) নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য সংকেত বহন করে। বিশ্বের সকল জীব প্রায় প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য একই জেনেটিক কোড (Genetic Code) ব্যবহার করে। তবে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য তাদের নিউক্লিওটাইড ক্রমের বা জিনের পার্থক্যের কারণে হয়, জেনেটিক কোডের কারণে নয়। এই জেনেটিক কোডের সর্বজনীনতা (Universality) প্রমাণ করে যে সমস্ত জীব একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

এমআরএনএ (mRNA)-র মাধ্যমে প্রোটিন উৎপাদন ছাড়াও, আরএনএ (RNA)-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন কোষের প্রোটিন তৈরির যন্ত্রাংশ (Ribosome) আরেক ধরনের কিছু নির্দিষ্ট আরএনএ অণু দিয়ে তৈরি। সাম্প্রতিক গবেষণায় আরও অনেক নতুন ধরনের আরএনএ পাওয়া গেছে, যা জিনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে (Gene Regulation) ভূমিকা রাখে। জিনগুলোর এই আরএনএ উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোকেও জিন প্রকাশ বা জিন এক্সপ্রেশন (Gene Expression) বলা হয়। ডিএনএ-এর মাধ্যমে প্রোটিন ও আরএনএ তৈরির নির্দেশ সংরক্ষণ এবং কোষ বিভাজনের সময় এই তথ্য অনুলিপির মাধ্যমে বংশগতির তথ্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে (Generation to Generation) নির্ভুলভাবে স্থানন্তরিত (Transferred) এবং সংরক্ষিত (Preserved) হয়।

জিনোমিক্স: ডিএনএ-তে থাকা জিন ক্রমের বৃহৎ পরিসরের বিশ্লেষণ

একটি জীব তার পূর্বপুরুষদের থেকে যে বংশগতীয় তথ্য (Genetic Information) বা নির্দেশনা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, সেটিকে পুরোবংশাণু বা বংশাণুসমগ্র (Genome, জিনোম) বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের ক্রোমোসোমে থাকা সমস্ত বংশাণু বা জিনের সমষ্টিকে বংশাণুসমগ্র বা জিনোম বলে। জীবের জিনোমে বা বংশাণুসমগ্রে ঐ জীবের বংশগতিমূলক সমস্ত তথ্য ক্রোমোসোমের ডিএনএ-তে থাকা নিউক্লিওটাইড বিন্যাসে বা অনুক্রমে (Sequence) সাংকেতিকভাবে সংরক্ষিত (Encoded) থাকে। জীববিজ্ঞানের যে শাখাতে জিনোম বা বংশাণুসমগ্র নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয়, তাকে বলা হয় জিনোমিক্স (Genomics) বা বংশাণুসমগ্র বিজ্ঞান **(চিত্র ১.৪.৫.৫)**।

মানব দেহকোষে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬ টি ক্রোমোসোম থাকে। ২৩টি ক্রোমোসোম মিলে একটি ক্রোমোসোমের কেতা বা সেট (Set, একজাতীয় বহুসংখ্যক বস্তু বা উপাদান)। অর্থাৎ কোষে দুটি অনুরূপ ক্রোমোসোম সেট

থাকে। প্রতিটি ক্রোমোসোম সেটে আনুমানিক ৩ বিলিয়ন (৩ x ১০^{৯}) নিউক্লিওটাইড জোড়া (Nucleotide Pairs) থাকে। যদি এই নিউক্লিওটাইডগুলো এক-অক্ষরে লেখা হয়, তাহলে ৭০০টি জীববিদ্যার পাঠ্যপুস্তক পূর্ণ হয়ে যাবে।

যে প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে ক্রোমোসোমের ডিএনএ-তে থাকা নিউক্লিওটাইডগুলোর ধারাবিন্যাস বা অনুক্রম নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ পুরোবংশাণুর বা জিনোমের অনুক্রম নির্ণয় করা হয়, তাকে জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome Sequencing, জিনোম সিকোয়েন্সিং) বলে। ১৯৯০-এর দশকে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির কারণে, আমরা এখন ডিএনএ-তে নিউক্লিওটাইডগুলো, যেমন ATGCTGATCGGCA, কিভাবে বিন্যস্ত থাকে তা খুব দ্রুততই জানতে পারি। আজ, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, ও ব্যাকটেরিয়ার সম্পূর্ণ

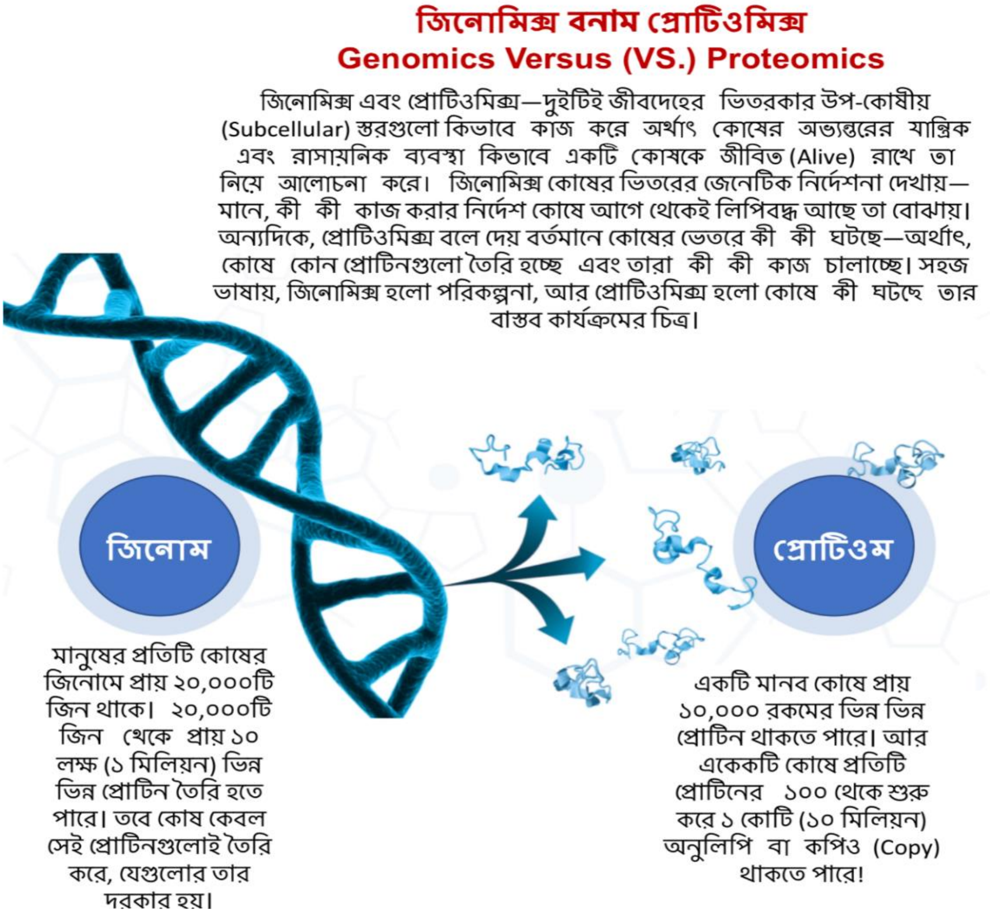

চিত্র ১.৪.৫.৫: জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স জীবনের গভীর রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করে। সাধারণভাবে দেখলে, জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স যেন একই প্রশ্নের উত্তর জানার দুইটি আলাদা উপায়। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ “একটি কোষের ভেতরে অণুস্তরে (Molecular level) ঠিক কী ঘটছে, যা কোষকে সচল রাখে?” জিনোমিক্স এবং প্রোটিওমিক্স বিষয়গুলো ব্যবহার করে জানা যায় কেন দুটি মানুষ একে অপরের থেকে আলাদা, কিংবা কোনো রোগের কারণ কী। বাস্তবে, জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স একে অপরের পরিপূরক (Complementary)। এই দুটি বিষয় একসাথে ব্যবহার করলে বিজ্ঞানীরা কোষের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্পর্কে অভূতপূর্ব (Unprecedented) অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন অর্থাৎ কোষের ভিতরের ক্রিয়াকলাপ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন। সরল ভাষায়, জিনোমিক্স জানায় আমাদের দেহের গঠনের নীল নকশা (Blueprint), আর প্রোটিওমিক্স দেখায় সেই নকশা অনুযায়ী কোষের ভিতর এখন কী কী কাজ চলছে। এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে, বিজ্ঞানীরা জীবনের মূল ভিত্তি ও জটিল প্রক্রিয়াগুলো বোঝার এক নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে পারেন।

নিউক্লিওটাইডগুলোর অনুক্রম বা জিনোম সিকোয়েন্স (Genome Sequence) আমরা জেনে ফেলেছি। যার কারণে আমাদের কাছে এখন বিপুল পরিমাণ জিনগত ও অন্যান্য কোষসম্পর্কিত তথ্য আছে। এই বিপুল পরিমাণ তথ্য কিভাবে জীবের আণবিক এবং কোষীয় স্তরে (Molecular and Cellular Level) কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা সিস্টেমস বায়োলজি (Systems Biology) বা সাংশ্রয়িক জীববিজ্ঞান নামক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আগে যেখানে একটি নির্দিষ্ট জিন নিয়ে গবেষণা করা হতো, এখন জিনোমিক্সে বা বংশাণুসমগ্র বিজ্ঞানে একাধিক প্রজাতির একসাথে অনেকগুলো জিন বা ডিএনএ সেট নিয়ে বৃহৎ পরিসরে গবেষণা বা অধ্যয়ন করা হয়। অনুরূপভাবে, প্রোটিওমিক্স (Proteomics) বা প্রোটিনসমগ্র বিজ্ঞানে একটি কোষ, টিস্যু বা জীবদেহে প্রকাশিত (Expressed) সমস্ত প্রোটিন ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন করা হয়। একটি কোষ, টিস্যু বা সম্পূর্ণ জীব-দেহে তৈরি হওয়া সব প্রোটিনকে একসাথে বলে প্রোটিওম (Proteome) **(চিত্র ১.৪.৫.৫)**।

জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স এই নতুন দুটি বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে। এগুলো হলঃ ১, হাই-থ্রুপুট প্রযুক্তি (High-throughput technology) - এমন প্রযুক্তি যা অসংখ্য জৈবিক নমুনা বা তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ২, জৈব তথ্যবিজ্ঞান বা বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) - জীববিজ্ঞানের শাখা যেখানে কম্পিউটার ভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স গবেষণার বিপুল পরিমাণ তথ্যাবলী বা ডেটা (Data) সংরক্ষণ, সংগঠিতকরণ, ও বিশ্লেষণ করা হয়। ৩, আন্তঃবিষয়ক গবেষণা দল (Interdisciplinary Research Teams) - জীববিজ্ঞানী, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, প্রকৌশলী, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, এবং বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা একসাথে হয়ে তাদের জ্ঞান ভাগ (Knowledge Sharing) করে নেন এবং একত্রে গবেষণা (Research) করেন। জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স অধ্যয়ন ও গবেষণার লক্ষ্য হলো কীভাবে ডিএনএ দ্বারা সংকেতকৃত সমস্ত প্রোটিন এবং আরএনএ কোষ ও জীবদেহে সমন্বিতভাবে কাজ করে তা বোঝা এবং মানুষের উপকারে প্রয়োগ করা ।

১.৪.৬ জীবিত ব্যবস্থা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। (Living systems depend on interactions)

জীববিজ্ঞানের যে কোনো স্তরে— অণু থেকে শুরু করে পুরো বাস্তুতন্ত্র পর্যন্ত—জৈব ব্যবস্থার বা সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদান পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে নিজেদেরকে চলমান রাখে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যেমন কোষের ভিতরের অণুগুলোকে একসাথে মিলে কাজ করতে সাহায্য করে, তেমনি বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব ব্যবস্থাকে সচল রাখে। নিচে আমরা দু'টি উদাহরণ দেখব—প্রথমটি হল জীবদেহের অভ্যন্তরে অণুগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং দ্বিতীয়টি হল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উপাদানগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

জীবের অভ্যন্তরের অণুগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

জীবদেহের বিভিন্ন স্তর—অঙ্গ, কলা, কোষ ও অণু—এই সবগুলো উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকাটা জীবদেহের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো মানুষের রক্তে থাকা গ্লুকোজ (Glucose, চিনি বা শর্করা জাতীয় পদার্থ যা কোষের শক্তি ও বিপাকীয় প্রক্রিয়ার অন্যতম উৎস) কী পরিমাণে থাকবে তার নিয়ন্ত্রণ (Regulation) পদ্ধতি। শরীরের কোষগুলোর জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ দরকার। কিন্তু বেশী গ্লুকোজ আবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই শরীরকে এমনভাবে কাজ করতে হয় যাতে যখন দরকার তখন গ্লুকোজ পাওয়া যায়, আবার অতিরিক্ত হলে তা জমাও রাখা যায়। শরীরে গ্লুকোজ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয়

একটি স্ব-নিয়ন্ত্রণমূলক (Self-regulatory) পদ্ধতির মাধ্যমে, যাকে প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ বা ফিডব্যাক রেগুলেশন (Feedback Regulation) বলা হয়। ফিডব্যাক রেগুলেশন বা প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একটি চক্রাকার পদ্ধতি। এই প্রতিক্রিয়া চক্র (Feedback Loop) এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শরীরের কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল (Output, আউটপুট) আবার সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে।

জীবে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ বা ফিডব্যাক রেগুলেশন দেখা যায়। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Negative Feedback) এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Positive Feedback)। জীবদেহের গতানুগতিক (Common) নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া হলো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (**চিত্র ১.৪.৬.১**)। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণঃ যখন খাওয়ার পরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন অগ্ন্যাশয় (Pancreas) থেকে ইনসুলিন (Insulin) নামক হরমোন (Hormone) নিঃসৃত হয়। হরমোন (ইংরেজি: Hormone, গ্রিক: ὁρμή) শব্দের অর্থ হল 'জাগ্রত করা'বা 'উত্তেজিত করা। এটি এক ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থ (প্রাণরস) যা শরীরের কোনো কোষ বা গ্রন্থি থেকে শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশে নিঃসরিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (Diffusion) উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রিয়ার পর নিঃশেষ হয়ে যায়। শরীরে ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত হলে তা শরীরের কোষগুলোকে গ্লুকোজ শোষণ করতে এবং যকৃতকে (Liver) গ্লুকোজ সংরক্ষণ করতে বলে, যার ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যায়। গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে ইনসুলিন নিঃসরণের উদ্দীপনা (Stimulus) কমে যায়—এভাবে প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায় এবং শরীরে গ্লুকোজের ভারসাম্য বজায় থাকে। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় একটি প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল (Output, আউটপুট) নিজের উৎসকে ধীরে ধীরে চক্রাকারে বন্ধ করে দেয়। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্রে (Feedback Loop) প্রথমে বেড়ে যাওয়া গ্লুকোজের যোগান (Input, ইনপুট) ইনসুলিনের পরিমাণ (ফলাফল, Output) বাড়ায়, আবার পরে এই ইনসুলিনই ধারাবাহিকভাবে গ্লুকোজের পরিমাণ বা যোগান ((Input) কমিয়ে দেয়। এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র বা ফিডব্যাক লুপ (আউটপুট ইনপুটকে কমিয়ে দেয়া) ততক্ষণ চলতে

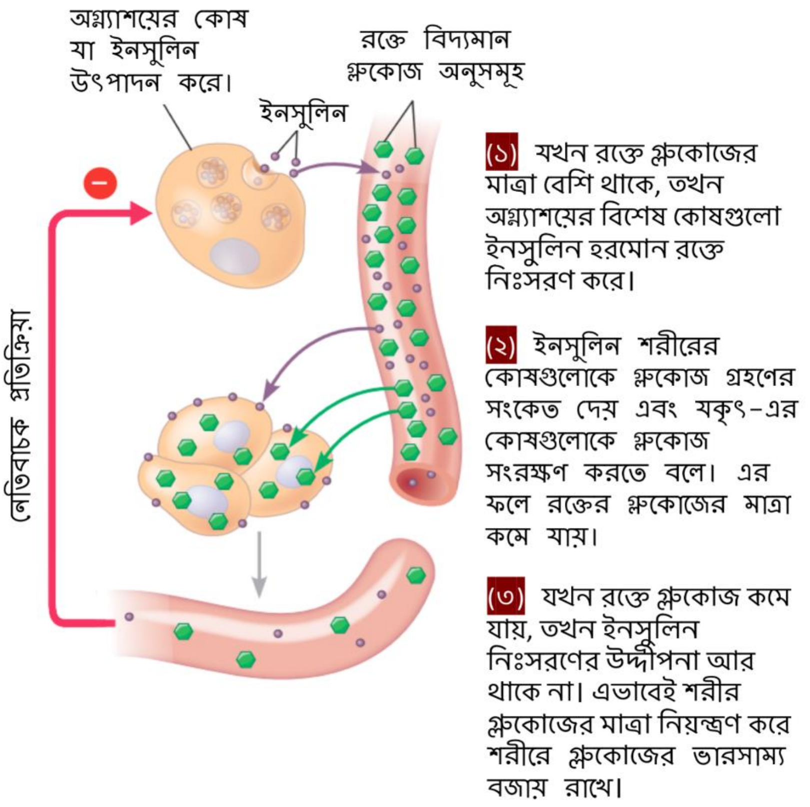

চিত্র ১.৪.৬.১: মানবদেহের প্রধান কোষীয় জ্বালানি গ্লুকোজের ব্যবহার ও সঞ্চয় নিয়ন্ত্রিত হয় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার (Negative Feedback) মাধ্যমে।

থাকে যতক্ষণনা গ্লুকোজের পরিমাণ রক্তে স্থিতিশীল হয়।

যদিও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, কিছু শারীরিক প্রক্রিয়া ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Positive Feedback) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে প্রতিক্রিয়ার ফলাফল নিজেই আরও বেশি ফলাফল তৈরি করতে সহায়তা করে। রক্ত জমাট বাঁধার (Blood Clotting) প্রক্রিয়াটি হল ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ **(চিত্র ১.৪.৬.২)**। কোনো রক্তনালী কেটে গেলে, রক্তের প্লেটলেট (Platelets) গিয়ে সেখানে জমা হতে শুরু করে। এই প্লেটলেটগুলো এমন কিছু রাসায়নিক নিঃসরণ করে, যা আরও প্লেটলেটকে সেই স্থানে টেনে আনে। এভাবে দ্রুত আরও প্লেটলেট জমা হয় এবং একসাথে কাজ করে ক্ষতস্থানটি বন্ধ করার জন্য এক ধরনের জমাট (Clot) তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াটি একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র বা ফিডব্যাক লুপ (Feedback Loop), কারণ টিস্যু কেটে যাওয়া এমন এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে, যা প্রতিক্রিয়াকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যে প্লেটলেটগুলো নিঃসরিত হয় তা আরও প্লেটলেট নিঃসরণ বাড়ায় যা দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

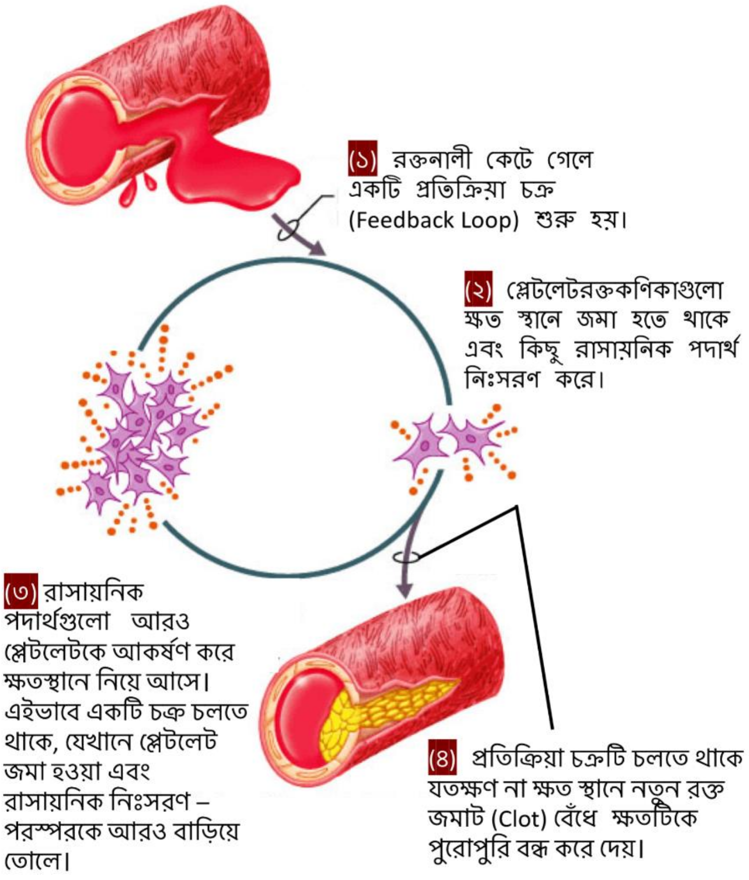

চিত্র ১.৪.৬.২: রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটি একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Positive Feedback)।

বাস্তুতন্ত্রে একটি জীবের অন্যান্য জীব এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

প্রকৃতিতে প্রতিটি জীব অন্য জীব ও তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক (Interaction) স্থাপন করে। যেমন, একটি আকাশমণি বা অ্যাকেশা (বৈজ্ঞানিক নাম: *Acacia auriculiformis*) গাছ তার শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত মাটির জীবাণু, এর উপর বসবাসকারী পোকামাকড়, এবং এর পাতা ও ফল খাওয়া প্রাণীদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction) করে **(চিত্র ১.৪.৬.৩)**।

জীবের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন রকম হতে পারে— ১) *উভয়ের উপকারে আসে এমন সম্পর্ক*। যেমন: যখন “ক্লিনার ফিশ (Cleaner Fish)” কচ্ছপের শরীর থেকে পরজীবী খেয়ে ফেলে)। ক্লিনার ফিশ হলো এক ধরনের মাছ, যারা অন্য বড় মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণীর শরীর থেকে পরজীবী, মৃত চামড়া বা ময়লা খেয়ে ফেলে। এতে তারা নিজেরা খাবার পায় এবং অন্য প্রাণীটি পরিষ্কার থাকে এবং

দুজনেরই উপকার হয়। ২) *এক পক্ষ লাভবান হয়, অপর পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়*। যেমন: সিংহ যখন জেব্রাকে (Zebra) মেরে খায়। ৩) *উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন সম্পর্ক*। যেমন: দুটি গাছ একসঙ্গে কম পরিমাণে থাকা মাটির পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে। মূলত জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাস্তুতন্ত্রের (Ecosystem) সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রতিটি জীব তার আশেপাশের ভৌত পরিবেশের (Environment) সঙ্গেও প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাছের পাতা সূর্যের আলো শোষণ করে, বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় **(চিত্র ১.৪.৬.৩)**। একইসাথে, পরিবেশও জীব দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, উদ্ভিদের শিকড় মাটি থেকে পানি ও খনিজ গ্রহণ করে এবং শিকড়ের বৃদ্ধি পাথর ভেঙে মাটি তৈরি করতে সাহায্য করে। বিশ্বব্যাপী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সালোকসংশ্লেষণকারী(Photosynthetic) জীব বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান সমস্ত অক্সিজেন তৈরি করছে।

অন্যান্য জীবের মতো, মানুষও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু আমাদের কিছু কাজের ফলাফল পরিবেশের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। গত ১৫০ বছর ধরে, মানুষ ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল, গ্যাস) পোড়াচ্ছে, যার ফলে অনেক কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য গ্যাস বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীতে তাপ আটকে রাখে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, মানুষের এই কর্মকাণ্ড ১৯০০ সালের পর থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ১°C (Celsius) বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান হারে CO_2 নিঃসরণ চলতে থাকলে,

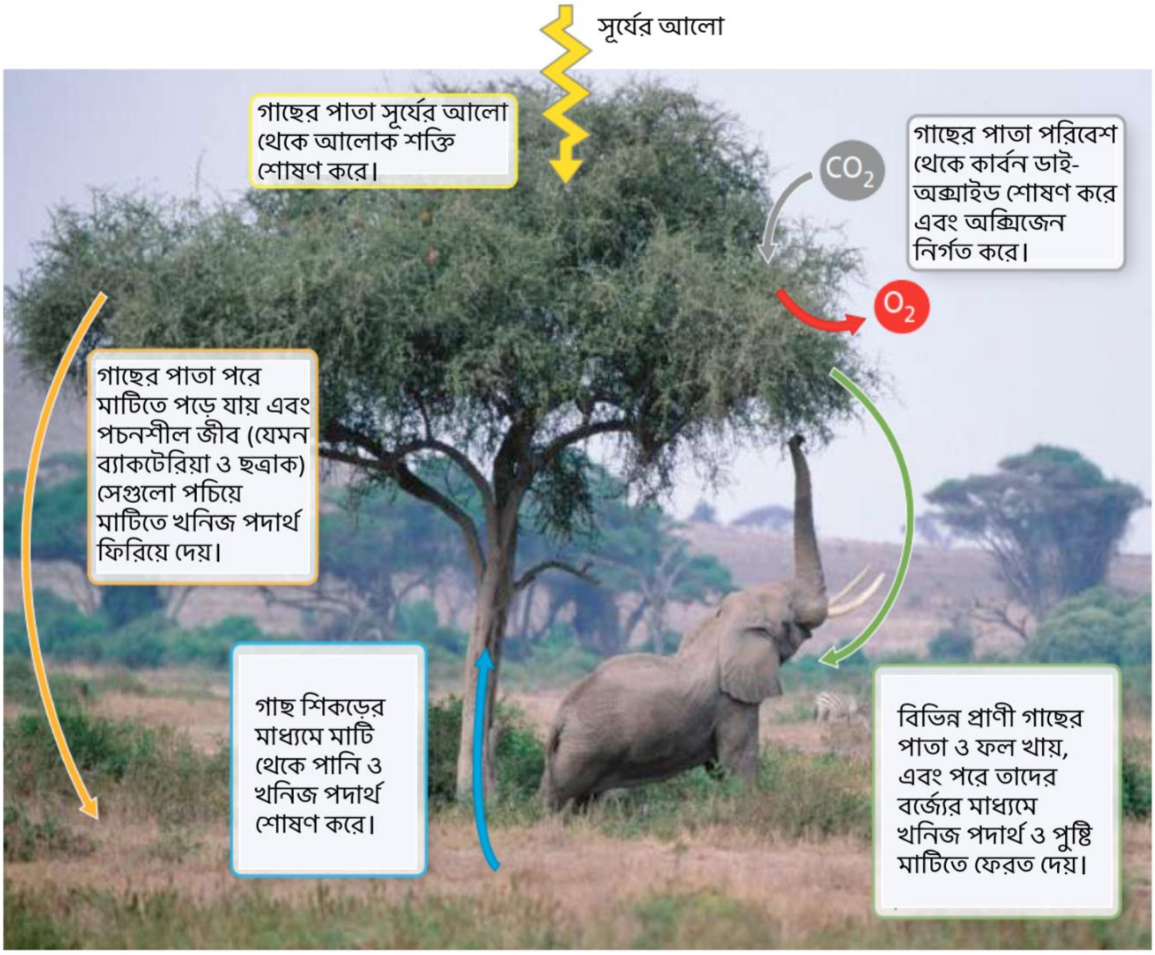

চিত্র ১.৪.৬.৩: আকাশমণি গাছের অন্যান্য জীব ও তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক।

এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আরও অন্তত ৩°C বাড়তে পারে।

এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকা বা চলমান উষ্ণায়ন হল বর্তমান পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের (Climate Change) অন্যতম একটি উদাহরণ। জলবায়ু পরিবর্তন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আসা বা স্বল্পমেয়াদি আবহাওয়ার পরিবর্তনের মতো নয়। এই জলবায়ু পরিবর্তন হলো দীর্ঘমেয়াদি যা ৩০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ঘটে।পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া বা বিশ্ব উষ্ণায়নই (Global Warming) একমাত্র জলবায়ুর পরিবর্তন নয়। পৃথিবীতে বায়ুর গতি, বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ঝড়, খরা ইত্যাদি চরম আবহাওয়ার পরিমাণও বাড়ছে। এই সমস্ত জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে জীব ও তাদের আবাসস্থলে প্রভাব ফেলছে। যেমন, মেরু ভালুক (Polar Bear) তার বরফের যে অঞ্চল থেকে শিকার করত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন তার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে—ফলে তাদের খাদ্যের অভাব ও মৃত্যুর হার বেড়েছে। আবাসস্থল নষ্ট হওয়ার ফলে শত শত উদ্ভিদ ও প্রাণী নতুন উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেকের জন্য উপযুক্ত নতুন আবাস নেই, অথবা তারা পর্যাপ্ত দ্রুত স্থানান্তর করতে পারছে না। ফলে, বহু প্রজাতির জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে অথবা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাচ্ছে **(চিত্র ১.৪.৬.৪)**। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রজাতির এই ক্ষয় শেষ পর্যন্ত বিলুপ্তি (Extinction) অর্থাৎ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অন্যান্য অঞ্চলেরমত, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানা রকম প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে খরার প্রকোপ বাড়ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, ফলে সুপেয় জল বা খাবার পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। অতিরিক্ত গরম ও দূষণের কারণে ডায়রিয়া, চর্মরোগ, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ বাড়ছে। বৃষ্টি ও তাপমাত্রার অনিয়মিত পরিবর্তনের কারণে ধান, আলু ইত্যাদি ফসল ভালো ফলছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড় বেড়ে গেছে (যেমন সিডর, আইলা, আম্পান, ইয়াস), যা সুন্দরবনের গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। বাঘ, কুমির ও অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের কিছু অংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ঘরবাড়ি ধ্বংস, চাষাবাদ নষ্ট এবং মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। তাই আমাদের এখন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো খুব জরুরি, যাতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের পাশাপাশি এর মোকাবেলায় নতুন চাষের পদ্ধতি, বন্যাপ্রতিরোধী ঘরবাড়ি ও অন্যান্য ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারি।

চিত্র ১.৪.৬.৪: গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming) বা বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সেলোপোরাস (Genus, গণ: *Sceloporus*) জাতের গিরগিটিগুলো হুমকির মুখে পড়েছে। গরমের কারণে এরা বেশি সময় ছায়া বা ঠান্ডা আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকে, ফলে তাদের খাবার খোঁজার সময় কমে যায়। যার কারণে তারা কম খেতে পারে, আর তাই বংশবৃদ্ধির হারও কমে যায়। মেক্সিকোর ২০০টি *Sceloporus* গিরগিটির দলের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ১৯৭৫ সাল থেকে প্রায় ১২% একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১.৪.৭ বিবর্তন জীবনের ঐক্য ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে। (Evolution explains the unity and diversity of life)

বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীরা একমত যে, পৃথিবীতে বর্তমানে যেসব জীব আছে, তারা সবাই একটি সাধারণ এককোষী জীব, যেটি প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ($১০^৯$) বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। আদিম জীবগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আজও বিভিন্ন জীবের মাঝে দেখা যায়, যা ধারণা দেয় যে, আধুনিক জীবগুলো ঐ আদিম জীবগুলোর মধ্য থেকে এসেছে। যেমনঃ ডিএনএ (DNA) অণুটি, যা বংশগত তথ্য (Genetic Information) ধারণ করে। DNA সব জীবের মধ্যেই সাধারণভাবে দেখা যায়। এ ধরনের সংরক্ষিত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো জীবে অনেক প্রজন্ম ধরে টিকে থাকায় এটা বোঝা যায় যে, এই সমস্ত উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো জীবের বেঁচে থাকার বা সফলভাবে তার কার্যক্রম চালানর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবর্তন সম্পর্কে ভালোভাবে জানলে আমরা পৃথিবীর জীবজগতের অনেক কিছুই সহজে বুঝতে পারি। প্রাচীন জীবাশ্মগুলো (Fossil Record) পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পৃথিবীতে জীব বিলিয়ন বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। যার ফলে আজকে আমরা অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় জীব দেখতে পাই। তবে যতই এই জীবগুলো আলাদা হোক না কেন, বৈচিত্র্যের (Diversity) পাশাপাশি তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য (Unity) বা মিলও আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—মানুষ, বিড়াল, বাঁদুর, শুশুক (Dolphin) এবং ঘোড়া দেখতে একে অপরের থেকে অনেক আলাদা হলেও, এদের হাড়ের গঠন প্রায় একই ধরণের **(চিত্র ১.৪.৭.১)**। জীবদের এই ধরনের মিল এবং পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল বিবর্তন।

বিবর্তন হল একটি জৈবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, যেখানে জীবেরা সময়ের সাথে সাথে তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ধীরে ধীরে আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, কারণ তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে থাকে। সহজ ভাষায় বিবর্তন মানে হলো সময়ের সাথে সাথে জীবদের ধীরে ধীরে বদলে যাওয়া। প্রাণীরা যখন নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে থাকে, তখন তাদের দেহে কিছু বংশগত (জেনেটিক) পরিবর্তন হয়। এইভাবে তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যায়। জীবের দুটি প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য (Diversity) বোঝানো যায় এভাবে—তারা যখন একই পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কিছু বংশগত পরিবর্তন ঘটেছে। আবার তারা যে একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, সেই কারণে তাদের মধ্যে কিছু মিল (Unity) এখনও রয়ে গেছে। বিবর্তনের ঘটনার পক্ষে বহু রকমের প্রমাণ রয়েছে, এবং সেইসঙ্গে এই প্রক্রিয়াটি যে কীভাবে ঘটে, সেটিও বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আধুনিক বিবর্তন তত্ত্বের একজন প্রতিষ্ঠাতা থিওডোসিয়াস ডবজানস্কি (Theodosius Dobzhansky) বলেছিলেন, "বিবর্তনের আলোকে না দেখলে জীববিজ্ঞানের কোনো কিছুই অর্থবহ নয়। (Nothing in biology makes

চিত্র ১.৪.৭.১: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বাহুগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য। নিচের পাঁচটি মেরুদণ্ডীযুক্ত প্রাণীর সামনের বাহুগুলোর (ফোরলিম্ব) গঠন দেখলে বোঝা যায়, প্রতিটি প্রাণী যেভাবে জীবন যাপন করে, সে অনুযায়ী তাদের হাড়ের আকার ও মাপ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে তাদের এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, তাদের অঙ্গগুলোর মূল গঠন একই ধরনের, যা ধারণা দেয় যে তারা সবাই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে।

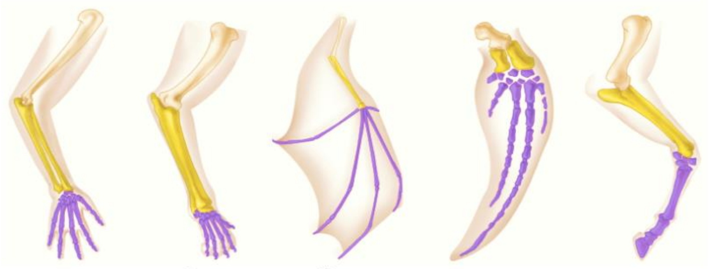

sense except in the light of evolution.)” অর্থাৎ বিবর্তন ছাড়া জীববিজ্ঞানের কিছুই বোঝা যায় না। এই কথাটার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে জীববিজ্ঞানীরা কীভাবে পৃথিবীর এত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে ব্যাখ্যা করেন।

জীবনের বৈচিত্র্যকে শ্রেণিবদ্ধকরণ (Classifying the Diversity of Life)।

বৈচিত্র্য হলো জীবনের একটি প্রধান ছাপ বা বৈশিষ্ট্য (Hallmark)। এখন পর্যন্ত জীববিজ্ঞানীরা প্রায় ১৮ লক্ষ (1.8 million) প্রজাতির জীবকে চিহ্নিত ও নামকরণ করেছেন। প্রতিটি প্রজাতির একটি দ্বি-অংশবিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম থাকে: প্রথম অংশটি হলো জেনাস (Genus) বা গণের নাম (বহুবচনে: Genera), দ্বিতীয় অংশটি হলো ঐ গণের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই স্পিসিস (species) বা প্রজাতির নাম। উদাহরণস্বরূপ, *Homo sapiens* হলো মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম, যেখানে Homo হল গণ, আর sapiens হল প্রজাতির নাম। বর্তমানে যেসব প্রজাতি পরিচিত, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ১ লক্ষের বেশি ছত্রাক (Fungi), ২.৯ লক্ষ উদ্ভিদ (Plants), ৫৭ হাজার মেরুদণ্ডী প্রাণী (Vertebrates, যাদের পিঠে হাড় আছে), ১০ লক্ষের বেশি কীটপতঙ্গ (Insects) — যা পৃথিবীর সমস্ত পরিচিত জীবের অর্ধেকেরও বেশি। এর বাইরে রয়েছে অসংখ্য এককোষী জীবের প্রজাতি, যেগুলোও জৈব বৈচিত্র্যের অংশ। প্রতি বছর গবেষকেরা হাজার হাজার নতুন প্রজাতি চিহ্নিত করেন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবীতে মোট প্রজাতির সংখ্যা ১০ মিলিয়ন থেকে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি হতে পারে। আসল সংখ্যা যাই হোক, এই বিপুল বৈচিত্র্য জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে অনেক বিস্তৃত করে তুলেছে। এই বিশাল বৈচিত্র্যকে বোঝা এবং গুছিয়ে শ্রেণিবদ্ধ করা জীববিজ্ঞানীদের জন্য অনেক বড় এবং কঠিন একটি কাজ (Challenge)।

জীবনের তিনটি সম্রাজ্য বা ডোমেইন (The Three Domains of Life)।

মানুষ সাধারণত বিভিন্ন জিনিসকে তাদের মধ্যকার মিল ও পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী দলবদ্ধ করে। এই কারণে, জীববিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই জীবদের গঠন, কাজের ধরন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে শ্রেণিবিন্যাস বা শ্রেণিবদ্ধ করে আসছেন। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে, জিনগত তথ্য বা DNA ক্রম (Sequence, সিকোয়েন্স) তুলনা করা যায় এমন নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবের মধ্যকার সম্পর্কগুলো আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। এর ফলে জীবজগৎকে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় পুনর্বিবেচনা চলছে। বর্তমানে, সব জীবকে তিনটি প্রধান সম্রাজ্য বা ডোমেইনে ভাগ করা হয়েছে: **Bacteria (ব্যাকটেরিয়া), Archaea (আর্কিয়া), Eukarya (ইউকারিয়া) (চিত্র ১.৪.৭.২)**। এই তিনটি ডোমেইনের মধ্যে প্রথম দুটি—ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়া— হল এককোষী প্রোক্যারিওটিক প্রাণী, যাদের কোষে নিউক্লিয়াস বা ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গাণু থাকে না। তৃতীয় ডোমেইন ইউকারিয়া-তে পড়ে সব ইউক্যারিওটিক প্রাণী, যাদের কোষে নিউক্লিয়াস এবং অন্যান্য অঙ্গাণু থাকে। এই ডোমেইনের মধ্যে আবার চারটি বড় উপদল বা গোষ্ঠী রয়েছে: Kingdom Plantae (উদ্ভিদ রাজ্য), Kingdom Fungi (ছত্রাক রাজ্য), Kingdom Animalia (প্রাণী রাজ্য), এবং Protists (প্রোটিস্ট)।এই রাজ্যগুলোকে প্রধানত তাদের খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে আলাদা করা হয়: উদ্ভিদ সূর্যালোক ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাবার (শর্করা ও অন্যান্য অণু) তৈরি করে। ছত্রাক পরিবেশ থেকে দ্রবীভূত পুষ্টি শোষণ করে। প্রাণীরা অন্যান্য জীব খেয়ে এবং হজম করে খাবার সংগ্রহ করে। আমরা মানুষরা যেহেতু খাবার সংগ্রহ করি এবং খেয়ে হজম করি, তাই আমরা প্রাণী রাজ্যের (Kingdom Animalia) অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ইউক্যারিওট হলো প্রোটিস্টরা, যাদের বেশিরভাগই

চিত্র ১.৪.৭.২: জীবনের তিনটি সম্রাজ্য বা ডোমেইন।

এককোষী প্রাণী। আগে প্রোটিস্টদের একটি আলাদা রাজ্যে রাখা হতো, কিন্তু আধুনিক DNA সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রোটিস্টরা এত বৈচিত্র্যময় ও মিলহীন, যে তাদেরকে এক রাজ্যে ফেলা যায় না। কিছু প্রোটিস্ট উদ্ভিদের মতো খাবার তৈরি করে (যেমন: Euglena, ইউগ্লিনা), কেউ প্রাণীর মতো চলাফেরা করে ও খাবার খায় (যেমন: Amoeba, অ্যামিবা), আবার কেউ ছত্রাকের মতো পুষ্টি শোষণ করে (যেমন: Slime mold, স্লাইম মোল্ড)। এইসব প্রোটিস্ট উদ্ভিদ, প্রাণী বা ছত্রাকের সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত; অন্য প্রোটিস্টদের সাথে তাদের কম মিল আছে। তাই বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন, প্রোটিস্টরা আসলে একেকটি আলাদা দল। তাই এখন তাদের বিভিন্ন ছোট ছোট ভাগে আলাদা করা হয়েছে।

জীবনের তিনটি ডোমেইনে শুধু কোষভিত্তিক (Cellular) জীবগুলো রাখা হয়েছে, যারা নিজেরা খাদ্য গ্রহণ, শক্তি ব্যবহার, বৃদ্ধি, প্রতিক্রিয়া করতে পারে এবং নিজেরা নিজেরাই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। ভাইরাসকে জীবনের তিনটি ডোমেইনের মধ্যে রাখা হয় না, কারণ, এরা জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করে না। ভাইরাস হল এক ধরনের কোষবিহীন সংক্রামক কণা। এরা সাধারণত গঠিত হয় DNA বা RNA (জিনগত উপাদান) দিয়ে। এদের একটি প্রোটিনের আবরণ থাকে যাকে ক্যাপসিড (Capsid) বলা হয়। কিছু ভাইরাসের বাইরের দিকে লিপিডের (Lipid) স্তরও থাকতে পারে। ভাইরাসরা নিজে কোনো জৈবিক কাজ করতে পারে না, শুধুমাত্র অন্য জীবের কোষে ঢুকে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। তাই ভাইরাসকে সংক্রামক জৈব কণা (Biological Particles) বা জিন প্রতিলিপিকারী (Gene Replicator) বলা হয়—জীব নয়।

জীবনের বৈচিত্র্যের মাঝেও জীবনের ঐক্য (Unity of Life in the Diversity of Life)।

জীবন যত বৈচিত্র্যময়ই হোক না কেন, জীবনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক একতাও লক্ষ্য করা যায়। জীব যত রকমেরই হোক, সব জীবের মধ্যে কিছু না কিছু মিল আছে। যেমন, বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কালের গঠন প্রায় একই ধরনের, এবং সব জীবেই নিজেদের বংশ টিকিয়ে রাখার যে নির্দেশনা তা DNA (ডিএনএ)-তেই থাকে। বাস্তবে, জীবের মধ্যে সাদৃশ্য জীববিজ্ঞানের সব স্তরেই পরিলক্ষিত হয়। অনেক ভিন্ন প্রাণীদের কোষের গঠনে যে মিল পাওয়া যায়, তা জীবের একতার স্পষ্ট প্রমাণ **(চিত্র ১.৪.৭.৩)**।

জীবজগতের এই দুই দিক—একদিকে এত রকমের প্রাণী, আর অন্যদিকে এদের ভেতরে এত মিল—তাহলে, এটা কীভাবে সম্ভব? জীবনের একতা ও বৈচিত্র্য — আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এই প্রশ্নের উত্তর দেয় বিবর্তন নামক প্রক্রিয়া, যা পরবর্তীতে বিশদ আলোচনা করা হবে। বিবর্তনের ধারণা আমাদের দেখায়, কীভাবে সময়ের সাথে সাথে প্রাণীরা বদলেছে, কাদের সাথে কাদের মিল রয়েছে অর্থাৎ কারা কার আত্মীয়, আর কেন এদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য দেখা যায়। বিবর্তন কেবল জীবদের মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করে না, এটি জীববিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, পৃথিবীর আদি থেক বর্তমান সময়ের প্রবাহও তুলে ধরে। জীবাশ্ম আর অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় জীবনের ইতিহাস হল কোটি কোটি বছরের পুরনো পৃথিবীর গল্প, যেখানে বিলিয়ন বছর ধরে জীবেরা ধীরে ধীরে তাদের রূপ বদলে বদলে বাস করে আসছে **(চিত্র ১.৪.৭.৪)**।

চিত্র ১.৪.৭.৩: জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঐক্যের একটি উদাহরণ: ইউক্যারিওটদের সিলিয়ার (Cilia) গঠন। সিলিয়া (একবচনে সিলিয়াম, *Cilium*) হলো কোষের পৃষ্ঠে থাকা লোমের মত এক ধরনের প্রসারণ, যা চলাচলের কাজে ব্যবহৃত হয়। সিলিয়া বিভিন্ন ধরনের ইউক্যারিওট জীবের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, পুকুরের পানিতে বসবাসকারী *Paramecium* (প্যারামিসিয়াম) এবং মানুষ এই দুই জনের মধ্যেই সিলিয়া রয়েছে। তবে এই দুইটি ভিন্নধর্মী জীবের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও, তাদের সিলিয়ার গঠন প্রায় একই রকম। সিলিয়ার প্রস্থ-ছেদ (Cross-section) করলে এর ভেতরের জটিল নল-আকৃতির কাঠামোগুলো (Tubules) দেখা যায়।

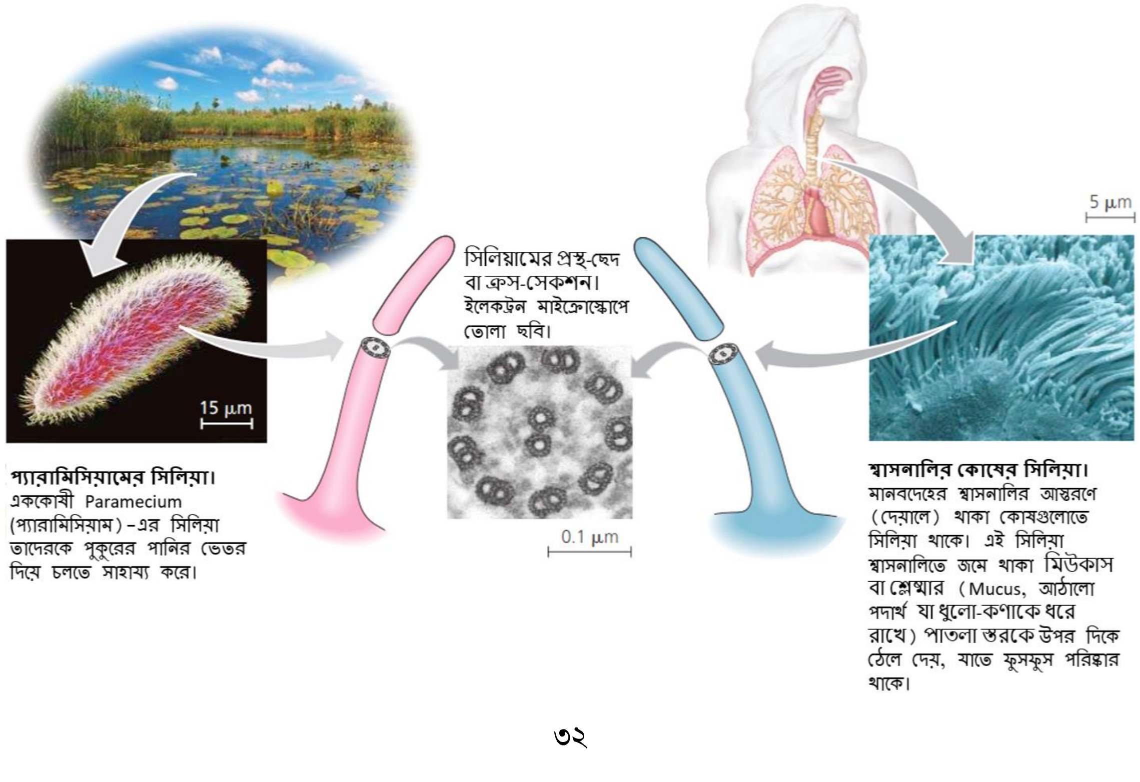

চিত্র ১.৪.৭.৪: জীবনের ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়ন। দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষকরা *Homo naledi* নামে একটি বিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল পুনর্গঠন করছেন, যারা আধুনিক মানুষের (*Homo sapiens*) মত Homo গণের অন্তর্ভুক্ত। এদের সাথে মানব কঙ্কালের অধিক মিল থাকার কারণে এদেরকে মানুষের এক ধরনের আত্মীয় বলা যায়।এই জীবাশ্মগুলো একটি ভূগর্ভস্থ গুহা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা সম্ভবত একটি সমাধিস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) এবং বিবর্তন তত্ত্ব।

বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি নতুন মাত্রা পায়, যখন ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে ইংরেজ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **"On the Origin of Species by Means of Natural Selection (অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি)"** প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে বিবেচিত (**চিত্র ১.৪.৭.৫**)। ৩০ বছরের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর এই গ্রন্থে ডারউইন মূলত বিবর্তনের দুটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। *প্রথমত,* তিনি বলেন যে, যখন কোনো প্রজাতিকে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, তখন তারা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ক্রমে ভিন্নতা অর্জন করে বা অভিযোজিত হয়। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবরা তাদের পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে ওঠে। ডারউইন এই প্রক্রিয়াটিকে **"Descent with modification (ডিসেন্ট উইথ মোডিফিকেশন)"** নামে অভিহিত করেন, মানে হল— পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রজন্মের উদ্ভব বা জীবের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবর্তন হওয়া। এই প্রক্রিয়াটি এই ধারণা দেয় যে, সব জীবরা এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে এবং তারা নানা রকম পরিবেশে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিজেরা পরিবর্তিত হয়েছে। 'পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রজন্মের উদ্ভব' ধারণাটি জীবনের ঐক্য ও বৈচিত্র্যের দ্বৈত রূপকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। *দ্বিতীয়ত,* ডারউইন ব্যাখ্যা করেন যে **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection, ন্যাচারাল সিলেকশন)** হল জীবের অভিযোজন ও বিবর্তনের প্রধান প্রক্রিয়া। তার মতে, যেসব জীবের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য

চিত্র ১.৪.৭.৫: নিচের ছবিটি চার্লস ডারউইনের, যা প্রায় ১৮৪০ সালের দিকে আঁকা হয়েছিল। এটা ছিল তার বিখ্যাত বই, যা সাধারণত "The Origin of Species" নামে পরিচিত, প্রকাশের এক যুগেরও আগে, যা ১৮৫৯ সালে ছাপা হয়।

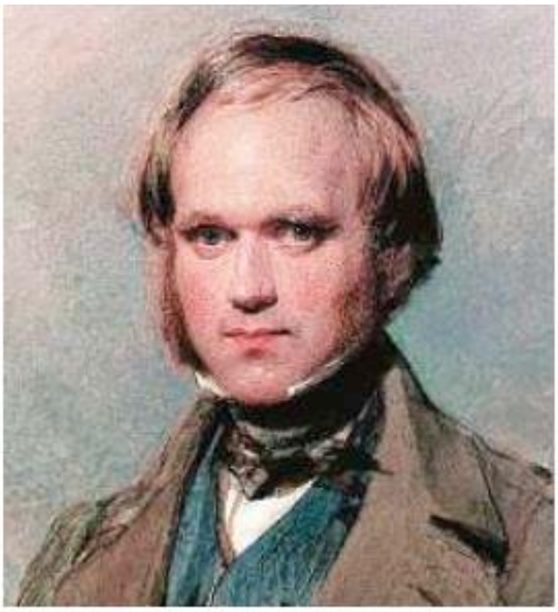

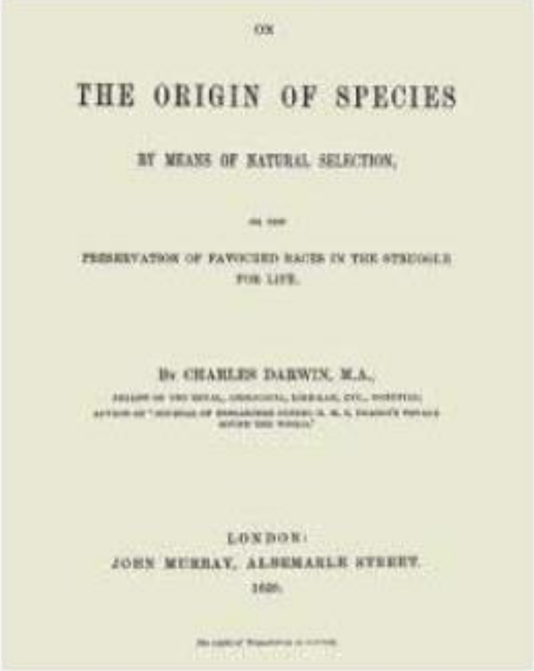

পরিবেশের উপযোগী, তারা তুলনামূলকভাবে অধিক জীবিত থাকে ও অধিক প্রজনন করে। ফলে এই উপযোগী বৈশিষ্ট্যসমূহ জীবরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বিস্তার লাভ করে এবং জীবের বিভিন্ন প্রজাতির অভিযোজন ও বিবর্তন সম্ভব হয়। ডারউইন যেসমস্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করে তার মৌলিক তত্ত্ব দুটি উপস্থাপন করেছিলেন, যদিও তার সেসমস্ত পর্যবেক্ষণগুলো কঠিন কিছু ছিল না বা আগে থেকেই জানা ছিল, তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সমস্ত পর্যবেক্ষণগুলোকে একটি যুক্তিসম্মত ও কার্যকর তত্ত্বে পরিণত করেন।

ডারউইনের আগেও বিবর্তনের ধারণা ছিল।

ডারউইনের সময়ে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করত যে বিভিন্ন ধরনের জীব এবং তাদের গঠন স্রষ্টার সরাসরি কর্মের ফল। জীবের বিভিন্ন প্রজাতিগুলো বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং সময়ের সাথে তারা পরিবর্তনশীল নয়। তবে এর বিপরীতে, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কেউ কেউ মনে করতেন যে পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাসে জীবজগত বদলেছে– আগে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নেই। অর্থাৎ, বিবর্তন ঘটেছে, পৃথিবীতে জীবদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে, এবং আজকের জীবগুলো তাদের শুরুর অবস্থার থেকে ভিন্ন। ডারউইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 'প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)' নামক ধারণাটি, যা তিনি এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি যুক্তিসম্মত এবং সংগঠিত ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি তার এই ধারণাকে ব্যাপকভাবে মানুষের দৃষ্টিতে আনেন এবং মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলেন।

মধ্যযুগে বা ইসলামী স্বর্ণযুগে, যা ছিল ডারউইনের জন্মের প্রায় ৮০০ বছর আগে, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক আল-বেরুনি (৯৭৩-১০৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বর্ণনা করেছিলেন, "মানুষ ধাপে ধাপে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পূর্ণতা বা উন্নতির স্তরে পৌঁছেছে। বানর জাতীয় প্রাণীরা ছিল সেই শেষ স্তর, যেখান থেকে মানুষ 'অগ্রসর' হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।" অষ্টম শতকের একজন প্রাণীবিদ, আল জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি ইরাকের বাসিন্দা ছিলেন, তিনি কিতাব আল-হায়াওয়ান বা প্রাণীর গ্রন্থ নামে একটি সাত খণ্ডের বই রচনা করেন (**চিত্র ১.৪.৭.৬**)। তিনি এই গ্রন্থটি

বিভিন্ন প্রাণীর ওপর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লিখেছিলেন। বহু বছর প্রাণীদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যয়নের পর আল-জাহিজ এই ধারণা দেন যে প্রাণীর পরিবেশগত অবস্থাই অর্থাৎ প্রাণী যে পরিবেশে থাকে তা তার বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রাণীরা টিকে থাকার জন্য তাদের পরিবেশ অনুযায়ী নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। তিনি প্রাণীর বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রাণীর টিকে থাকার নিজস্ব ক্ষমতা বা জৈবিক উপযুক্ততা (Biological Fitness) এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, একই প্রজাতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে, এবং যারা বেশি শক্তিশালী ও পরিবেশের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে, তারা তুলনামূলকভাবে কম মৃত্যুহারের মাধ্যমে টিকে থাকে। ১৪শ শতকের উত্তর আফ্রিকার অনেক বিখ্যাত একজন চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক ইবন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ) লিখেছেন, "সৃষ্টির সূচনা খনিজ পদার্থ থেকে, এরপর ধাপে ধাপে উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রূপান্তর ঘটে, প্রাণীজগৎ বিস্তৃত হয়, তাদের প্রজাতি সংখ্যা বাড়ে, এবং এক পর্যায়ে মানুষ আসে, যারা চিন্তা ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।" সেই সময় একটা প্রচলিত কুসংস্কার ছিল যে মানুষের কালো চামড়া বা কালো গায়ের রং তাদের পাপের জন্য তাদের ওপর আরোপিত কোনো অভিশাপ। ইবন খালদুন এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বরং তিনি বলেছিলেন যে, গায়ের রঙ ও উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক রয়েছে—যা আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী সত্য।

চিত্র ১.৪.৭.৬: আল জাহিজ রচিত কিতাব আল-হায়াওয়ান বা প্রাণীর গ্রন্থটি একটি পৃষ্ঠা।

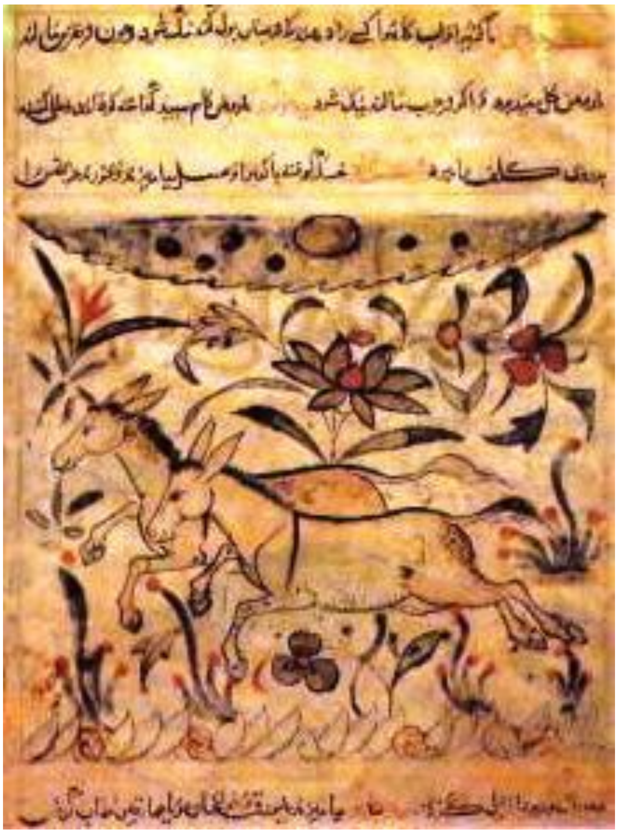

১৮৪২ সালের দিকে ডারউইন তার প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তনের তত্ত্ব অর্থাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তির সামগ্রিক প্রমাণ ও যুক্তি খসড়া আকারে পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তার লেখাটি তার কিছু ঘনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের দেখানোর পর, পাণ্ডুলিপিটি একটি ড্রয়ারে রেখে দেন এবং পরবর্তী ১৬ বছর অন্য গবেষণায় মনোযোগ দেন। যদিও পাণ্ডুলিপিটিতে তিনি তার ধারণাগুলো সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন, কেন তিনি এই প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করেননি, তা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। অবশেষে, ১৮৫৮ সালে, চিঠির মাধ্যমে একটি প্রবন্ধ পাওয়ার পর, ডারউইন তার বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রবন্ধেটিতে তরুণ ইংরেজ প্রকৃতিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, ১৮২৩-১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি তখন ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন, ডারউইনের তত্ত্বের মতই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের ধারণাটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। এই ধারণাটি ওয়ালেস স্বাধীনভাবে ডারউইনের মতোই চিন্তা করে আবিষ্কার করেছিলেন। ওয়ালেসের প্রবন্ধটি পাওয়ার পর, ডারউইনের বন্ধুদের উদ্যোগে লন্ডনে একটি সেমিনারে তাদের দুইজনের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বের একটি যৌথ উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়। এরপর ডারউইন তার পুরোনো ১৮৪২ সালের পাণ্ডুলিপিটি সম্প্রসারিত করে একটি বই লেখেন এবং তা প্রকাশের জন্য জমা দেন।

ধর্ম ও বিবর্তন: বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সেতুবন্ধন।

ধর্ম ও বিবর্তনের সম্পর্ককে অনেক সময় দ্বন্দ্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। চার্লস ডারউইনের “On the Origin of Species” বইটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হলে এটি সৃষ্টির ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। ফলে বহু মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মে যে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু বাস্তবে এই দ্বন্দ্ব অনিবার্য নয়। বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপন্থী নয় বরং পরিপূরকও হতে পারে। অনেক ধর্মীয় ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিবর্তনবাদকে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পথ খুঁজে পেয়েছেন। বিবর্তন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা বলে কিভাবে পৃথিবীতে সময়ের সাথে জীবনের রূপ ও গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তন প্রধানত জীবের পরিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেয়, এটি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, বিবর্তন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, বরং এটি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া।

ধর্ম ও বিবর্তনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রধানত তৈরি হয় যদি ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর পাঠ আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয়। তবে সব ধর্মীয়গ্রন্থগুলোর পাঠ বা ব্যাখ্যা যে আক্ষরিকই হতে হবে, এমন নয়। অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ মনে করেন যে ধর্মীয় গ্রন্থগুলো প্রতীকী বা রূপক ভাষায় লেখা, যা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্য প্রকাশ করে। এভাবে ধর্মীয় গ্রন্থ ও বিবর্তন তত্ত্বকে একে অপরের পরিপন্থী না ভেবে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যেমন, ধর্ম উত্তর দেয় “কেন” এবং বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে “কিভাবে”। অনেক বিজ্ঞানী ধর্মবিশ্বাসী এবং অনেক ধর্মীয় শিক্ষক বা নেতাও বিজ্ঞানের প্রতি সহানুভূতিশীল।

ধর্মীয়ভাবে বিশ্বাসী কেউ যদি বিবর্তনকে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে আস্তিক বিবর্তন (Theistic Evolution) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সৃষ্টিকর্তা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এটি সৃষ্টিকর্তাহীন বা কাকতালীয় প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রাকৃতিক নিয়ম। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম ও কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে, আর ধর্ম মানবজীবনের অর্থ, নৈতিকতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। অনেক খ্রিস্টান বিশ্বাস করেন, বিবর্তন ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার একটি অংশ, এবং আস্তিক বিবর্তনের মাধ্যমে তা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক ইহুদি বিবর্তনকে গ্রহণ করেন, এবং এটি ঈশ্বরের সৃষ্টি ও প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন। হিন্দুধর্মে সময়কে চক্রাকারে দেখা হয় এবং সবকিছুর আন্তঃসম্পর্কে বিশ্বাস করা হয়, যা অনেকে বিবর্তনের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন। কিছু মুসলিম বিবর্তনকে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মানানসই মনে করেন, আবার কেউ কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মুসলিম বিজ্ঞানী আল জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্বাস করতেন যে প্রাণীর বিবর্তন আল্লাহর সাহায্যে ঘটে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে চান। ১০ম শতকের পারস্যের মুসলিম দার্শনিক ইবন মিসকাওয়াইহ (৯৩২-১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ) মনে করতেন, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তবে শুধু মানুষকেই আল্লাহ বুদ্ধি ও চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যদি কারো ধর্মীয় বিশ্বাস আক্ষরিক অর্থে বা একবারেই বিবর্তনের সব তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে কেউ শুধু জানার জন্য বিবর্তন সম্পর্কে পড়তে পারে। এক ধর্মের লোকদের যেমন অন্য ধর্মের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানা দোষোনীয় নয়, তেমনি কেউ বিশ্বাস বা পালন না করে বিবর্তনের তত্ত্বগুলোকে জানার জন্য পড়তে পারে। একজন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি বিজ্ঞান ও বিশ্বাস—উভয়কে শ্রদ্ধা করেই বিবর্তনের অধ্যয়ন করতে পারে।

কখনো কখনো কিছু মানুষ বিবর্তন তত্ত্বকে অতিরঞ্জিতভাবে ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়—যা সঠিক বা ন্যায়সংগত নয়। মনে রাখা দরকার, প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে বিবর্তনের পক্ষে যত প্রমাণ আছে, তার বেশিরভাগই পরোক্ষ। এটি একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ধারণা হলেও, এটি সব রকমের অস্তিত্বগত বা ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। স্পেনের আলিকান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের (Universidad

de Alicante) মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিস্কো মোহিকা (Dr. Francisco Mojica), যিনি কোষের জিন পরিবর্তন বা সম্পাদনার (Gene Editing) যুগান্তকারী প্রযুক্তি CRISPR (ক্রিসপার) আবিষ্কার করেছেন, বলেছেন — *"জীববিজ্ঞান পড়া মানেই হলো বারবার 'বাহ!' বলা। বিজ্ঞানে সত্য খুব দ্রুত বদলে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—খোলা মন থাকা। প্রস্তুত থাকা।"* এই বক্তব্যে তিনি বিজ্ঞানের মূল চেতনার দিকটিকে তুলে ধরেছেন: বিস্ময়, বিনয় এবং উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বোঝার একটি উপায়, এবং এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের দুর্বলতা নয়, বরং এটি বিজ্ঞানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিজ্ঞান সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না—এটা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নয়; বরং এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এখনও বিস্ময়ের, রহস্যের এবং বিশ্বাসেরও স্থান আছে। জীববৈচিত্র্যের জটিলতা ও সৌন্দর্য অনুধাবনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিশীলতা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আরও গভীর অনুভব জন্ম নিতে পারে। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব ও বিশ্ব সম্পর্কে আরও পরিপূর্ণ উপলব্ধি পেতে পারি।

প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection, ন্যাচারাল সিলেকশন)।

প্রকৃতিতে দেখা যায় যে, কোনো জীবের এমনসব বৈশিষ্ট্যগুলো সব সময় বেছে নেয়া হয় যা জীবটিকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, যেসব বৈশিষ্ট্য কোনো জীবের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে, সেগুলো পরবর্তী প্রজন্মে বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। ডারউইন এই বিবর্তনীয় অভিযোজনের প্রক্রিয়াটিকে **"প্রাকৃতিক নির্বাচন"** (Natural Selection) নামে আখ্যায়িত করেছেন। **চিত্র ১.৪.৭.৭**-এ দেখানো হয়েছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কিভাবে বিভিন্ন রঙের পোকামাকড় থেকে শুধু একধরনের রঙের পোকামাকড়ের উদ্ভব হতে পারে। আমরা চারপাশে যেসব প্রাণী দেখি, তাদের দেহের গঠন বা আচরণ অনেকটাই তাদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। জীবের মধ্যে

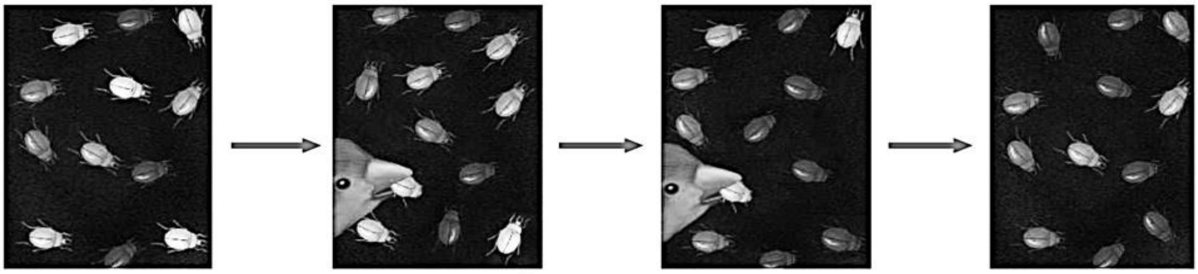

চিত্র ১.৪.৭.৭: প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection): ধরা যাক, একটি কাল্পনিক পোকা (বিটল, Beetle) জনসংখ্যা এমন একটি ঝোপে বসবাস শুরু করেছে, যেখানে সম্প্রতি আগুন লেগে মাটির রঙ কালো হয়ে গেছে। শুরুতে এই বিটলগুলোতে বংশগতভাবে দেহের রঙে বৈচিত্র্য দেখা যায়—কেউ অনেক হালকা ধূসর, আবার কেউ গভীর কয়লার মতো কালো। এই অবস্থায় পাখিরা যখন খাবারের জন্য পোকাগুলো শিকার করে, তখন হালকা রঙের বিটলগুলো বেশি চোখে পড়ে, কারণ তারা কালো মাটির পেছনে সহজে লুকোতে পারে না। তাই পাখিরা সহজেই তাদের ধরে খেয়ে ফেলে। ফলে, এই হালকা রঙের বিটলগুলো পাখির শিকারে বেশি পরিণত হয় এবং কালো রঙের বিটলগুলো জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। এটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি উদাহরণ।

তাদের জীবনধারা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিশেষ অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্ভব হয়। **চিত্র ১.৪.৭.৮**-এ দেখানো বাদুড়ের (Bat) ডানাগুলো অভিযোজনের (Adaptation) একটি চমৎকার উদাহরণ। বাদুড়ের ডানাগুলো এমনভাবে তৈরি হয়েছে বা বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়েছে যেন তারা সহজে উড়তে পারে। আবার এর ডানার কঙ্কালের গঠনটি ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই ডানাগুলো পাখির ডানার মতো নয়, কারণ বাদুড় একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। বাদুড়ের সামনের পা বা হাতের হাড়, সন্ধি, স্নায়ু এবং রক্তনালিগুলো উড়ার উপযোগী হয়ে অভিযোজিত হলেও, এগুলোর গঠন মানুষের হাত এবং ঘোড়ার সামনের পা কিংবা তিমির ডানার সঙ্গে অনেকটাই মিল রাখে। আসলে, সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর সামনের অঙ্গগুলোর গঠন একই মূল কাঠামোর কিছুটা ভিন্ন রূপ। ডারউইনের **'পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রজন্মের উদ্ভব (Descent with Modification)'** ধারণা অনুযায়ী, শারীরিক এই গঠনগত মিল নির্দেশ করে যে সব স্তন্যপায়ী প্রাণী এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, যার দেহে এই অঙ্গের আদিরূপ ছিল। এই পূর্বপুরুষকে আমরা মূল রূপের প্রতিরূপ বা প্রোটোটাইপ (Prototype) বলতে পারি। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই স্তন্যপায়ী প্রোটোটাইপটির সাধারণ শারীরিক গঠনের বিভিন্ন রকম অভিযোজন ঘটেছে, যার ফলে আজ আমরা স্তন্যপায়ীদের সামনের অঙ্গে এত বৈচিত্র্য দেখি। জীবাশ্ম এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই ধারণাকে সমর্থন করে যে সব স্তন্যপায়ী প্রাণী এক সাধারণ পূর্বপুরুষের আদলে উদ্ভূত।

ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত চলতে থাকে, তাহলে একটা পুরনো প্রজাতি থেকে এক বা একাধিক নতুন প্রজাতি তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো একটি প্রাণীর জনসংখ্যা (Population) বিভক্ত হয়ে কয়েকটি

চিত্র ১.৪.৭.৮: বিবর্তনজনিত অভিযোজন (Evolutionary Adaptation): বাদুড় হচ্ছে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা সক্রিয়ভাবে নিজেরা উড়তে সক্ষম। তাদের ডানায় আঙুল-এর মতো লম্বা হাড়ের মাঝখানে পাতলা চামড়ার ঝিল্লি (Webbing) থাকে, যা ডানার আকৃতি গঠন করে। ডারউইন বলেছিলেন, এ ধরনের গঠন বা বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। যেসব বাদুড় উড়তে ভালো পারত, তারা বেশি টিকে থেকেছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য পরের প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, অভিযোজন (Adaptation) সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিশোধিত জীবের গঠন বা বৈশিষ্ট্য তৈরি বা উদ্ভূত হওয়ার ক্রমিক একটি প্রক্রিয়া।

ছোট ছোট উপ-জনসংখ্যায় (Subpopulations) ভাগ হয়ে যায় এবং তারা আলাদা আলাদা পরিবেশে বাস করতে শুরু করে, তাহলে তাদের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন আলাদাভাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে, একটি একক প্রজাতি ধীরে ধীরে একাধিক নতুন প্রজাতিতে রূপ নিতে পারে, কারণ প্রতিটি গোষ্ঠী আলাদা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য ধীরে ধীরে অভিযোজিত হয়। **গ্যালাপাগোস (Galápagos) দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ (Finch) বা মুনিয়া** জাতীয় পাখিগুলো হলো একটি প্রজাতি থেকে অনেকগুলো নতুন প্রজাতির উদ্ভবের (Species Radiation) একটি বিখ্যাত উদাহরণ। ১৮৩৫ সালে, ডারউইন যখন দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল থেকে প্রায় ৯০০ কিমি দূরে অবস্থিত ঐ দূরবর্তী গ্যালাপাগোস দ্বীপগুলো সফর করেন, তখন তিনি এই ফিঞ্চ পাখিগুলোর নমুনা সংগ্রহ করেন। আগ্নেয়গিরিসমৃদ্ধ এই দ্বীপগুলো

তুলনামূলকভাবে নতুন এবং এখানে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না, যদিও এদের অনেকের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের অনেক প্রজাতির স্পষ্ট মিল রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গ্যালাপাগোস দ্বীপের ফিঞ্চ পাখিরা একটি পূর্বপুরুষ ফিঞ্চ প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যারা দক্ষিণ আমেরিকা বা ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে কোনোভাবে এই দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিল। সময়ের সাথে সাথে, এই ফিঞ্চ পাখিগুলো বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করতে করতে তারা সেখানে থাকা বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখেছে, আর এই মানিয়ে নেওয়ার কারণে, অভিযোজিত হয়ে, তারা ধীরে ধীরে একাধিক নতুন প্রজাতিতে ভাগ হয়ে গেছে। ডারউইনের ফিঞ্চ সংগ্রহের বহু বছর পর, গবেষকেরা প্রথমে শারীরিক গঠন ও ভূগোলভিত্তিক তথ্য এবং পরে **ডিএনএ অনুক্রম বিশ্লেষণ** (DNA Sequence Analysis) ব্যবহার করে এদের আত্মীয়তার বা বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সক্ষম হন।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রমাণ এবং পূর্বাভাস। (Proofs and predictions of natural selection)

ডারউইনের মৃত্যুর পর ১৮৮২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৪০ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার উপস্থাপিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ আরও দৃঢ়, শক্তিশালী, ও সমর্থনযোগ্য হয়েছে। বিবর্তনের ধারণা থেকে কিছু নির্দিষ্ট পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায়। বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই পূর্বাভাসগুলো পরীক্ষা করেছেন। এখানে আমরা সেই পূর্বাভাস আর প্রমাণগুলোর কিছু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই তত্ত্বে আবার ফিরে যাব এবং বিস্তারিতভাবে প্রমাণগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করব।

জীবাশ্ম দলিল (The fossil record): ডারউইন ধারণা দিয়েছিলেন যে জীবাশ্মগুলোতে এমন প্রাণীদের খোঁজ পাওয়া যাবে যারা পুরনো ও নতুন প্রজাতির মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। বিভিন্ন প্রধান জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগকারী মধ্যবর্তী রূপ পাওয়া যাবে—যেমন, মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যে, যাদের মনে করা হয় মাছ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, কিংবা সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী রূপ। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী, এই রকম জীবাশ্মগুলোর বয়স তাদের উদ্ভবের সময় অনুযায়ী ধারবাহিকভাবে হবে। আজ আমরা যে পরিমাণ জীবাশ্মের তথ্য জানি, তা ১৯শ শতকে অর্থাৎ ডারউইনের সময়ে কল্পনাও করা যেত না। যদিও একেবারে "মধ্যবর্তী" প্রাণী শনাক্ত করা কঠিন, তবুও জীবাশ্মবিদেরা অনেক জীবাশ্ম পেয়েছেন যেগুলো পুরনো ও নতুন রূপের মাঝখানে পড়ে, এবং তারা সেগুলো সময়ের সেই স্তরেই পেয়েছেন, যেটা আগে থেকে ধারণা করা হয়েছিল।

অতি ক্ষুদ্র জীবের জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে বোঝা গেছে, পৃথিবীতে প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর (৩৫০ কোটি বছর) আগে। বিভিন্ন জীবাশ্ম আবিষ্কার ডারউইনের ধারণাকে সমর্থন করেছে এবং ধারণা দিয়েছে যে কীভাবে হাজার হাজার বছরের মধ্যে সরল প্রাণী থেকে জটিল প্রাণী তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (যাদের হাড়ের কঙ্কাল আছে, কশেরুক প্রাণী, Vertebrates) ক্ষেত্রে অনেক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন সময়ের শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়।

পৃথিবীর বয়স (The age of the earth): ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবীর বয়স অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল, যাতে জীবের ধীরে ধীরে বিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কিন্তু তার সময়কার কিছু পদার্থবিদ বলেছিলেন যে পৃথিবীর বয়স মাত্র ১০০ মিলিয়ন বছর, যা ডারউইনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, কারণ এই সময়সীমা বিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় (Radioactive Decay) নিয়ে গবেষণা করে জানা যায়, সেই সময়কার পদার্থবিদেরা ভুল ছিলেন। আজ আমরা জানি, পৃথিবীর গঠন হয়েছিল প্রায় **৪.৫ বিলিয়ন** বছর আগে।

বংশগতির প্রক্রিয়া (The mechanism of heredity): ডারউইন সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন বংশগতি (Genetics) বিষয়ে, কারণ সে সময় কেউই জানত না জিন (Gene) কী বা বংশগতি কীভাবে কাজ করে। ফলে ডারউইনের পক্ষে তখন বিবর্তনের প্রক্রিয়া পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। যদিও সে সময়েই গ্রেগর মেনডেল (Gregor Mendel) অস্ট্রিয়ার ব্রুন্‌ (Brünn) শহরে (বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্রের ব্রুনো, Brno) মটরশুঁটির গাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, যা পরবর্তীতে জেনেটিক্স (Genetics) বা বংশগতিবিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিংশ শতকের শুরুতে। যদিও শুরুতে মেনডেলের কাজ অনেকের অজানা ছিল, কিন্তু যখন বিজ্ঞানীরা বংশগতির নিয়মগুলো বুঝতে শুরু করেন (যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে), তখন ডারউইনের তত্ত্ব বংশগতির আলোকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

শারীরিক গঠনের তুলনা (Comparative anatomy): বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের গঠন নিয়ে তুলনা করলে ডারউইনের তত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন মানুষ, ঘোড়া, বাদুড়) শরীরে একই ধরনের হাড় আছে, যা দেখায় তারা এক পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। চিত্র **১.৪.৭.১**-এ দেখা যায়, যদিও মেরুদণ্ডী প্রাণীর অঙ্গসমূহ যেমন হাত বা পা একই ধরণের হাড় দিয়ে তৈরি, কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। এই ধরনের হাড়ের গঠনকে বলে সমসংস্থ গঠন (Homologous structures)—মানে, উৎপত্তি এক হলেও, এখন গঠন ও ব্যবহারে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এর বিপরীতে, সমবৃত্তীয় গঠন (Analogous structures) হলো এমন গঠন, যেগুলো দেখতে বা কাজে এক রকম, কিন্তু উৎপত্তি আলাদা। যেমন, পাখি ও প্রজাপতির ডানা—দু'টিই উড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তারা ভিন্নভাবে তৈরি হয়েছে।

আণবিক প্রমাণ (Molecular evidence): বিবর্তনের ধারা (Pattern, প্যাটার্ন) আমরা আণবিক পর্যায়েও দেখতে পাই। বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের জিনোম (অর্থাৎ, সব জিনের মোট ক্রম বা সিকোয়েন্স, Genome) তুলনা করে আমরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি কোন প্রাণী বা উদ্ভিদগোষ্ঠী কার সাথে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেখানে সময়ে সময়ে বিবর্তনের ফলে প্রাণীর ডিএনএ-তে ক্রমাগত ছোট ছোট পরিবর্তন (জিনগত পরিবর্তন) জমতে থাকে। এই ধারাবাহিক জিনগত পরিবর্তনই ধারণা দেয় যে এক প্রজাতি থেকে ধীরে ধীরে আরেক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত জানব।

জাতিজনি বৃক্ষ বা ফাইলোজেনেটিক ট্রি । (Phylogenetic tree)

জীববিজ্ঞানীরা যখন বিভিন্ন জীব বিবর্তনীয় সম্পর্ক চিত্রিত করেন, তখন তা সাধারণত গাছের মতো শাখাবিস্তারী চিত্রের (Tree Diagram) মাধ্যমে দেখানো হয়। এই শাখাবিন্যাসযুক্ত চিত্রকে বলা হয় **জাতিজনি বৃক্ষ বা ফাইলোজেনেটিক ট্রি (Phylogenetic Tree)**। এভাবে দেখানো যুক্তিসঙ্গত কারণ যেমনভাবে একজন মানুষের বংশপরিচয় বা তার পূর্বপুরুষের বংশ তালিকা একটি পারিবারিক বৃক্ষে (Family Tree) দিয়ে বোঝানো যায়, তেমনি প্রতিটি প্রজাতিও হলো জীবন বৃক্ষের (Tree of Life) এক একটি ডালপালা। একটা পরিবারে যেমন নানা প্রজন্মের সদস্য থাকে, তেমনি ফাইলোজেনেটিক ট্রি দেখায় যে কোন জীবজগতের সদস্যরা কে কোথা থেকে এসেছে, তাদের পূর্বপুরুষ কে ছিল, এবং কীভাবে তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা আলাদা প্রজাতিতে রূপ নিয়েছে।
ফাইলোজেনেটিক ট্রির প্রতিটি ডাল বা শাখা বোঝায় একটি প্রজাতি বা জীবগোষ্ঠীকে, আর সেই শাখাগুলোর সংযোগস্থল (Node) বোঝায় যে তারা একটি **সাধারণ পূর্বপুরুষ (Common Ancestor)** থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অনেক সময় ফাইলোজেনেটিক ট্রি বা জাতিজনি বৃক্ষগুলো পাশের দিকে ঘোরানো অবস্থায় দেখানো হয়, যেমন চিত্র **চিত্র ১.৪.৭.৯**।

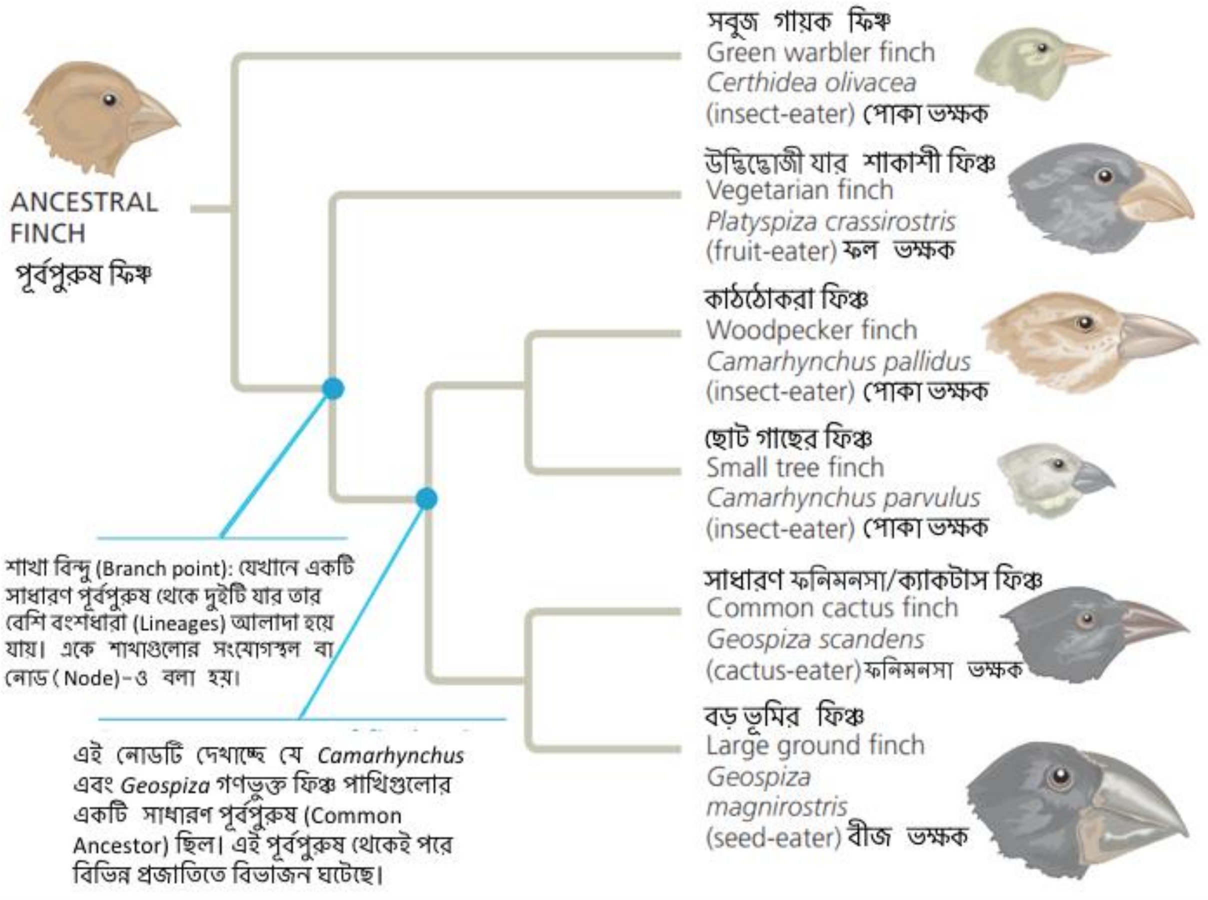

চিত্র ১.৪.৭.৯: পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রজন্মের উদ্ভব (Descent with Modification): গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চ পাখির অভিযোজনমূলক বিচ্ছুরণ (Adaptive Radiation)। বিচ্ছুরণ বা রেডিয়েশন বলতে সাধারণত বোঝানো হয় কোনো এক পূর্বপুরুষ থেকে দ্রুত সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নতুন প্রজাতিতে বিভাজিত হওয়া। নতুন প্রজাতিগুলো সাধারণত তাদের উপযুক্ত পরিবেশে (Ecological Niches) উদ্ভব হয় এবং তা দখল করে থাকে। অভিযোজনমূলক বিচ্ছুরণ (Adaptive Radiation) হলো রেডিয়েশনের একটি বিশেষ রূপ, যা সাধারণত ঘটে যখন প্রাণীরা কোনো নতুন পরিবেশে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে এমন কোনো নতুন বৈশিষ্ট্য বা অভিযোজন (Key Adaptation), যেমন উড়তে পারা, বিশেষ ধরনের খাদ্য খাওয়ার ক্ষমতা, ইত্যাদি তৈরি হয়। নতুন এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবকে তার নতুন পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে। গ্যালাপাগোস দ্বীপের বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখিগুলোর উদ্ভব অভিযোজনমূলক বিচ্ছুরণের একটি বাস্তব উদাহরণ। এখানে জাতজনি বৃক্ষের মাধ্যমে গ্যালাপাগোস দ্বীপের ফিঞ্চ পাখিদের মধ্যে যে বিবর্তনীয় সম্পর্ক তা দেখানো হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের একটি অনুকল্প বা অনুমেয় প্রস্তাব (Hypothesis, হাইপোথিসিস) হচ্ছে, ফিঞ্চ পাখিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের যে ঠোঁটের গঠন দেখা যায়, সেগুলো নির্দিষ্ট খাদ্য উৎসের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ঠোঁটের গঠন তাদের খাদ্য অনুযায়ী বদলে গেছে। যেমন: যে পরিবেশে শুধু বীজ জাতীয় খাবার ছিল বা বেশী ছিল, সে পরিবেশের পাখিগুলোর ঠোঁট মোটা ও শক্ত হয়েছে কারণ তা দিয়ে সহজে বীজ ভাঙা যায়। আবার যে পরিবেশে পোকা খাবার হিসেবে ছিল, সে পরিবেশের পাখিগুলোর ঠোঁট পাতলা ও সরু হয়েছে কারণ তা দিয়ে সহজে পোকা ধরতে সুবিধা হয়।

ফাইলোজেনেটিক ট্রি দিয়ে বোঝা যায় যে যেসব প্রজাতি একে অপরের সঙ্গে অনেক বেশি মিল রাখে অর্থাৎ যাদের গঠন বা বৈশিষ্ট্যে অনেক মিল আছে, যেমন গ্যালাপাগোস দ্বীপের ফিঞ্চ পাখিগুলো, তারা সম্প্রতি একটি অতীত সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। আবার, আরও পুরনো কোনো পূর্বপুরুষের মাধ্যমে ফিঞ্চ পাখিরা চড়ুই, বাজপাখি, পেঙ্গুইন এবং অন্য সব পাখির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। একইভাবে, একটি আরও প্রাচীন পূর্বপুরুষের মাধ্যমে ফিঞ্চসহ সব পাখি আমাদের (মানবজাতির) সঙ্গেও সম্পর্কিত।

যদি জীবনের ইতিহাসকে আরও পেছনে অনুসরণ করি, তাহলে আমরা ফিরে যাই পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবের কাছে, যেমন প্রোক্যারিওট (যাদের কোনো ঝিল্লিবদ্ধ নিউক্লিয়াস নেই), যারা পৃথিবীতে **৩.৫ বিলিয়ন বছর** আগে বসবাস করত। আজকের আমাদের কোষেও সেই প্রাচীন জীবদের কিছু চিহ্ন বিদ্যমান—যেমন, সর্বজনীন **জিনগত সংকেত বা জেনেটিক কড** (Genetic Code), যা পৃথিবীর সব জীবের মধ্যে প্রায় এক। আসলেই, জীবনের সব রূপই অর্থাৎ প্রতিটি জীবই একটি দীর্ঘ বিবর্তনীয় ইতিহাসের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা জীবন বৃক্ষের মাধ্যমে, চিত্র **চিত্র ১.৪.৭.১০**-এ দেখানো হয়েছে।

জাতিজনি বৃক্ষ বা ফাইলোজেনেটিক ট্রি হলো জীবজগতের একটি বিবর্তনীয় মানচিত্র, যা দেখায় কোন জীব কোন পূর্বপুরুষের আদলে তৈরি হয়েছে, এবং তারা কতটা কাছাকাছি আত্মীয়। জীববিজ্ঞানীরা জাতিজনি বৃক্ষ ব্যবহার করেন সব জীবের সম্পর্ক ও ইতিহাস বুঝতে। এটি জীববিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, যা আমাদের জীবন ও জীববৈচিত্র্যকে বোঝার একটি মূল চাবিকাঠি।

চিত্র ১.৪.৭.১০: জীবন বৃক্ষ (Tree of Life): ক, জীবন বৃক্ষের একটি সরল ছবি। খ, বাস্তবে, পৃথিবীতে জীবন যেভাবে বিবর্তিত ও বৈচিত্র্যময় হয়েছে, তাতে বিবর্তনের ধারা ও প্রজাতিগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক এখন অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত নতুন তথ্য আবিষ্কার করছেন যা এই জীবন বৃক্ষকে আরও বিস্তারিত ও জটিল করে তুলছে।

ক)

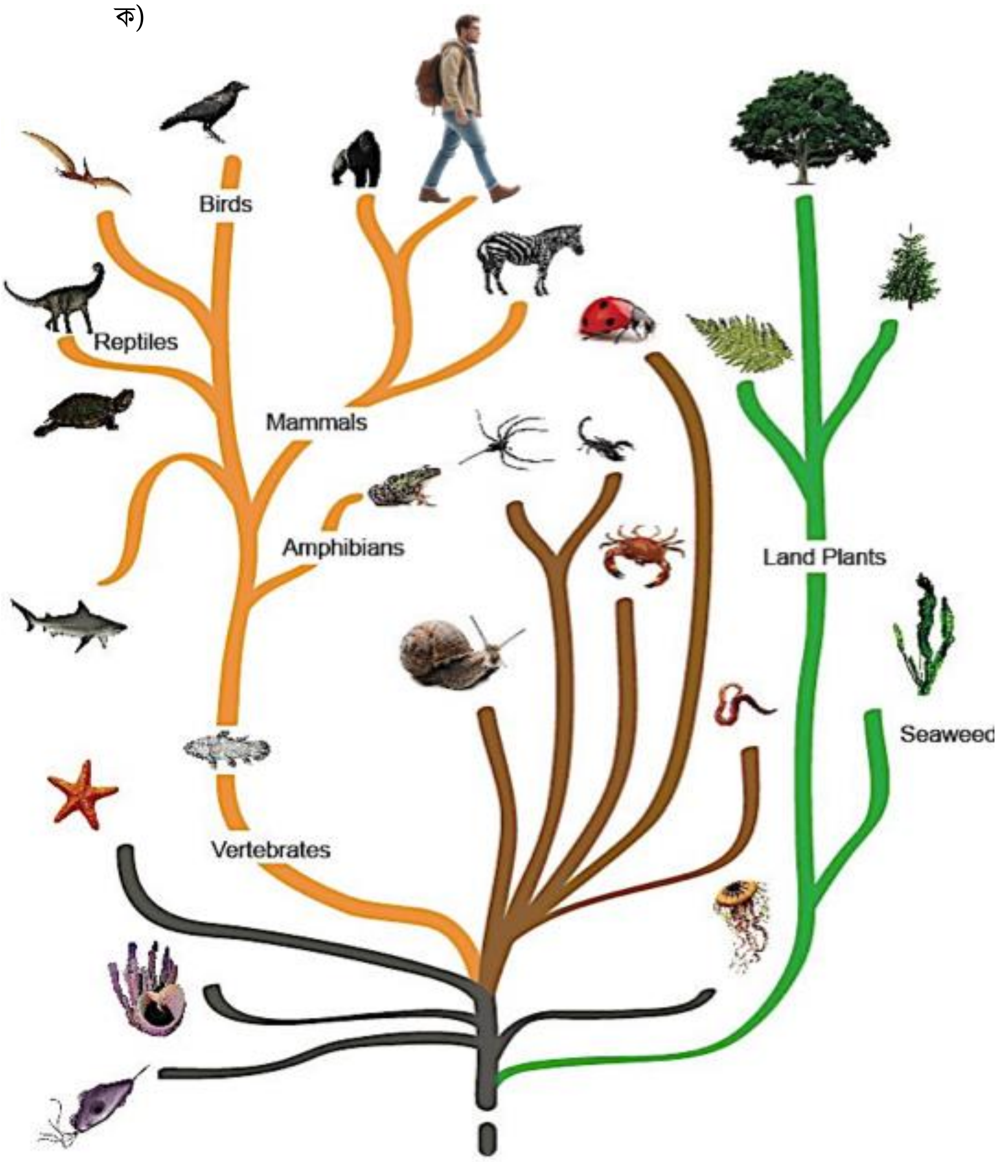

খ)

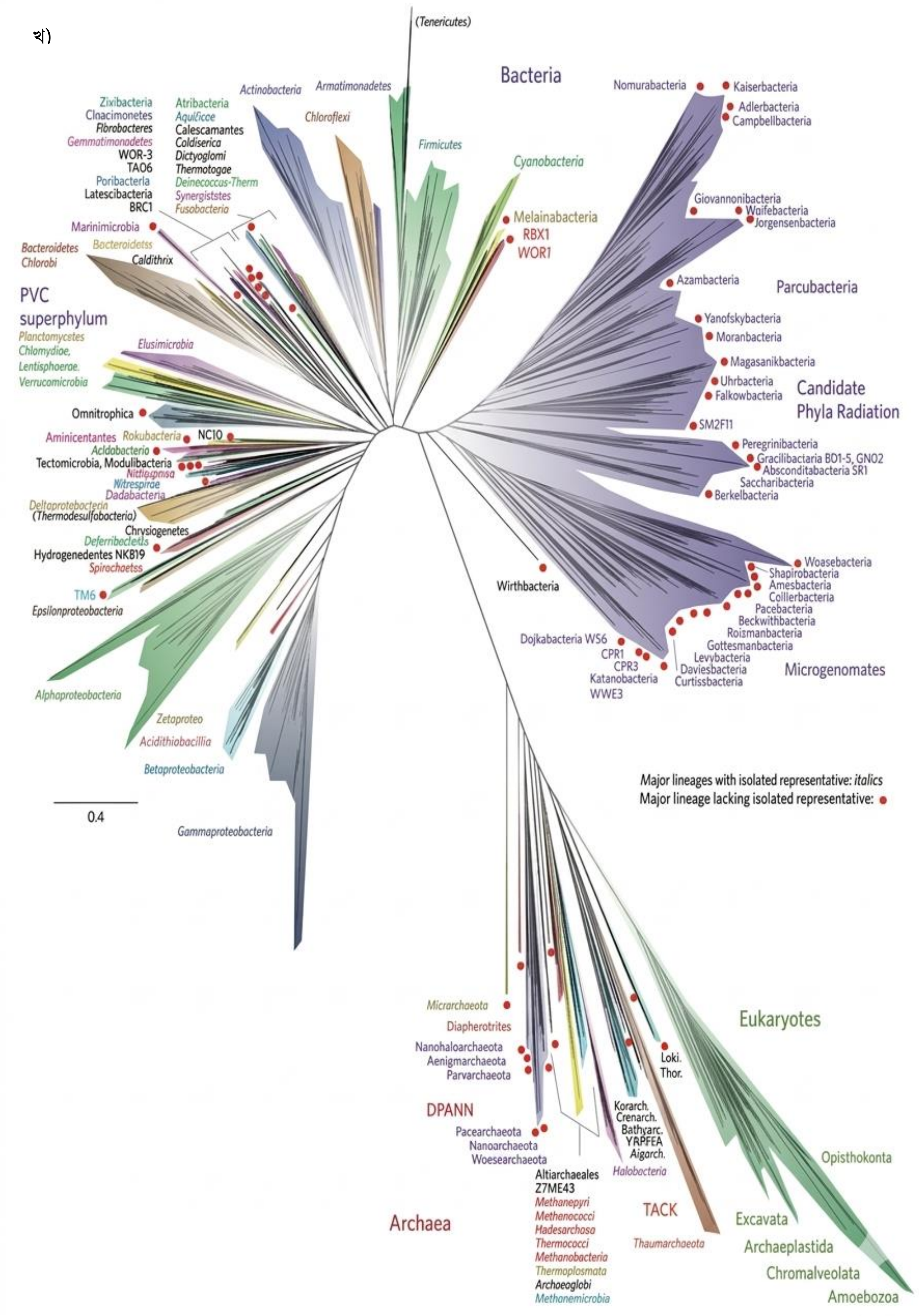

(Tenericutes)
Bacteria
Actinobacteria
Armatimonadetes
Chloroflexi
Firmicutes
Cyanobacteria
Melainabacteria
RBX1
WOR1
Zixibacteria
Cloacimonetes
Fibrobacteres
Gemmatimonadetes
WOR-3
TA06
Poribacteria
Latescibacteria
BRC1
Atribacteria
Calescamantes
Coldiserica
Dictyoglomi
Thermotogae
Fusobacteria
Marinimicrobia
Bacteroidetes
Chlorobi
Caldithrix
PVC superphylum
Planctomycetes
Lentisphaerae
Verrucomicrobia
Elusimicrobia
Omnitrophica
Aminicentantes
Rokubacteria
NC10
Tectomicrobia, Modulibacteria
Nitrospirae
Dadabacteria
Deltaproteobacteria
(Thermodesulfobacteria)
Chrysiogenetes
Hydrogenedentes NKB19
TM6
Epsilonproteobacteria
Alphaproteobacteria
Zetaproteo
Acidithiobacillia
Betaproteobacteria
Gammaproteobacteria
0.4
Nomurabacteria
Kaiserbacteria
Adlerbacteria
Campbellbacteria
Giovannonibacteria
Jorgensenbacteria
Azambacteria
Parcubacteria
Yanofskybacteria
Moranbacteria
Magasanikbacteria
Uhrbacteria
Falkowbacteria
Candidate Phyla Radiation
SM2F11
Peregrinibacteria
Gracilibacteria BD1-5, GN02
Absconditabacteria SR1
Saccharibacteria
Berkelbacteria
Woesebacteria
Shapirobacteria
Amesbacteria
Collierbacteria
Pacebacteria
Beckwithbacteria
Roismanbacteria
Gottesmanbacteria
Levybacteria
Daviesbacteria
Curtissbacteria
Microgenomates
Wirthbacteria
Dojkabacteria WS6
CPR1
CPR3
Katanobacteria
WWE3
Major lineages with isolated representative: italics
Major lineage lacking isolated representative:
Micrarchaeota
Diapherotrites
Nanohaloarchaeota
Aenigmarchaeota
Parvarchaeota
DPANN
Pacearchaeota
Nanoarchaeota
Woesearchaeota
Altiarchaeales
Z7ME43
Methanepyri
Methanococci
Thermococci
Methanobacteria
Thermoplasmata
Archaeoglobi
Methanomicrobia
Archaea
Korarch.
Crenarch.
Bathyarc.
YNPFFA
Aigarch.
Halobacteria
TACK
Thaumarchaeota
Loki.
Thor.
Eukaryotes
Opisthokonta
Excavata
Archaeplastida
Chromalveolata
Amoebozoa

অনুশীলনী ১

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। জীববিজ্ঞানকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করো।

২। এক্সোবায়োলজি (Exobiology) মানে হল অন্য গ্রহে জীবনের সন্ধান। যেহেতু সব জীবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, অন্য গ্রহের জীবে বিজ্ঞানীরা জীবনের কি কি বৈশিষ্ট্য খুঁজবেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৩। জীবনের স্তরবিন্যাস (Hierarchical Organization) ব্যাখ্যা করো।

৪। বিবর্তন তত্ত্বকে সমর্থন করে এমন প্রমাণ উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করো।

৫। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব কি জীবনের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে?

৬। ভাইরাস কি জীব? জীবের শ্রেণীবিন্যাসে এরা কোন শ্রেণীতে পড়ে?

৭। ডিএনএর নিউক্লিওটাইডগুলোর (Nucleotide) ক্রমের (Sequence) মত প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমের মাধ্যমেও বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। নিচের ছবিতে ফাইলোজেনেটিক ট্রি (Phylogenetic Tree) বা জাতিজনি বৃক্ষের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে মানুষের সঙ্গে যেসব প্রাণীর বিবর্তনীয় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, তাদের হিমোগ্লোবিন প্রোটিনে খুব মিল, অর্থাৎ সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু দূরবর্তী সম্পর্কযুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বেশি। উদাহরণস্বরূপ, রিসাস বানর (Rhesus monkeys), যারা মানুষের মতোই একটি প্রাইমেট, তাদের হিমোগ্লোবিন বেটা (β) চেইনের (Chain, ক্রমিক অ্যামিনো অ্যাসিডের শিকল) ১৪৬টি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে মানুষের সঙ্গে খুব কম পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কুকুরের মতো দূরবর্তী স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর পার্থক্য তুলনামূলকভাবে বেশি।

হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্যের সংখ্যা।

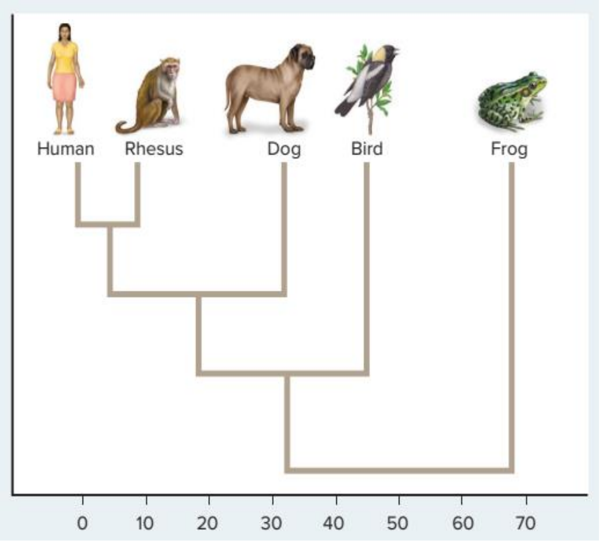

প্রশ্নঃ তোমার মতে, সাপ এবং পাখি উপরের জাতিজনি বৃক্ষের কোন শাখায় বা কোথায় অবস্থান করবে? কেন?

অধ্যায় ২

বিজ্ঞানের স্বরূপ।

(The Nature of Science)

এই অধ্যায়ের মূল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

২.১ বিজ্ঞানের প্রকৃতি বা সরূপ।

২.২ প্রকৃতিকে বা জীবদেরকে অধ্যয়নের সময়, বিজ্ঞানীরা অনুকল্প (Hypothesis) তৈরি করেন এবং তা পরীক্ষা করেন।

২.৩ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল হচ্ছে অনুকল্প তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা।

২.৪ একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। (A Scientific Inquiry)

২.৫ বিজ্ঞান বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একে-অপরের সহযোগিতা থেকে লাভবান হয়।

২.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ। (Science, Technology, and Society)

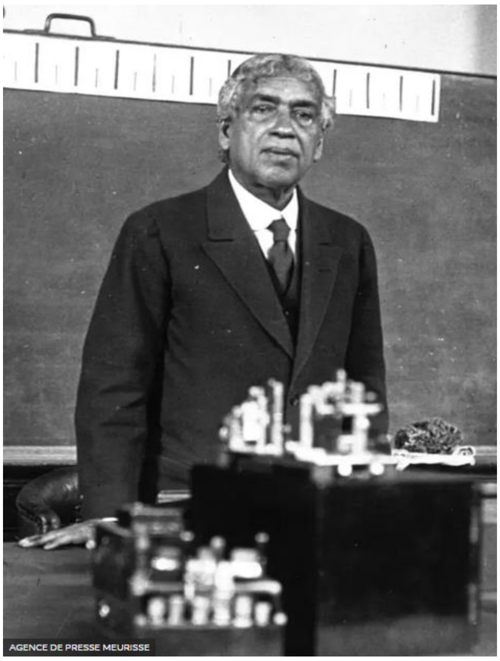

চিত্র ২: ১৯২৬ সালে প্যারিসে এক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় জগদীশ চন্দ্র বসু তুলে ধরেন যে, উদ্ভিদেরও সংবেদনশীলতা (Sensitivity) রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা বা উদ্দীপনার (Stimuli) প্রভাবে তারা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। জগদীশ চন্দ্র বসু (৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ – ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) একজন বাঙালি পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞান (Science Fiction) রচয়িতা ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রাখলেও জগদীশ চন্দ্র বসু বিশ্বজুড়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে। তিনি দেখান যে, ধাতব তারে মোচড় বা আঘাত করলে যেমন সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তেমনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহেও বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি জীবনের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁর এই গবেষণা পরবর্তীকালে আধুনিক জৈব-পদার্থবিজ্ঞানের (Biophysics) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একটি জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে যে, জগদীশ চন্দ্র বসুই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে গাছের প্রাণ আছে। তবে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ গাছকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করত। ফলে জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদানের বিশেষত্ব ছিল গাছের জীবন্ত হওয়ার ধারণা প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং উদ্ভিদের উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ উপস্থাপন করা। তিনি তার আবিষ্কৃত উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাপক যন্ত্র 'ক্রেসকোগ্রাফ (Crescograph)'-এর সাহায্যে দেখান যে বাহ্যিক উদ্দীপনা বা আঘাতের ফলে উদ্ভিদের ভেতরে নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা সম্ভব। উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা ও উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর এই পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method) ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন?

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত উদ্দীপনার প্রতি তাদের সাড়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করার জন্য **ক্রেসকোগ্রাফ (Crescograph)** যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। **তাঁর গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি চমৎকার উদাহরণ।**

চিত্র ২১: ক্রেসকোগ্রাফ হলো উদ্ভিদের সূক্ষ্ম বৃদ্ধি পরিমাপ করার একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র। এই বৈপ্লবিক যন্ত্রটি উদ্ভিদের এমন সব অতি ধীর গতি ও বৃদ্ধির হার রেকর্ড করতে পারত, যা খালি চোখে বা সাধারণ কোনো উপায়ে দেখা অসম্ভব ছিল। ঘড়ির কাঁটার মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ এবং একটি বিশেষ দ্বৈত-হাতল (double-lever) ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেসকোগ্রাফ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রায় ১০,০০০ গুণ পর্যন্ত বড় বা বিবর্ধিত করে দেখাতে সক্ষম হতো। এই অসাধারণ যন্ত্রটির সাহায্যে জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদ আলো, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক পদার্থের মতো বাহ্যিক উদ্দীপনায় ঠিক প্রাণীদের মতোই সাড়া দেয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ	জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণায় প্রয়োগ
১. পর্যবেক্ষণ (Observation)	দেখা যায় যে উদ্ভিদ আলো, তাপ, রাসায়নিক পদার্থ ও অন্যান্য পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেয়।
২. প্রশ্ন (Question)	উদ্ভিদ কি সত্যিই বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রতি পরিমাপযোগ্য শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া দেখায়?
৩. অনুকল্প (Hypothesis)	উদ্ভিদ জীবন্ত প্রাণীর মতোই পরিবেশগত উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেয় এবং সেই সাড়া পরিমাপ করা সম্ভব।
৪. পূর্বাভাস বা পূর্বানুমান (Prediction)	যদি উদ্ভিদ উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেয়, তবে আলো, তাপ বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করলে তাদের নড়াচড়া বা বৃদ্ধির হারে পরিবর্তন দেখা যাবে।
৫. পরীক্ষা (Experiment)	ক্রেসকোগ্রাফ ব্যবহার করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হাজার গুণ পর্যন্ত বড় করে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড (Record) করা হয়। বিভিন্ন উদ্দীপনা প্রয়োগ করে বৃদ্ধির হার পরিমাপ করা হয়।
৬. তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis)	পরীক্ষার ফলাফল দেখায় যে উদ্দীপনার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার ও শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ পরিবর্তিত হয়।
৭. সিদ্ধান্ত (Conclusion)	উদ্ভিদ বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেয় এবং তাদের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করা যায়।
৮. নতুন প্রশ্ন (Further Investigation)	উদ্ভিদের সাড়া কীভাবে কোষীয় ও আণবিক স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয়? বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কেন?

২.১ বিজ্ঞানের প্রকৃতি বা সরূপ।

বিজ্ঞানের প্রকৃতি বা সরূপ (The Nature of Science) হলো সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা যা দিয়ে বোঝা যায় বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কীভাবে তৈরি ও বিকশিত হয়। এটি কেবল বিজ্ঞানের তথ্য নয়, বরং বিজ্ঞান কী, এর সীমাবদ্ধতা কী এবং কীভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো যাচাই করা হয়, তার সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক এবং এর প্রকৃতি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. প্রমাণ-ভিত্তিক (Empirical) এবং যুক্তিনির্ভর (Logical): বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগত থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ এবং পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক ধারণা বা অনুমান (অনুকল্প, Hypothesis) এমন হতে হবে যা পরীক্ষাযোগ্য (Testable), অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুকল্প পরীক্ষা করে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং যৌক্তিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়। এটি কল্পনা বা অন্ধ বিশ্বাসের চেয়ে প্রমাণের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

২. পুনরাবৃত্তিযোগ্য (Repeatable) ও পরিবর্তনশীল (Tentative): বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একই পরীক্ষা অন্য বিজ্ঞানীরা একই শর্তে করলে একই বা কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় নয়। নতুন কোনো প্রমাণ বা উন্নত প্রযুক্তি আসলে, আগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ধারণাও পরিবর্তিত বা উন্নত হতে পারে।

৩. সৃজনশীলতা (Creative and Imaginative): বিজ্ঞান কেবল মুখস্থবিদ্যার বিষয় নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নকশা তৈরি করার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রচুর সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়।

৪. বস্তুনিষ্ঠতা (Objective): বিজ্ঞান সবসময় পক্ষপাতহীন এবং বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে, যাতে ব্যক্তিগত মতামত বা আবেগ গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে না পারে।

৫. তত্ত্ব ও সূত্রের মধ্যে পার্থক্য (Theories and Laws): বিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' (Theory) এবং 'সূত্র' (Law) দুটি আলাদা বিষয়। সূত্র হলো প্রাকৃতিক ঘটনার সরল নিয়ম, ধরন বা প্যাটার্ন (Pattern), আর তত্ত্ব হলো সেই নিয়মগুলো কেন এবং কীভাবে কাজ করছে তার বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। একটি সূত্র প্রকৃতিতে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা কোনো ঘটনার বর্ণনা দেয়, অর্থাৎ এটি বলে **কী ঘটে (What happens)**। অন্যদিকে, একটি তত্ত্ব সেই ঘটনার **কেন এবং কীভাবে ঘটে (Why and how it happens)** তার ব্যাখ্যা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের সম্পর্ক বর্ণনা করে, আর আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সেই আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে। তাই বৈজ্ঞানিক সূত্র ও তত্ত্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো—সূত্র কোনো ঘটনার বর্ণনা দেয়, আর তত্ত্ব সেই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করে। ‘তত্ত্ব এবং সূত্র’ উভয়ই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বতন্ত্র এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

২.২ প্রকৃতিকে বা জীবদেরকে অধ্যয়নের সময়, বিজ্ঞানীরা অনুকল্প (Hypothesis) তৈরি করেন এবং তা পরীক্ষা করেন।

বিজ্ঞান হলো জানার একটি উপায়। এটি প্রাকৃতিক জগৎকে বোঝার একটি পদ্ধতি। কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করা মানুষের একটি প্রাথমিক মানসিক প্রবৃত্তি। বিজ্ঞান আমাদের কৌতূহল থেকে তৈরি হয়েছে। আমাদের নিজেদের, অন্যান্য প্রাণীর, পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই বিজ্ঞান এসেছে। "বিজ্ঞান" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ *"scientia"* থেকে এসেছে, যার অর্থ হল “জানা”। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে চারপাশের জগতকে যতটা সম্ভব সঠিকভাবে বোঝা। বিজ্ঞানীরা ধরে নেন যে আজ যেসব প্রাকৃতিক শক্তি কাজ করছে, সেগুলো অতীতেও একইভাবে কাজ করেছে, এবং মহাবিশ্বের

সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। এই ধারনা থেকেই বিজ্ঞান শুরু হয়।

বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো **অনুসন্ধান (Inquiry)**— প্রকৃতির ঘটনাগুলোর কারণ খুঁজে বের করা এবং ব্যাখ্যা করা। অনেক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" বা *Scientific Method* নিয়ে লিখে আসছেন। অনেকে মনে করে বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও একমাত্র পদ্ধতি আছে। এই রকম সরলীকরণ (Oversimplification) সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। সফল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বা একক পদ্ধতি নেই। অন্যান্য অনুসন্ধানের মতোই, বিজ্ঞানেও দরকার হয় পরিকল্পনা, যুক্তি, সৃজনশীলতা, ধৈর্য, এবং মাঝে মাঝে সৌভাগ্যেরও দরকার হয়। বিজ্ঞান চর্চায় যেমন আছে কষ্ট তেমনি আছে কোনো কিছু আবিষ্কারের মজাও।

বিজ্ঞানীরা তাদের সংগ্রহ করা তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন। তবে বিজ্ঞানীরাও মানুষ, তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। তবুও, বিজ্ঞান একটি যৌথ প্রচেষ্টা এবং অন্যদের দ্বারা নিয়মিত যাচাই (Scrutiny) হয়। আর নিয়মিত যাচাই হওয়ার কারণেই বিজ্ঞানের ভুলগুলো (Error) সচরাচর সংশোধিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা একটি অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন, যেখানে তারা পর্যবেক্ষণ করেন, যৌক্তিক ও পরীক্ষাযোগ্য অনুকল্প (Hypothesis, হাইপোথিসিস) তৈরি করেন এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেন। এই প্রক্রিয়া বারবার চলতে থাকে। কখনো পরীক্ষার পর যদি নতুন কিছু দেখা যায়, তখন পুরনো অনুকল্প বদলাতে হয় বা নতুন অনুকল্প করতে হয়। তারপর আবার পরীক্ষা করা হয়। একজন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল অন্যরা যাচাই করেন। যদি সেই ফলাফল বারবার পরীক্ষা করেও একইভাবে পাওয়া না যায়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞান আরও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয় এবং বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়ম বা জীবদের সম্পর্কে ভালোভাবে ও সঠিকভাবে বুঝতে পারেন।

বিজ্ঞানের একটি বড় অংশই বর্ণনামূলক (Descriptive)।

বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণা হলো: প্রথমে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তারপর সেই পর্যবেক্ষণ থেকে একটি **অনুকল্প (Hypothesis, অনুমেয় প্রস্তাব বা উপপ্রমেয়)** তৈরি হয়। অনুকল্প হচ্ছে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সেই অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) যা পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমেই অনুকল্প বা হাইপোথিসিসের যাচাই করা হয়। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে নতুন নতুন পর্যবেক্ষণগুলো মূল্যায়ন করে প্রকৃতিকে আরও সঠিকভাবে জানা ও বোঝা।

বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আসলে শুধু পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কিছু বোঝার জন্য প্রথম ধাপ হলো, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে এবং সঠিকভাবে বর্ণনা করা। জীববিজ্ঞানের একটি মূল কাজ হলো প্রকৃতির একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনা তৈরি করা। জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) নিয়ে গবেষণা এমনই এক ধরনের বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। এই গবেষণার ফল জীববিজ্ঞানের অনেক অন্য শাখায় কাজে লাগে। জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সব জীবকে চিহ্নিত ও শ্রেণিবদ্ধ (Classify) করার চেষ্টা করেন। এই কাজটা পুরোপুরি বর্ণনামূলক, তবে এর ফলে আমরা জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারি এবং মানুষ জীববৈচিত্র্যের ওপর কী প্রভাব ফেলছে, সেটাও বুঝতে পারি।

২১শ শতকের শুরুতে অণুজীববিজ্ঞানের (Molecular Biology) সবচেয়ে বড় অর্জনগুলোর একটি ছিল মানুষের সম্পূর্ণ জিনোম (Genome) বা জিনসমগ্রের সিকোয়েন্স বা ক্রম নির্ণয় করা। এই জিনসমগ্রের তথ্য থেকে মানবদেহ সম্পর্কে নতুন অনেক অনুকল্প তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অনুকল্পগুলো পরীক্ষা করার জন্য অনেক গবেষণাও হচ্ছে, যার মাধ্যমে আমরা মানবদেহ সম্পর্কে নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে

পারছি। আর জিনোম সিকোয়েন্স বের করাটা ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যার ফলাফলই ছিল সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক—সমগ্র জিনের নিউক্লিওটাইড ক্রম নির্ধারণ এবং বর্ণনা করা।

অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ। (Exploration and Observation)

জীববিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো, সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শুরু হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য সংগ্রহের সময়, তারা প্রায়ই মাইক্রোস্কোপ, সূক্ষ্ম তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র বা উচ্চ-গতির ক্যামেরার মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, যা তাদেরকে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে বা বুঝতে সাহায্য করে।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পেতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, কোষের গঠন সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তা বহু বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। আবার, এখন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবের জিন পরীক্ষা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন, যেগুলো বিশেষ ডেটাবেস (Database) বা তথ্যভাণ্ডারে রাখা হচ্ছে। একইভাবে, কোন রোগে কোন জিনের প্রকাশ বা কাজ (Gene expression or Function) বদলে যায়, তা নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য রোগের কারণ বুঝতে এবং এর প্রতিকার বের করতে সাহায্য করে।

প্রকৃতি সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে, জীববিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক লেখালেখির উপর অনেকটাই নির্ভর করেন। অন্য বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত গবেষণা ও লেখাই হলো বৈজ্ঞানিক সাহিত্য (Scientific Literature)। পূর্বের প্রকাশিত গবেষণা ও ফলাফল সম্পর্কে পড়ে ও বুঝে বিজ্ঞানীরা নতুন গবেষণার ভিত্তি ও অনুকল্প তৈরি করেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা (Research Article/Paper) বা রচনাগুলো খুঁজে পাওয়া আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক সহজ, কারণ এখন সব তথ্য ইন্টারনেট বা অনলাইন ডেটাবেসে সংরক্ষিত (যেমন, PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) এবং সহজে অনুসন্ধানযোগ্য (Searchable, সার্চ করা যায়)। এই প্রযুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত খুঁজে পেতে পারেন। অর্থাৎ, বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণার জন্য দরকারি তথ্য খুঁজে পেতে এখন আর বেশি সময় লাগে না।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ I (Gathering and Analyzing Data)

বিজ্ঞানীরা যেসমস্ত পর্যবেক্ষণগুলো লিখে বা লিপিবদ্ধ (Record, রেকর্ড) করে রাখেন, সেগুলোকে বলা হয় **তথ্য বা ডেটা (Data)**। সহজভাবে বললে, ডেটা হলো এমন কিছু তথ্য বা উপাত্ত যার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন। বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ভিত্তি হচ্ছে ডেটা বা তথ্য।

অনেকেই মনে করে, ডেটা মানেই সংখ্যা। কিন্তু সব ডেটা সংখ্যা হয় না। কিছু ডেটা বর্ণনামূলক হয়, যেমন কারো আচরণ বা রঙ কেমন ছিল, তা লিখে রাখা। একে বলে **গুণগত তথ্য (Qualitative Data)**। গুণগত তথ্যের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গবেষক জেইন গুডঅল (Jane Goodall) দীর্ঘ সময় ধরে তানজানিয়ার জঙ্গলে শিম্পাঞ্জিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তা লিখে রেখেছেন **(চিত্র ২.২.১)**। তিনি শুধু গুণগত তথ্যই নয়, বরং শিম্পাঞ্জিদের বিভিন্ন আচরণ কতবার করে বা কতক্ষণ ঘটল এরকম পরিমাপমূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ ধরনের তথ্যকে **পরিমাণগত তথ্য (Quantitative Data)** বলা হয়, যা সাধারণত সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং সারণি বা চিত্রের (Table and Graph) উপস্থাপন করা হয়। বিজ্ঞানীরা এসব তথ্য **পরিসংখ্যান (Statistics)** নামক গণিতের এক বিশেষ শাখা ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করেন, যাতে বোঝা যায় তথ্য বা ডেটাগুলো ব্যবহার করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা গুরুত্বপূর্ণ কিনা, নাকি কেবল কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে। জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক পাঠগুলো নিলে এই বিষয়গুলো আরো ভালভাবে বোঝা যাবে।

চিত্র ২.২.১: জেইন গুডঅল (Jane Goodall) শিম্পাঞ্জিদের আচরণ নিয়ে গুণগত তথ্য (Qualitative Data) সংগ্রহ করতেন। তিনি তার পর্যবেক্ষণসমূহ মাঠে বসে নোটবুকে লিপিবদ্ধ করতেন, এবং প্রায়ই চিম্পাঞ্জিদের আচরণের চিত্র বা স্কেচ (Sketch) এঁকে রাখতেন।

বিজ্ঞান আরোহী বা ইন্ডাকটিভ (Inductive) এবং অবরোহী যুক্তি বা ডিডাকটিভ (Deductive) উভয় ধরনের যুক্তি (Reasoning)ব্যবহার করে।

জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। একজন মানুষ চিন্তা করে এবং তার চারপাশের জগৎটাকে বুঝতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ যুক্তি ব্যবহার করে। মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেমন, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ও ত্বক-এর মাধ্যমে পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এছাড়াও, স্মৃতি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেও তথ্য আসে। এসব সংগৃহীত তথ্য মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াজাত হয়। মস্তিষ্কে তথ্যকে জমা করা হয়, সাজানো হয়, তুলনা করা হয়, এবং পূর্বের স্মৃতি বা জ্ঞানের সাথে যুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন ধারণা তৈরি করে। এই ধারণাগুলো বস্তু, ঘটনা, সম্পর্ক বা বিমূর্ত চিন্তা সম্পর্কে হতে পারে। মানুষ নতুন ধারণা তৈরি করতে, ভবিষ্যত অনুমান করতে এবং সমস্যার অভিনব সমাধান বের করতে কল্পনা ও সৃজনশীলতা ব্যবহার করে। কোনো ঘটনা কেন ঘটল বা কোন জিনিস কেমন, তা জানার জন্য মানুষ কারণ অনুসন্ধান করে। তারা ঘটনার পেছনের সম্পর্ক এবং প্রভাব যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। **যুক্তি (Reasoning)** হলো কতগুলো ধাপের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত বিকশিত হয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। যুক্তি হলো কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য কারণ ও প্রমাণ ব্যবহার করা। যুক্তি ব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। তারা সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে, সম্ভাব্য সমাধানগুলো বিবেচনা করে এবং সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি নির্বাচন করে। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সেরাটি বেছে নেওয়ার জন্য মানুষ কারণ ও যুক্তি ব্যবহার করে। তারা প্রতিটি বিকল্পের সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে এবং তাদের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তি ব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন ধারণা, যুক্তি বা সিদ্ধান্তকে সমালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারে। যুক্তি ব্যবহার করে তারা দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করে এবং আরও শক্তিশালী যুক্তি তৈরির চেষ্টা করে। সর্বসমেত, একজন মানুষ অধাবশায়, চিন্তা এবং যুক্তির সমন্বিত ব্যবহারের

মাধ্যমে চারপাশের জগৎটাকে বোঝার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করে।

যুক্তিবিদ্যার (The Study of Logic) পাঠে দেখা যায় যে, যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দুটি উপায় আছে: ১. আরোহী বা ইন্ডাকটিভ যুক্তি **(Inductive Reasoning)**। ২. অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তি **(Deductive Reasoning)**। বিজ্ঞানীরা বিপরীতমুখী এই দুই পদ্ধতিই ব্যবহার করেন, তবে বিশেষভাবে অনুকল্পভিত্তিক গবেষণায় ইন্ডাকটিভ যুক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়।

আরোহী বা ইন্ডাকটিভ যুক্তি (Inductive Reasoning): বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার সময় বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নিয়ম বা সত্য আবিষ্কার করেন। একে বলে আরোহী বা ইন্ডাকটিভ যুক্তি। আরোহী যুক্তি হচ্ছে অনেক ছোট ছোট ঘটনা দেখে বড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ঘটনা বা পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ নিয়ম তৈরি করা। যেমন, "সূর্য সবসময় পূর্ব দিক থেকে উঠে"—এই সিদ্ধান্ত আমরা বহুদিন পর্যবেক্ষণ করার পর জেনেছি। আরেকটা উদাহরণ, "সব জীব কোষ দিয়ে তৈরি"—এ কথাটাও বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে অনেক প্রাণীর কোষ দেখে বলছেন। এভাবে পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারেন। এই যুক্তির সিদ্ধান্ত নিশ্চিত নাও হতে পারে, তবে এর সম্ভাবনা বেশি থাকে। আরোহী যুক্তি শুরু হয় একটা ছোট ধারণা থেকে অথবা অনেকগুলো ছোট ধারণা একসাথে করে, তারপর এই ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (Bottom-up Reasoning)। ইবন আল-হাইসাম (ابن الهيثم, Ibn al-Haytham-ইবন আল-হাইথাম), ইবনে সিনা, আইজ্যাক নিউটন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে পৃথিবীর এবং জীবের নিয়ম-কানুন বোঝার জন্য আরোহী যুক্তি ব্যবহার শুরু করেন।

আধুনিক জীববিজ্ঞানের জিনের (Gene) ভূমিকা নির্ণয় করা আরোহী যুক্তি একটির উদাহরণ। বিজ্ঞানীরা ড্রোসোফিলা (*Drosophila melanogaster*) নামক এক ধরনের ফলের মাছির ওপর গবেষণা করে শরীরের গঠনের এমন কিছু জিন শনাক্ত করেন, যেগুলো পরে দেখা গেছে সব বহু-কোষী প্রাণী এবং মানুষের মধ্যেও আছে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে বলেছেন, সব প্রাণীর গঠন ও বিকাশ একই ধরণের জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তি (Deductive Reasoning): আরোহী বা ইন্ডাকটিভ যুক্তি যেখানে নির্দিষ্ট কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, সেখানে অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তি ঠিক উল্টোভাবে সাধারণ নিয়ম থেকে নির্দিষ্ট ফলাফলের অনুমান করে। অবরোহী বা ডিডাকটিভ যুক্তি একটা বড় ধারণা থেকে শুরু করে একটা ছোট সিদ্ধান্তে আসে (Top-down Reasoning)। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়, অবরোহী যুক্তি সাধারণত কোনো নিয়ম সত্য হলে আমরা কী ফলাফল আশা করতে পারি—তা অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়। এই অনুমান দিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুকল্প (Hypothesis, হাইপোথিসিস) তৈরি করেন। এরপর সেই অনুকল্পটি যাচাই করতে বিভিন্ন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা হয়, যেন দেখা যায় যা অনুমান বা অনুকল্প করা হয়েছে তা সঠিক কিনা। এই ধরনের অবরোহী যুক্তি সাধারণত "যদি...তবে..." ধরনের যুক্তিতে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক কেউ তার বাসায় একটি বাতি বা বাল্ব (Bulb) চালু করতে পারছে না, এবং অনুমান করছে যে বাল্বটি পুড়ে গেছে। তাহলে একটি অবরোহী যুক্তি হবে— "যদি পুড়ে যাওয়া বাল্বের অনুমানটি সঠিক হয়, তবে নতুন একটি বাল্ব লাগালে বাসাটি আবার আলোকিত হবে।" এইভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাতেই বৈজ্ঞানিক অনুমান বা ধারণার সত্যতা যাচাই করতে অবরোহী যুক্তি ব্যবহৃত হয়। অবরোহী যুক্তির আরো উদাহরণ হচ্ছে, যদি বলা হয় "সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোম থাকে", এবং কেউ যদি এমন কোনো প্রাণী দেখে যার লোম নেই, তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায়—"এই প্রাণীটি স্তন্যপায়ী নয়"। জীববিজ্ঞানীরাও এভাবেই

কোনো প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দেখে তার শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রজাতি নির্ধারণ করেন।

২.৩ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল হচ্ছে অনুকল্প তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা।

অনুকল্প বা হাইপোথিসিস হলো কোনো ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুমান করা এবং সেটির প্রস্তাবিত বিবরণ। কোনো অনুকল্পকে বৈজ্ঞানিক অনুকল্প বলা যায় তখনই, যখন সেটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। সাধারণত যেসব পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা নতুন বৈজ্ঞানিক অনুকল্প তৈরি করেন। অনেক সময় "অনুকল্প" আর "তত্ত্ব" শব্দ দুটি একইভাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আসলে তারা এক নয়। বৈজ্ঞানিক অনুকল্প হলো অস্থায়ী ব্যাখ্যা, যা পরে গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো বহুবার পরীক্ষা ও প্রমাণিত একটি দৃঢ় ব্যাখ্যা। একটি কার্যকর অনুকল্প সাধারণত গবেষণার জন্য অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয় এবং এটি শুরু হয় একটি চিন্তাশীল অনুমান বা ধারণা থেকে। ইতিহাসে দেখা যায়, "অনুকল্প" শব্দটি একসময় ধ্রুপদী নাটকের কাহিনীর মূল ঘটনা, চরিত্র, এবং সংলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা সংক্ষিপ্তসার বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। ইংরেজি Hypothesis শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ **ὑπόθεσις** (HupoThesis) থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো "অধীনে বা নিচে (Hupo) স্থাপন (Thesis)"। Hypothesis শব্দটির সম্মিলিত অর্থ হলো এমন কিছু যা নিচে স্থাপন করা হয় ভিত্তি হিসেবে, অর্থাৎ Hypothesis হল এমন একটি প্রস্তাব যা যুক্তি বা অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সময়ের সাথে সাথে ইংরেজিতে Hypothesis শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন এই শব্দটি কোনো ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বা যুক্তির প্রাথমিক ভিত্তি বা অনুমান হিসেবে ধরা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাইপোথিসিস বা অনুকল্পের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ অ্যান্টার্কটিকার হাইপোথিসিস পর্বতটির নামকরণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান অনুমানভিত্তিক।

আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল প্রায়ই আমাদেরকে মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক করে। আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার আসল কারণ জানতে চাই। যেমন, জঙ্গলে শিম্পাঞ্জিদের ভিন্ন ভিন্ন আচরণের কারণ কী? একই প্রজাতির বিড়ালের লোমের রঙ আলাদা কেন **(চিত্র ১.৪.১)**? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে অনুকল্প (Hypothesis) তৈরি করতে হয় এবং তা পরীক্ষা করতে হয়।

বিজ্ঞানে, অনুকল্প হলো একটি অনুমান (Assumptions) যা আমরা পর্যবেক্ষণ ও ধারণার ভিত্তিতে তৈরি করি এবং যা পরীক্ষা করে দেখা যায়। সহজভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানে অনুকল্প হলো পরীক্ষাযোগ্য একটি ব্যাখ্যা। এটি সাধারণত দেখা তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় এবং আরোহী যুক্তি দিয়ে গড়ে ওঠে।একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প এমন হতে হবে যা থেকে পরীক্ষাযোগ্য পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী (Testable Prediction) করা যায়। পরীক্ষা (Experiment) মানে হলো বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু যাচাই (Test) করা। যদি কোনো অনুকল্প পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে না মেলে, তবে সেটি বাতিল করা হয়।

আমরা সবাই দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধানে পর্যবেক্ষণ করি, প্রশ্ন তৈরি করি এবং অনুমানভিত্তিক অনুকল্প দাঁড় করাই। উদাহরণস্বরূপ, ধরি একটি টেবিল ল্যাম্প বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত এবং সুইচ অন করা আছে, কিন্তু বাতি জ্বলছে না। এটি একটি পর্যবেক্ষণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ল্যাম্পটা কেন কাজ করছে না? অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুটি সম্ভাব্য অনুকল্প দাঁড় করানো যায়: (১) বাল্ব বা বাতিটি পুড়ে গেছে অথবা (২) বাল্বটি ঠিকমতো লাগানো বা স্ক্রু (Screw) করা হয়নি। প্রতিটি অনুকল্প থেকেই একটি করে পরীক্ষাযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। যেমন, যদি অনুকল্প করা হয় যে বাতি

পুড়ে গেছে, তবে নতুন বাল্ব লাগালে সমস্যাটি সমাধান হবে। **চিত্র ২.৩.১**-এ কিভাবে অনুকল্পের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে তা অনৈয়মিকভাবে (Informally) দেখানো হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন অনুকল্পের মাধ্যমে শুদ্ধাশুদ্ধি পদ্ধতিতে (Trial and Error) সমাধান খোঁজা আসলে একটি অনুমান-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শুদ্ধাশুদ্ধি (Trial and Error) বলতে বোঝায় বার বার চেষ্টার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে সেটিকে নির্ভুল ও সঠিক করা। অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধি হচ্ছে বিশুদ্ধকরণ বা শোধন করার একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো কিছু থেকে অশুদ্ধ বা ভুল অংশ দূর করে সেটিকে বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল করা হয়।

চিত্র ২.৩.১: (ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সরল (Simple) ধাপসমূহ। এখানে একটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method)" দেখানো হয়েছে। মূলত একটি নষ্ট টেবিল ল্যাম্পের উদাহরণ দিয়ে কিভাবে অনুকল্প যাচাই (hypothesis testing) করা হয় তার প্রক্রিয়া লেখা হয়েছে। (খ) দশম-একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী ইবনে আল-হাইসাম (লাতিন ভাষায় আল-হাজেন, Latinized as Alhazen) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশের জন্য সুপরিচিত। তাঁর গবেষণার ধরন ছিল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাইয়ের ওপর ভিত্তি করে, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরীক্ষা চালিয়ে তাঁর তত্ত্বগুলো যাচাই করতেন, যাতে পরীক্ষার ফলাফল কেবল ভাবনা (Speculation), অনুমান বা দার্শনিক যুক্তির ওপর নয়, বরং বাস্তব প্রমাণের (Empirical Evidence) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ায়।

ক)

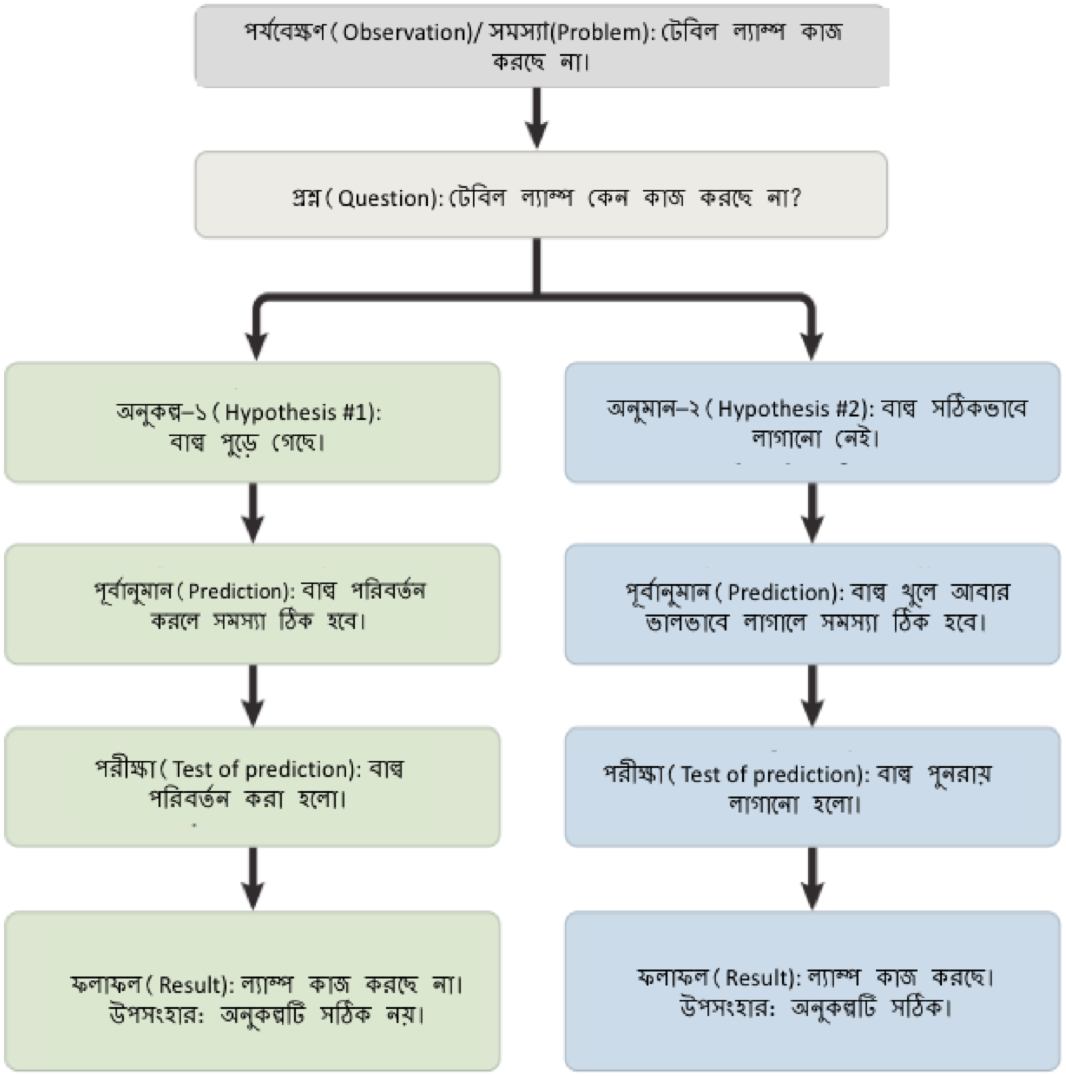

খ)

অনুকল্পের সীমাবদ্ধতা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ বা তথ্য আসার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক অনুমান ও অনুকল্পগুলো পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। টেবিল ল্যাম্পের উদাহরণ দিয়ে আমরা বিজ্ঞানে অনুকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে পারি। *প্রথমত,* কোনো একটি সমস্যা সমাধান বা ঘটনার জন্য একাধিক অনুকল্প করা সম্ভব। যেমন, আমাদের নষ্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে আরেকটি অনুমান হতে পারে, দেয়ালের সকেটটাই (Socket) ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই অনুকল্পটিও আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে পারি। আবার আরেকটি অনুকল্প হতে পারে বৈদ্যুতিক সব তারগুলোই নষ্ট। তবে, সব সম্ভাব্য অনুকল্পগুলো পরীক্ষা করা সাধারণত সম্ভব হয় না। *দ্বিতীয়ত,* অনেকসময় কোনো অনুকল্পকে সম্পূর্ণভাবে সত্য প্রমাণ করা যায় না। যেমন, আমরা যদি দেখি নতুন বাল্ব লাগানোর পর ল্যাম্পটি কাজ করল, তখন আমরা যে অনুকল্পটি করেছিলাম, "বাল্বটি পুড়ে গিয়েছিল", সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য মনে হবে। তবে এমনও হতে পারে যে আসলে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল এবং বাল্ব বদলানোর সময়ই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে এসেছিল। অর্থাৎ, এখানে বিদ্যুৎ আসার কারণে ল্যাম্পটির আবার কাজ করা "বাল্বটি পুড়ে গিয়েছিল"- এই অনুকল্পটিকে সত্য প্রমাণ করে না; বরং বোঝা যায় যে এটি অনুকল্পটিকে ভুল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, অনেকক্ষেত্রেই কোনো কোনো অনুকল্পকে শতভাগ সত্য প্রমাণ করা যায় না। তবে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করলে অনুকল্পের প্রতি আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাস বাড়ে। অনেকসময় বার বার বা ধারাবাহিকভাবে অনুকল্পকে পরীক্ষা করলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য (Scientific Consensus) গড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য হচ্ছে যখন অনেক বিজ্ঞানীরা একসাথে একমত হন যে নির্দিষ্ট একটি অনুকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বার বার যাচাই করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না, যে সমস্যা বিজ্ঞান দিয়ে সমাধান করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (Scientific Inquiry) প্রকৃতিকে জানার একটি শক্তিশালী উপায়, তবে এরও সীমাবদ্ধতা আছে। সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্পকে অবশ্যই পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ, এমন পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা থাকতে হবে যা দেখাতে পারে অনুকল্পটি সত্য না মিথ্যা। যেমন, যদি আমাদের অনুকল্প হয় যে ল্যাম্প না জ্বলার একমাত্র কারণ হলো বাল্ব পুড়ে যাওয়া, এবং নতুন বাল্ব লাগানোর পরও যদি ল্যাম্প না জ্বলে, তবে আমরা বলতে পারি আমাদের অনুকল্পটি সঠিক নয়।

সব অনুকল্পই বিজ্ঞানের মানদণ্ড পূরণ করে না। যেমন, "অদৃশ্য ভূত ল্যাম্প নিয়ে খেলা করছে বা বাতিটি নিভিয়ে দিচ্ছে"—এই অনুমান পরীক্ষা করার কোনো উপায় নেই। কারণ বিজ্ঞান শুধু প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য পরীক্ষাযোগ্য ব্যাখ্যা বা অনুকল্প নিয়ে কাজ করে। তাই বিজ্ঞান ভূত, জিন, আত্মা বা পরীরা ঝড়, রংধনু বা অসুখ ঘটায় কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এগুলোকে বলা হয় অলৌকিক (Supernatural) ঘটনা, যা বর্তমান বিজ্ঞানের সীমার বাইরে। একইভাবে ধর্মীয় বিষয়ও বিজ্ঞানের আলোচনার বাইরে, কারণ সেগুলো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়। তবে বিজ্ঞান আর ধর্ম একে অপরের বিপরীত বা বিরোধী নয়; তারা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নমনীয়। (Scientific process is flexible)

এই জগতের বা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পদ্ধতিকে আমরা **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** (Scientific Method) নামে জানি। অনেকে মনে করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়। তবে বাস্তবে বিজ্ঞানীরা খুব কম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই (Scientific Inquiry) নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিজ্ঞানী প্রথমে একটি অনুকল্প পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন, কিন্তু পরে বুঝলেন আগে আরও কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বা তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, তখন তিনি অনুকল্পটি বাদ দেন। নতুন পর্যবেক্ষণ বা তথ্যের ভিত্তিতে নতুন অনুকল্প তৈরি করেন এবং তা পরীক্ষা করার নতুন পরিকল্পনা করেন। আবার অনেক সময় পর্যবেক্ষণগুলো এতটাই জটিল হয় এর উপর ভিত্তি করে কোনো অনুকল্প তৈরি যায় না, যতক্ষণ না নতুন গবেষণা পর্যবেক্ষণগুলো বোঝার জন্য নতুন প্রেক্ষাপট দেয়। যেমন, জিন কীভাবে প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা দেয়, তা বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বুঝতে পারেননি **১৯৫৩** সালে DNA-এর গঠন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার একটি বাস্তবসম্মত ধাপগুলো চিত্র **চিত্র ২.৩.২**-এ দেখানো হয়েছে। এখানে

চিত্র ২.৩.২: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি বাস্তবসম্মত চিত্র বা মডেল (A Realistic Model)। বাস্তবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি সরল বা সাধারণ প্রক্রিয়া নয় বরং এর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি ঘটে। মতামত বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। নিচের চিত্রটি "বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে (How Science Works)" নামক একটি লেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা Understanding Science (www.understandingscience.org) ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

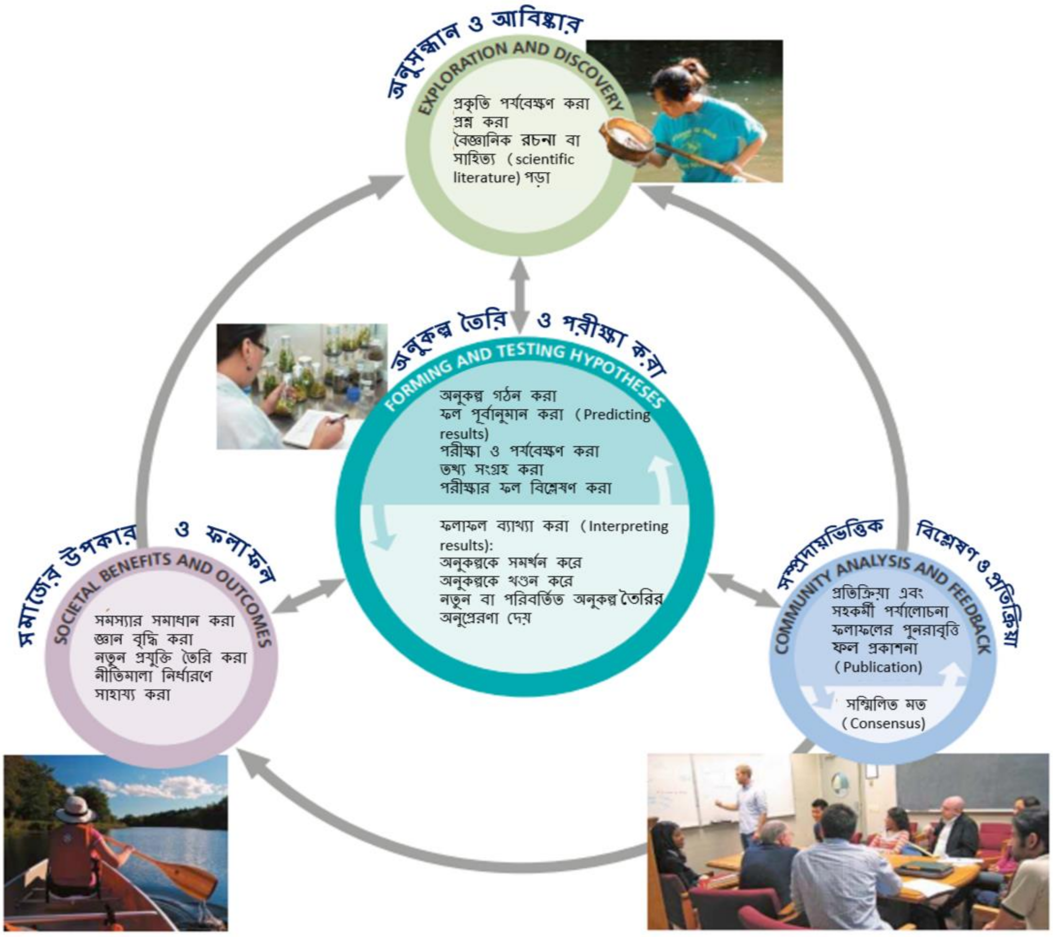

এই প্রক্রিয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো অনুকল্প তৈরি ও পরীক্ষা করা। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে বা জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বিজ্ঞানের সাফল্যের প্রধান কারণই হলো এই পদ্ধতি বা কার্যক্রম।

বিজ্ঞানীরা যখন অনুকল্প তৈরি বা পরীক্ষা করেন, তা তাদের চারপাশের পরিবেশ, অন্যান্য বিজ্ঞানী বা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই কোন অনুকল্পগুলো পরীক্ষা করা হবে, পরীক্ষার ফলাফল কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, আর গবেষণার ফলাফলের কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, এসব কিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। একইভাবে সমাজের প্রয়োজন নির্ধারণ করতে পারে কোন গবেষণায়—যেমন ক্যান্সারের চিকিৎসা খোঁজা বা জলবায়ু পরিবর্তন বোঝা—অর্থায়ন হবে এবং গবেষণার ফলাফল কতটা গুরুত্ব পাবে।

পাঠের এই অংশে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেছিঃ **পর্যবেক্ষণ করা, অনুমান তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা**। তবে ব্যাবহারিক পাঠে বা বাস্তব বৈজ্ঞানিক গবেষণা করলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো সহজেই বোঝা যাবে।

২.৪ একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। (A Scientific Inquiry)

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা এখানে একটি কেস স্টাডি বা ঘটনা আলোচনা করব। কেস স্টাডি (Case Study) হলো একটি ঘটনার অধ্যয়ন বা পর্যেষণা যেখানে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়, বিজ্ঞানীরা কীভাবে প্রশ্ন তৈরি করেন, তথ্য সংগ্রহ করেন, পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। একটি কেস স্টাডি সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলোকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করে, যাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বাস্তবে কীভাবে কাজ করে তা সহজে বোঝা যায়।

অনুকল্পকে তখনই সঠিক বলা যায় যখন তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প (Hypothesis) সফল হতে হলে শুধু পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা বা সমস্যার সমাধান বর্ণনা করলেই হবে না, সেটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোনো অনুকল্প হয়তো সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে, এমনও মনে হতে পারে যে এটি একদমই সঠিক, কিন্তু তারপরও অনুকল্পটি ভুল হতে পারে। টমাস হেনরি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley, ৪ মে ১৮২৫ – ২৯ জুন ১৮৯৫) ছিলেন একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী যিনি তুলনামূলক শারীরবিদ্যা (comparative anatomy) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি চার্লস ডারউইনের সমর্থক ছিলেন এবং বলেছিলেন, *"বিজ্ঞানের বড় দুঃখ হলো, একটি সুন্দর তত্ত্বকে একটি অসুন্দর প্রকৃত তথ্য নষ্ট করে দেয়। (The great tragedy of science, the slaying of a beautiful theory by an ugly fact)".*

অণুজীববিজ্ঞানের **(Microbiology)** প্রাথমিক ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ দেখা যাক। আমরা জানি যে, পুষ্টিকর যেকোনো সুরুয়া বা স্যুপ (Soup, Nutrient broth) যদি খোলা বাতাসে রেখে দেওয়া হয়, তবে তা নষ্ট বা দূষিত হয়ে যায়। এই পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি অনুকল্প দেওয়া হয়েছিলঃ স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি (Spontaneous Generation) এবং জীবাণু অনুকল্প (Germ Hypothesis)।

স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি অনুকল্পে বলা হয়, জৈব অণুর মধ্যে এমন এক অন্তর্নিহিত গুণ আছে যা থেকে জীব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হতে পারে। অপরদিকে জীবাণু অনুকল্পে বলা হয়, বাতাসে আগে থেকেই উপস্থিত অণুজীব পুষ্টিকর স্যুপকে পঁচিয়ে ফেলতে পারে। 'স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি' অনুকল্পটি তৎকালীন সময়ে একটি জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী বিশ্বাস ছিল। এটি জীবনের, বিশেষ করে অণুজীবের উৎপত্তির জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত ব্যাখ্যা ছিল এবং অ্যারিস্টটলের (Aristotle,

গ্রীক দার্শনিক) মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা এটিকে সমর্থন করেছিলেন।

এই দুটি অনুকল্প যাচাই করতে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) একটি চমৎকার পরীক্ষা করেন। লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী (১৮২২-১৮৯৫) যিনি অণুজীববিজ্ঞান ও রোগতত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি জীবাণু অনুকল্পটি পরীক্ষা করার জন্য এমন সরুমুখ বোতল বা ফ্লাস্ক (Swan-neck Flask) বানান যার গলা বাঁকানো, যাতে বাতাস ঢুকতে পারে কিন্তু জীবাণু আটকে যায় **(চিত্র ২.৪.১)**। জীবাণু ফ্লাস্কে পৌঁছাতে পারত না, কারণ তারা বাঁকে আটকে যেত। তিনি ফ্লাস্কে পুষ্টিকর স্যুপ (Nutrient Broth) ভরে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করলেন। এইভাবে রাখা ফ্লাস্কে দীর্ঘদিনেও কোনো জীবাণু জন্মাল না এবং স্যুপও নষ্ট হোল না। কিন্তু তিনি যখন গলার বাঁক ভেঙে দিলেন তাতে আবার জীবাণু জন্মানো শুরু করল এবং স্যুপটিও নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ বাহিরে থাকা জীবাণু সরাসরি স্যুপে ঢুকে গেল এবং সূপটিকে নষ্ট করে দিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে লুই পাস্তুর প্রমাণ করলেন জীবাণু নিজের থেকে তৈরি হয় না, বরং বাতাসে আগে থেকেই থাকা অণুজীব থেকেই জন্মায়। এই পরীক্ষাই 'জীবাণু' অনুকল্পের ভিত্তি মজবুত করে এবং জনপ্রিয় 'স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি' অনুকল্পটিকে বাতিল করে।

নিয়ন্ত্রক এবং চলক। (Control and Variable)

একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কন্ট্রোল **(Control)**, মানদণ্ডক বা নিয়ন্ত্রক মানে হলো সেই দল বা বিষয় যাতে কোনো পরিবর্তন আনা হয় না। কন্ট্রোলকে ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। একটি সহজ উদাহরণ হলো, নতুন ধরনের কোনো সার গাছের বৃদ্ধি বাড়ায় কি না, তার পরীক্ষা করা। এখানে পরীক্ষামূলক দল **(Experimental Group)** হলো যেসব গাছে নতুন সার ব্যবহার করা হবে। আর কন্ট্রোল দল (Control group) হচ্ছে যেসব গাছে কোনো সারই ব্যবহার করা হবে না, শুধু পানি ও মাটি ছাড়া। এখানে কন্ট্রোল দল দেখাবে স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ কতটা বাড়ে। কন্ট্রোল গাছের সাথে সার দেয়া গাছের তুলনা করলেই বোঝা যাবে গাছ বেড়েছে নাকি বাড়েনি। অর্থাৎ, কন্ট্রোল (Control) হলো এমন একটি মানদণ্ড বা তুলনামূলক দল, যাদের উপর কোনো বিশেষ পরিবর্তন বা পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয় না এবং যা বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন প্রাপ্ত ফলাফল আসলেই পরীক্ষার কারণে হচ্ছে নাকি অন্য কোনো কারণে হচ্ছে তা বোঝার জন্য।

ভেরিয়েবল **(Variable)** বা চলক হলো এমন কোনো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান যা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় পরিবর্তন হতে পারে বা পরিবর্তন করানো যায়। চলক পরীক্ষার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিভিন্ন চলকের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন চলক (Independent Variable) গবেষকের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করা হয় যাতে তার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায়। আর স্বাধীন চলক কোনো পরীক্ষার যেসমস্ত উপাদানকে প্রভাবিত করে এবং যা পরীক্ষার পর মাপা হয় বা যায় তাকে বলা হয় নির্ভরশীল চলক (Dependent Variable)। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যেসমস্ত উপাদান অপরিবর্তিত রাখা হয়, যেগুলোকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত চলক (Controlled Variable), যাতে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সঠিকভাবে তুলনা করা যায়। যেকোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে সাধারণত স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয়, আর অন্য সব শর্ত অপরিবর্তিত রাখা হয় যাতে পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। সহজভাবে, যা পরিবর্তন করা হয় তা স্বাধীন চলক; যা মাপা হয় তা নির্ভরশীল চলক; যা একই রাখা হয় তা নিয়ন্ত্রিত চলক। চলকের উদাহরণ হিসেবে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ধরা যেতে পারে। এখানে স্বাধীন চলক হিসেবে আলোর পরিমাণ পরিবর্তন করা হয়, যাতে দেখা যায় এটি গাছের বৃদ্ধিকে কিভাবে প্রভাবিত করে। নির্ভরশীল চলক হিসেবে গাছের উচ্চতা বা পাতা সংখ্যা মাপা হয়। একই সময়ে কিছু উপাদান যেমন মাটির ধরন, পানি পরিমাণ এবং টবের ধরন নিয়ন্ত্রিত চলক হিসেবে

চিত্র ২.৪.১ঃ পুষ্টিকর স্যুপ (Nutrient Broth) ভর্তি একটি ফ্লাস্ক যদি বাতাসে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, তবে পঁচে যাওয়ার উৎস কী?

জীবাণু তত্ত্ব বা জার্ম হাইপোথিসিস (Germ Hypothesis): বাতাসে বিদ্যমান অণুজীবগুলো পুষ্টিকর স্যুপকে দূষিত করে।

পূর্বাভাস (Prediction): যদি জীবাণুকে ফ্লাস্কে ঢুকতে বাধা দেওয়া যায়, তবে জীবাণুমুক্ত স্যুপ জীবাণুমুক্তই থাকবে।

স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি হাইপোথিসিস (Spontaneous Generation Hypothesis): জীবন্ত প্রাণীরা স্যুপে থাকা অজৈব জৈব অণু থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হবে।

পূর্বাভাস (Prediction): জীবাণুমুক্ত করার পরও স্যুপে অজৈব অণু থেকে জীবন্ত প্রাণীর উৎপত্তি ঘটবে।

পরীক্ষা (Test): জীবাণুর প্রবেশ রোধ করতে সোয়ান-নেক (Swan-Necked) বা গলাবাঁকানো (অনেকটা হাঁসের মত) ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হলো। ব্রথ জীবন্ত প্রাণী উৎপাদন করতে সক্ষম কি না, তা যাচাই করার জন্য জীবাণুমুক্ত করার পর ফ্লাস্কের ঘাড় ভেঙে দেওয়া হলো।

ফলাফল (Result): সোয়ান-নেক ফ্লাস্ক জীবাণুমুক্ত থাকলে অণুজীবদের কোনো বৃদ্ধি দেখা যায়নি। কিন্তু বোতলের গলা ভাঙার পর স্যুপটি বাতাসে উন্মুক্ত করলে অণুজীবদের বৃদ্ধি দেখা গেছে।

উপসংহার (Conclusion): স্যুপটিতে যে অণুজীবদের বৃদ্ধি দেখা যায়, তা বাতাসে আগে থেকে উপস্থিত জীবাণুর বা অণুজীবদের কারণেই ঘটে।

অপরিবর্তিত রাখা হয়। একইভাবে, ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি পরীক্ষায়ও স্বাধীন চলক পরিবর্তন করা হয়, নির্ভরশীল চলক মাপা হয় এবং অন্যান্য শর্ত নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। এইভাবে পরীক্ষায় চলকগুলো ব্যবহার করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়।

চিত্র ২.৪.১-এ বর্ণিত লুই পাস্তরের পরীক্ষাটি একটি **নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা (Controlled Experiment)**-এর উদাহরণ। পাস্তর এমন একটি ফ্লাস্ক ব্যবহার করেছিলেন যেটির গলায় বাতাস ঢুকতে পারতো কিন্তু ধুলো ও জীবাণু আসতে পারতো না। এই ফ্লাস্কে স্যুপ দীর্ঘ সময়েও সংক্রমিত হয়নি, যা দেখিয়েছে যে যদি বাহ্যিক জীবাণু ফ্লাস্কের ভিতরে না আসে, তাহলে সংক্রমণ ঘটে না। এই ফ্লাস্কটি হলো কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রক, কারণ এটি পরীক্ষার তুলনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে পরীক্ষামূলক ভেরিয়েবল বা চলক (Experimental Variable) হলো ফ্লাস্কের নলের বাঁক ভাঙ্গা বা পরিবর্তন করা, যাতে দেখা যায় জীবাণু স্যুপে প্রবেশ করলে সংক্রমণ ঘটে কি না। স্বাধীন চলক হলো ফ্লাস্কের নল, যা ভাঙ্গা বা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নির্ভরশীল চলক হলো স্যুপে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি হয়েছে কি না, কারণ এটিকে পরীক্ষা করা বা মাপা হয়েছিল। একই সময়ে কিছু উপাদান নিয়ন্ত্রিত চলক হিসেবে অপরিবর্তিত রাখা হয়,

যেমন স্যুপের ধরন, ফ্লাস্কের আকার ও ধরণ, এবং তাপমাত্রা ও সংরক্ষণের সময়। এইভাবে স্বাধীন চলক পরিবর্তন করে নির্ভরশীল চলকের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়, এবং নিয়ন্ত্রিত চলকগুলো অপরিবর্তিত রাখার মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়।

একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা (Controlled Experiment) মানে হলো বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার পরিবেশের সব বৈশিষ্ট্য বা পরীক্ষাকৃত বিষয়বস্তু নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করেন বা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এটি অসম্ভব। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় এবং এমনকি নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরিতেও এটি খুব কঠিন। আসলে গবেষকরা সাধারণত অবাঞ্ছিত ভেরিয়েবলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে দূর করেন না, বরং কন্ট্রোল গ্রুপ বা দল ব্যবহার করে তাদের প্রভাবকে নিরপেক্ষ বা বাতিল (Cancel Out) করে দেন।

বিজ্ঞানে তত্ত্ব। (Theories in Science)

আমরা সাধারণ কথোপকথনে অনেক সময় বলিঃ “It's just a theory!” অর্থাৎ, “এটা শুধুই একটা মতবাদ বা তত্ত্ব।” কিন্তু বিজ্ঞানে তত্ত্ব (Scientific Theory) শব্দটির মানে একেবারেই আলাদা। এটি কেবল একটি সাধারণ অনুমান বা মতবাদ নয়। তাহলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কী, এবং এটি কীভাবে অনুকল্প (Hypothesis) বা সাধারণ কল্পনার (Speculation) থেকে আলাদা? তত্ত্ব হলো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা, যা সাধারণত একটি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। যেমন, নিউটন (Newton) যে নীতি প্রস্তাব করেছিলেন, “*মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বল অনুভব করে*”, আমরা তাকে বলি *“মহাকর্ষের তত্ত্ব (Theory of Gravity)”*। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে এটি নানা তথ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য পারস্পরিক সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে এক করে। তত্ত্ব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, অনুকল্প ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। ‘বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব’ জ্ঞান সংগঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি কাঠামো দেয়। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরমাণু এবং অতিপারমাণবিক কণার (যেমন ইলেকট্রন) আচরণ ব্যাখ্যা করে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে নানা ধারণা একত্রিত করে, পরীক্ষামূলক সত্য ব্যাখ্যা করে এবং নতুন প্রশ্ন ও গবেষণার দিকনির্দেশনা দেয়। তত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য হলোঃ

১. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুকল্পের চেয়ে অনেক বিস্তৃত। যেমন, একটি অনুকল্প (Hypothesis): *“বাতাসে আগে থেকেই উপস্থিত অণুজীব পুষ্টিকর স্যুপকে পঁচিয়ে ফেলতে পারে।”* শুধু একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একটি তত্ত্ব (Theory): “খাবার পঁচে যাওয়ার কারণ হলো অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বা অণুজীব।” আরও অনেক বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আরেকটি জনপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছেঃ *“প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)-এর মাধ্যমে বিবর্তনীয় অভিযোজন ঘটে।”* এই তত্ত্ব শুধু একটি শারীরিক অভিযোজনের কারণ নয়, বরং অসংখ্য বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেয়। বিজ্ঞানীদের কাছে তত্ত্ব হলো বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি, যা সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত।

২. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নতুন নতুন অনুকল্প তৈরির ভিত্তি দেয়। যেমন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানীরা অনুকল্প করেছিলেন যে গ্যালাপাগোস দ্বীপের ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট খাদ্যের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। পরে পরীক্ষায় দেখা গেল, এটা সত্যি। তাদের গবেষণার ফলাফল এই অনুকল্পকে সমর্থন করেছে। একটি অনুকল্প কতটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়, তার উপর ভিত্তি করে একটি তত্ত্ব তৈরি হয়।

৩. একটি তত্ত্ব সাধারণত প্রচুর প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। বিশেষ করে, জীবের ক্ষুদ্র বিবর্তন (Microevolution)-এর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব বিপুল পরিমাণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। প্রতিদিনই আরও নতুন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যাতে প্রমাণিত হয় যে যেসব বৈশিষ্ট্য কোনো জীবের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে, সেগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে বেশি

পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অসংখ্য পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এবং বিশাল প্রমাণভাণ্ডার দ্বারা সমর্থিত।

৪. তত্ত্ব পরিবর্তনযোগ্য। নতুন গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা আগের তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না বা দেখা যায় যে পুরোনো তত্ত্ব ঠিক নয়, তবে বিজ্ঞানীরা সেই তত্ত্ব পরিবর্তন বা বাতিল করেন। যেমন, আগে ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়াকে একসঙ্গে "প্রোক্যারিয়ট" রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। পরে তাদের কোষ ও অণু বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, এই দুই গোষ্ঠী আসলে অনেক আলাদা । তাই তাদের এখন আলাদা ডোমেইন বা সাম্রাজ্যে রাখা হয়। বিজ্ঞানে “সত্য” কখনোই স্থায়ী নয়; এটি নির্ভর করে বর্তমান প্রমাণের উপর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রমাণ আসলে পুরোনো তত্ত্ব সংশোধিত বা প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

২.৫ বিজ্ঞান বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একে-অপরের সহযোগিতা থেকে লাভবান হয়।

সিনেমা বা কার্টুনে প্রায়ই বিজ্ঞানীদের একা, সাদা কোট পরে, গবেষণাগারে বা ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞান হলো একটি অত্যন্ত সামাজিক কার্যকলাপের ফল। অধিকাংশ বিজ্ঞানী দলগতভাবে কাজ করেন, যেখানে প্রায়ই স্নাতকোত্তর ও স্নাতক শিক্ষার্থীরা যুক্ত থাকে। বিজ্ঞানে সফল হতে হলে একজন ভালো লেখক বা বক্তা হওয়াও জরুরি। গবেষণার ফলাফল তখনই মূল্য পায় যখন তা বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহকর্মীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোনো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার আগে সহকর্মী বিজ্ঞানীদের দ্বারা “পিয়ার রিভিউ (Peer Review)” করা হয়। “পিয়ার রিভিউ” হলো একটি যাচাই প্রক্রিয়া যেখানে কোনো গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের আগে সেই ক্ষেত্রের অন্য বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা সেই প্রবন্ধ পড়ে দেখেন। তাঁরা খেয়াল করেন, গবেষণার ডেটা সঠিক কি না, পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ঠিকভাবে করা হয়েছে কি না, উপসংহার বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত কি না। যদি ভুল, দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা থাকে তবে তারা সংশোধনের পরামর্শ দেন। এইভাবে পিয়ার রিভিউ নিশ্চিত করে যে কেবল মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য গবেষণাই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের আলোচিত জীব বিজ্ঞানের সব পাঠগুলোই বিভিন্ন বিজ্ঞানীদ্বারা যাচাইকৃত, অর্থাৎ পিয়ার-রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সাময়িকী বা জার্নাল (Scientific Journal) হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশের একটি পত্রিকা বা ম্যাগাজিন। তবে এটি সাধারণ ম্যাগাজিনের মতো নয়। এখানে গবেষকদের নতুন আবিষ্কার, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতে সাধারণত পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই করা প্রবন্ধই ছাপা হয়। উদাহরণ: Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), The Lancet ইত্যাদি নামকরা বৈজ্ঞানিক জার্নাল।

বিজ্ঞান পূর্বসূরিদের কাজের ওপর ভিত্তি করে গড়া।

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন একবার বলেছিলেন: “প্রকৃতির সবকিছু ব্যাখ্যা করা কোনো একক ব্যক্তি বা এক যুগের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং নিশ্চিতভাবে সামান্য কিছু করা এবং বাকিটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ছেড়ে দেওয়া উত্তম। (To explain all nature is too difficult a task for any one man or even for any one age. ’Tis much better to do a little with certainty, and leave the rest for others that come after you.)” অর্থাৎ প্রকৃতির সব রহস্য একজন মানুষ বা এক প্রজন্মের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই আমাদের কাজ হলো কিছুটা এগোনো, বাকিটা পরের প্রজন্মকে করতে দেওয়া।

বিজ্ঞানীরা সবসময় আগের আবিষ্কার থেকে উপকৃত হন। যে কেউ বিজ্ঞানী হলে, যিনি প্রকৃতিকে বোঝার কৌতূহল দ্বারা চালিত হন, অবশ্যই তিনি আগের প্রজন্মের আবিষ্কার করা তথ্য ভাণ্ডার থেকে বিপুলভাবে

উপকৃত হন। যেমন, লুই পাস্তুর জীবাণু তত্ত্ব (Germ Theory) দিয়েছিলেন। সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে অনেক বিজ্ঞানী নতুন ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনও আগের ভাইরাস গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজে যেকোনো গবেষণার ফলাফল বারবার পরীক্ষা করা হয়, পর্যবেক্ষণ পুনরাবৃত্তি করা হয়, এমনকি একই পরীক্ষা আবার চালানো হয়। যদি অন্য গবেষকরা কোনো ফলাফল পুনরুৎপাদন করতে না পারেন অর্থাৎ একই ফল না পান, তবে তা মূল দাবির দুর্বলতা নির্দেশ করে, যা পরে সংশোধন করতে হয়। এই অর্থে বলা যায়, বিজ্ঞান নিজেই নিজেকে যাচাই করে। সৎভাবে ও পেশাগত মান বজায় রেখে ফলাফল প্রকাশ করা বিজ্ঞানচর্চার একটি মূলনীতি, কারণ পরীক্ষার ডেটার বিশ্বাসযোগ্যতাই ভবিষ্যতের গবেষণার ভিত্তি।

আদল বা মডেল জীব। (Model Organism)

অনেক সময় একাধিক বিজ্ঞানী একই গবেষণায় বা একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনোনিবেশ করেন। কেউ কেউ প্রথম আবিষ্কার করার চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেন, আবার অন্যরা একই সমস্যা নিয়ে একসঙ্গে কাজ করায় বেশি সন্তুষ্টি পান। বিজ্ঞানীদের এই সহযোগিতা সহজ হয় যখন সবাই একই ধরনের জীব ব্যবহার করে গবেষণা করেন। এদের অনেক সময় বলা হয় আদল জীব বা মডেল অর্গানিজম (Model Organism) **(চিত্র ২.৫.১)**। আদল জীবদের গবেষণাগারে বা ল্যাবে সহজে পালন করা যায় এবং এরা গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। যেহেতু সব জীবরা বিবর্তনীয়ভাবে সম্পর্কিত, তাই একটি আদল জীব অন্য প্রজাতি, এমনকি মানুষের শরীর ও রোগ বোঝার জন্যও কার্যকর হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফলের মাছি *Drosophila melanogaster*-এর উপর জেনেটিক গবেষণা থেকে আমরা অনেক জেনেটিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছি, যা মানুষসহ অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরও কিছু জনপ্রিয় আদল জীব হলো অ্যারাবিডোপসিস থালিয়ানা গাছ (*Arabidopsis thaliana*), মাটি কৃমি (*Caenorhabditis elegans*), অঞ্জু মাছ বা জেব্রাফিশ (Zebrafish, *Danio rerio*), ইঁদুর (*Mus musculus*) এবং এশেরিকিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়া (*Escherichia coli*)।

চিত্র ২.৫.১: কিছু সাধারণ প্রাণী ও উদ্ভিদের আদল বা মডেল জীবের উদাহরণ। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় আদল জীব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরীক্ষার জন্য বিস্তৃত পরিসরের আদল জীব ব্যবহার করা হয়।

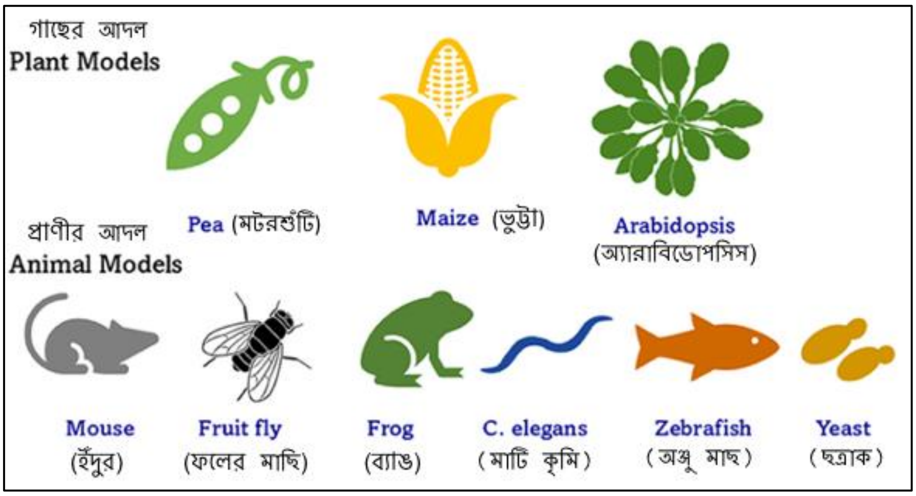

বৈজ্ঞানিক মডেল। (Scientific Model)

বিজ্ঞানে মডেলের আরেকটি মানে আছে। এই বৈজ্ঞানিক মডেল হলো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা বা বস্তুর একটি সরলীকৃত উপস্থাপনা যা সেটিকে ভালোভাবে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। এটি একটি ভৌত কাঠামো বা চিত্র, একটি গাণিতিক সূত্র, বা একটি ধারণাগত প্রক্রিয়া হতে পারে যা বাস্তব জগতের জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরে। যেমন, ডিএনএ-র দ্বিসুতা (Double Helix) গঠন আমরা সরাসরি দেখতে পাই না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এর একটি ত্রিমাত্রিক মডেল বানিয়েছেন। কোষে সিগন্যাল কিভাবে প্রবেশ করে ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এটি বোঝাতে পথচিত্র

(Pathway Model) ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জীববিজ্ঞানীরা নানা উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করেন। বংশগতিবিদ বা জেনেটিসিস্টরা (Geneticists) প্রোটিন নেটওয়ার্কের মডেল তৈরি করেন, যেগুলো জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় তারা অদৃশ্য জিন বা প্রোটিনের কাজ বোঝাতে কার্টুন বা চিত্র আঁকেন। জনসংখ্যা জীববিজ্ঞানীরা (Population Biologists) বিবর্তন কীভাবে ঘটে তার মডেল তৈরি করেন। কোষ জীববিজ্ঞানীরা (Cell Biologists) কোষে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পথ বা বাইরের সংকেত কীভাবে ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার মডেল তৈরি করেন। অন্যদিকে, নৈর্মিতিকবিদ বা স্ট্রাকচারাল জীববিজ্ঞানীরা (Structural Biologists) প্রোটিন ও কোষের বৃহৎ অণুগুলোর ত্রিমাত্রিক গঠন বা মডেল (3D Model) তৈরি করেন।

মডেল আমাদের জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সংগঠিতভাবে বোঝার সুযোগ দেয়। এগুলো একেবারে ক্ষুদ্র স্তরের বিশ্লেষণের বাইরে যেতে সহায়তা করে এবং আমাদের পুরো এবং প্রকৃত ধারণার দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং। বিভিন্ন গবেষণা থেকে আমরা প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলোর ছোট ছোট ধারণা পাই, কিন্তু মডেল দেখায় সেগুলো কীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। অনেক সময় এসব মডেল নতুন নতুন পরীক্ষা করার সুযোগও তৈরি করে, যেগুলো মডেলকে আরও উন্নত বা যাচাই করতে সাহায্য করে। আধুনিক সাংশ্রয়িক জীববিজ্ঞান বা সিস্টেমস বায়োলজি (Systems Biology)-তে এই মডেলিং ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন, ভ্রূণের বিকাশকালে জিন নিয়ন্ত্রণ নেটওয়ার্ক বোঝা কিংবা এমনকি একটি সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া কোষের মডেল তৈরির করা।

বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান।

জীববিজ্ঞানীরা প্রকৃতির আকর্ষণীয় প্রশ্নগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধান করেন। কেউ বাস্তুতন্ত্রের দিকে মনোযোগ দেন, আবার কেউ জীব বা কোষীয় স্তরে কাজ করেন। বিজ্ঞানে একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দিক থেকে বা বিষয় দিয়ে সমাধান করা যায়, যা একে অপরকে পরিপূরক করে। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ থেকে চিকিৎসা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভাইরোলজিস্টরা (Virologist) প্রথমে ভাইরাসটি চিহ্নিত করেন এবং এর জিনগত তথ্য বা RNA সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন এটি একটি নতুন করোনা ভাইরাস (SARS-CoV-2)। আণবিক বা মলিকিউলার জীববিজ্ঞানীরা (Molecular Biologist) খুঁজে বের করেন ভাইরাস কীভাবে মানুষের কোষে প্রবেশ করে এবং কোন প্রোটিন ব্যবহার করে বংশবৃদ্ধি করে। জেনেটিসিস্টরা (Geneticist) ভাইরাসের মিউটেশন ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট ট্র্যাক করে শনাক্ত করেন। এদিকে মহামারী বিশেষজ্ঞ বা এপিডেমিওলজিস্টরা (Epidemiologist) গবেষণা করেন ভাইরাস কীভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং কোন এলাকায় সংক্রমণ বেশি হচ্ছে। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ বা অনাক্রম্য বিদরা (Immunologist, ইমিউনোলজিস্ট) মানুষের দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করেন এবং ভ্যাকসিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেন। চিকিৎসক (Physician) ও মেডিকেল গবেষকরা (Medical Researcher/Physician Scientist) রোগীদের চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। ভ্যাকসিন বিজ্ঞানী ও ঔষধবিদ বা ফার্মাসিউটিক্যাল (Pharmaceutical) বিশেষজ্ঞরা দ্রুত কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য (Public Health) বিশেষজ্ঞরা মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব ও কোয়ারেন্টাইনের মতো নীতি নির্ধারণ করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখেন। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে কাজ করে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন। একজন জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য থাকবে বিভিন্ন স্তরের জীববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা। আর এই দক্ষতা অর্জন করতে পারলে জীব বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝা যাবে, জীববিদ্যা আরও উপভোগ্য

হবে এবং ভবিষ্যৎ জীব বিজ্ঞানী হিসেবে নিজের ভিত্তি তৈরি হবে।

২.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ। (Science, Technology, and Society)

বিজ্ঞানী সমাজ আসলে আমাদের বড় সমাজেরই অংশ। প্রযুক্তিকে এতে যোগ করলে বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্ক আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন চিকিৎসা, কৃষি বা অপরাধ তদন্তে ডিএনএ প্রযুক্তি (DNA Technology) ব্যবহার করা হয়। ওয়াটসন আর ক্রিক হয়তো ভেবেছিলেন তাঁদের ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার একদিন কাজে লাগবে, কিন্তু ঠিক কোন কোন কাজে লাগবে, তা আগে থেকে বলা সম্ভব ছিল না। ওয়াটসন ও ক্রিক হলেন জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক (James Watson and Francis Crick), যাঁরা **১৯৫৩** সালে ডিএনএ-র দ্বি-সর্পিল বা ডাবল হেলিক্স গঠন আবিষ্কার করেন, যা জীবের বংশগতীয় তথ্য বহন করে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাঁদেরকে **১৯৬২** সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, যা আণবিক জীববিজ্ঞান ও জিনতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

প্রযুক্তি (Technology) কোন পথে এগোবে, তা শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ওপর নির্ভর করে না। মানুষের চাহিদা, সময়ের অবস্থা আর সমাজের পরিবেশও এতে বড় ভূমিকা রাখে। তাই প্রযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন হয় সাধারণতঃ "আমরা এটা করতে পারি কি না" নয়, বরং "আমাদের এটা করা উচিত কি না।" উদাহরণস্বরূপ, কোন পরিস্থিতিতে ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বংশগত রোগের জিন আছে কি না তা জানা গ্রহণযোগ্য? এই ধরনের পরীক্ষা কি সর্বদা স্বেচ্ছায় হওয়া উচিত, নাকি কখনও কখনও বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন? বীমা কোম্পানি বা নিয়োগকর্তারা কি এই তথ্য পেতে পারেন, যেমন তাঁরা অনেক অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যতথ্য পেয়ে থাকেন? ব্যক্তিগত জিনোমের সিকোয়েন্সিং দ্রুত এবং সাশ্রয়ী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নগুলো আরও জরুরি হয়ে উঠছে।

এ ধরনের প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত নৈতিক সমস্যা কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে নয়, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। সব নাগরিকের, শুধু পেশাদার বিজ্ঞানীদের নয়, দায়িত্ব রয়েছে বিজ্ঞানের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া এবং প্রযুক্তির সম্ভাব্য সুফল ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকার। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সমাজের এই সম্পর্কই যেকোনো জীববিজ্ঞান পাঠকে আরও অর্থবহ ও মূল্যবান করে তোলে।

বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার উপাধি বা ডিগ্রিসমূহ।

বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কয়েক ধাপে ডিগ্রি (Degree) সম্পন্ন করে থাকে, যা শত শত বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস থেকে গড়ে উঠেছে। প্রথম ধাপ হলো স্নাতক ডিগ্রি বা **বিএসসি** (Bachelor of Science, ব্যাচেলর অব সায়েন্স, BS, BSc, SB, অথবা ScB; ল্যাটিন *scientiae baccalaureus* থেকে যার উৎপত্তি), যার মেয়াদ সাধারণত তিন থেকে চার বছর। এখানে কোষবিদ্যা, জেনেটিক্স, বাস্তুবিদ্যা, অণুজীববিদ্যা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় শেখানো হয়। এর পরের ধাপ হলো **এমএসসি** (Master of Science) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, যা সাধারণত এক বা দুই বছরের হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট শাখায় বিশেষায়িত জ্ঞান ও গবেষণা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিছু দেশে **এমফিল** (Master of Philosophy, মাস্টার অফ ফিলোসফি) নামক একটি গবেষণামুখী ডিগ্রি দেওয়া হয়, যা মাস্টার্স ও পিএইচডির মাঝামাঝি এবং অনেক সময় পিএইচডির প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত (Terminal) গবেষণা ডিগ্রি হলো **পিএইচডি** (Doctor of Philosophy, ডক্টর অফ ফিলোসফি), যার মেয়াদ প্রায় তিন থেকে ছয় বছর। এখানে শিক্ষার্থীরা মৌলিক গবেষণা করে এবং নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। এই ডিগ্রি অর্জনের জন্য সাধারণত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা থিসিস (Thesis) জমা দিতে হয় এবং এটি মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের

জন্য, যারা শিক্ষাদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে কাজ করতে চান।

ঐতিহাসিকভাবে, বিজ্ঞানের এই ডিগ্রিগুলোর শুরু মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, যেখানে প্রথমে শুধু ধর্মতত্ত্ব, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানো হতো। সেই সময় "ব্যাচেলর", "মাস্টার" ও "ডক্টর" শব্দগুলো আলাদা আলাদা শিক্ষাগত স্তর বোঝাত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিকশিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান যুক্ত হয়। উনবিংশ শতকে জার্মান গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল পিএইচডিকে মূল গবেষণা ডিগ্রি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং জীববিজ্ঞান ধীরে ধীরে বোটানি, প্রাণিবিজ্ঞান, জেনেটিক্স ও অণুজীববিদ্যা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়। বর্তমানে **বিএসসি → এমএসসি → (এমফিল) → পিএইচডি** হলো জীববিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী হওয়ার আন্তর্জাতিক মানের ধাপ।

ডক্টর অব ফিলসফির উৎপত্তিঃ "ডক্টর" শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ "শিক্ষক" বা "অধ্যাপক।" **ডক্টরেট (Doctoratus)** প্রথম মধ্যযুগীয় ইউরোপে দেখা যায়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন ভাষা শেখানোর আনুষ্ঠানিক অনুমতি (*licentia docendi*) বোঝাত। ইসলামী মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত **ইজাজাহ (Ijazah)** পদ্ধতিই পরবর্তীতে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির ভিত্তি তৈরি করে। ইজাজাহ (Ijazah, আরবি: الإجازة, অর্থ "অনুমতি", "স্বীকৃতি" বা "লাইসেন্স") হলো এক প্রকারের লাইসেন্স বা সনদ, যা কাউকে কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের অনুমতি দেয়। এটি সাধারণত এমন ব্যক্তির দ্বারা প্রদান করা হয়, যিনি নিজে আগে থেকেই এই অনুমতির অধিকারী। ইজাজাহ মূলত ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞানের প্রেরণ বা শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে, ইজাজাহ পাওয়ার অর্থ হলো ছাত্র সরাসরি শিক্ষক বা প্রদানকারীর কাছ থেকে মৌখিকভাবে এই জ্ঞান অর্জন করেছে।

ডক্টর অব ফিলসফি (PhD) ডিগ্রিটি প্রথম জার্মানিতে ১৭শ শতকে (প্রায় ১৬৫২ সালে) দেয়া হয়। এখানে "ফিলসফি" শব্দটি বর্তমান অর্থে কেবল দর্শন বিষয়কে বোঝায় না; বরং এটি এর প্রাচীন গ্রিক অর্থ "প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা (Love of Wisdom)" বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপের বেশিরভাগ জায়গায় ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শন (বর্তমানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) সবগুলো ক্ষেত্রকে একসাথে ফিলসফি (Philosophy) বলা হতো। জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে লিবারেল আর্টসের মৌলিক অনুষদকে বলা হতো "ফ্যাকাল্টি অফ ফিলসফি (Faculty of Philosophy)।" **লিবারেল আর্টস** (Liberal Arts) হলো একটি বিস্তৃত শিক্ষা পদ্ধতি যা মানবিক, সামাজিক, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত করে শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়ে একটি মৌলিক ও সমন্বিত জ্ঞান তৈরি করা হয়, যা মানুষকে সমাজের একজন মুক্ত ও বহু-দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

যদিও ফিলসফির ঐতিহাসিক মানে বজায় রেখেই **ডক্টরেট অব ফিলসফি (পিএইচডি)** নামক ডিগ্রি চালু হয়, বর্তমানে এর অধিকাংশ ডিগ্রি দর্শনের জন্য নয়, বরং অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রদান করা হয়। পিএইচডি একটি গবেষণা-ভিত্তিক ডিগ্রি, যেখানে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে একটি নতুন থিসিস (Thesis) তৈরি ও জমা দিতে হয়। থিসিস হলো একটি বিস্তারিত গবেষণাপত্র যা একজন গবেষক তার ডক্টরাল ডিগ্রি (Doctoral Degree, PhD) অর্জনের জন্য লিখে থাকেন। এতে তিনি কয়েক বছরের গবেষণার ফলাফল, বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক কাঠামো, পদ্ধতি (Methodology) এবং নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবদান উপস্থাপন করেন। থিসিসকে মূলত সেই প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় যে গবেষক স্বতন্ত্রভাবে নতুন গবেষণা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষক তার থিসিস জমা দেওয়ার পর একটি পরীক্ষক দল বা প্যানেলের (Supervisor, Internal Examiner, External

Examiner) সামনে মৌখিকভাবে তার গবেষণা ব্যাখ্যা করেন, যাকে বলা হয় পিএইচডি ডিফেন্স (PhD Defense)। এটি একটি সর্বজনীন মৌখিক পরীক্ষা, যেখানে পরীক্ষকরা গবেষককে বিভিন্ন প্রশ্ন করেনঃ গবেষণার উদ্দেশ্য, ফলাফলের বিশ্লেষণ, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নিয়ে। ডিফেন্স সফলভাবে সম্পন্ন হলে গবেষককে পিএইচডি (PhD) ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

চিত্র ২.৬.১: একজন গবেষক তার পিএইচডি থিসিস উপস্থাপন করছে।

বিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন মতের গুরুত্ব।

মানবসমাজে যেসব প্রযুক্তিগত আবিষ্কার গভীর প্রভাব ফেলেছে, তার অনেকগুলোই জন্ম নিয়েছে বাণিজ্যপথের পাশে গড়ে ওঠা শহর বা বসতিতে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মিলন নতুন নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিন্টিং প্রেস বা ছাপাখানা, যা ১৪৪০ সালের দিকে জার্মান উদ্ভাবক জোহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg) তৈরি করেছিলেন। এই আবিষ্কারে চীনের বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনের অবদান ছিল, যেমন কাগজ ও কালি। কাগজ প্রথমে চীন থেকে বাণিজ্যপথে বাগদাদে পৌঁছায়, যেখানে এর ব্যাপক উৎপাদন প্রযুক্তি বিকশিত হয়। পরে এই প্রযুক্তি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে, চীনের পানি-ভিত্তিক কালি গুটেনবার্গ পরিবর্তন করে তেল-ভিত্তিক কালি বানান। বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফলেই প্রিন্টিং প্রেস তৈরি হয়েছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ঠিক তেমনভাবেই, বিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গির গবেষকরা কাজ করলে তা বিজ্ঞানের জন্য বড় উপকার বয়ে আনে। তবে প্রশ্ন হলো, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিগত পরিচয় বা অন্যান্য দিক থেকে বিজ্ঞানীরা আসলে কতটা বৈচিত্র্যময়? বৈজ্ঞানিক সমাজ মূলত তার আশেপাশের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচরণের প্রতিফলন। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বহু বছর ধরে নারী, বর্ণভিত্তিক সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অবহেলিত গোষ্ঠী পেশাদার বিজ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। গত ৫০ বছরে পেশা নির্বাচনের বিষয়ে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের ফলে জীববিজ্ঞানসহ কিছু ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। বর্তমানে জীববিজ্ঞানে স্নাতক ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই নারী। তবে উচ্চ পর্যায়ে এই অগ্রগতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে। এখনও বিজ্ঞানের অনেক শাখা ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে নারী এবং বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের অভাব বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ, যত বেশি ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর আলোচনায় অংশ নেয়, তত বেশি সমৃদ্ধ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা। ভিন্ন মত আর বৈচিত্র্য বিজ্ঞানের অধ্যয়নকে করে তোলে রোমাঞ্চকর এবং আনন্দময়।

অনুশীলনী ২

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। জীববিজ্ঞানীরা যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেন, তা তুলনা করো।

২। কীভাবে একটি অনুকল্প (Hypothesis) তৈরি করতে হয় এবং তা পরীক্ষা করতে হয়, তা দেখাও।

৩। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Scientific Theory) কীভাবে একটি অনুকল্প থেকে ভিন্ন?

৪। বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলো না পড়ে কি জীববিজ্ঞান পড়া সম্ভব? ব্যাখ্যা করো।

৫। জীবাণু-সংক্রান্ত অনুকল্প (Germ Hypothesis) পরীক্ষা করতে পাস্তুরের পরীক্ষার তাৎপর্য কী?

৬। বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক তথ্য খুঁজতে অনলাইন ডাটাবেস ব্যবহার করেন, যেমন PubMed, যা একটি বিনামূল্যের ডেটাবেস এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন (NCBI, National Center for Biotechnology Information) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। PubMed ব্যবহার করে ডঃ মাকসুদুল আলম-এর ২০০৯ বা তার পরের কোনো একটি প্রকাশিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ খুঁজে বের করো। ডঃ মাকসুদুল আলম (Maqsudul Alam, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ – ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪) ছিলেন একজন বাংলাদেশি আমেরিকান বিজ্ঞানী। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সফলভাবে পাটের জিনোমের সিকোয়েন্সিং উন্মোচিত করা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জিনোম উন্মোচনের ঘোষণা দেন, যা দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে স্থান করে নেয় যারা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফসলের পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র ২.২: ড. মাকসুদুল আলম ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত বাংলাদেশী অনুজীববিজ্ঞানী ও জিনতত্ত্ববিদ (Geneticist), যিনি মূলত পাটের জিন নকশা (Genome Sequence) আবিষ্কারের জন্য বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Hawaii) অনুজীববিজ্ঞান (মাইক্রোবায়োলজি, Microbiology) বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং জীবনের বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং (জিন নকশা উন্মোচন) প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন।

৭। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

৮। আরোহী (Inductive) এবং অবরোহী (Deductive) যুক্তির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

৯। প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) তত্ত্বকে কেন "তত্ত্ব (Theory)" বলা হয়?

অধ্যায় ৩

জীবনের রাসায়নিক প্রেক্ষাপট।
(The Chemical Context of Life)

এই অধ্যায়ের মূল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

৩.১ পদার্থ (Matter)।

৩.২ মৌলের গুণাবলি ও পরমাণুর গঠন।

৩.৩ রাসায়নিক বন্ধন ও যৌগ গঠন।

৩.৪ রাসায়নিক বিক্রিয়া। (Chemical Reactions)

চিত্র ৩.১: কাঠ পিঁপড়া (*Formica rufa*) রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে শত্রু প্রতিহত করে। যখন কাঠ পিঁপড়া উপরের দিক থেকে কোনো বিপদের মুখে পড়ে, তখন তারা তাদের পেট বা উদর (Abdomen) থেকে ফর্মিক অ্যাসিড (Formic Acid) ছুঁড়ে দেয়। এই অ্যাসিডের ফোঁটা বাতাসে ছিটকে উঠে এবং সম্ভাব্য শিকারী, যেমন ক্ষুধার্ত পাখিদের চোখ ও শরীরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে, ফলে তারা দূরে সরে যায়।

ফর্মিক অ্যাসিড (Formic Acid)—এর মতো একটি যৌগের বৈশিষ্ট্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?

যৌগ (Compound) হলো পরমাণুগুলোর মধ্যে বন্ধন (Bond) দ্বারা গঠিত পদার্থ।
ফর্মিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সূত্র হলো CH_2O_2, অর্থাৎ এটি তৈরি হয়েছে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) দ্বারা।

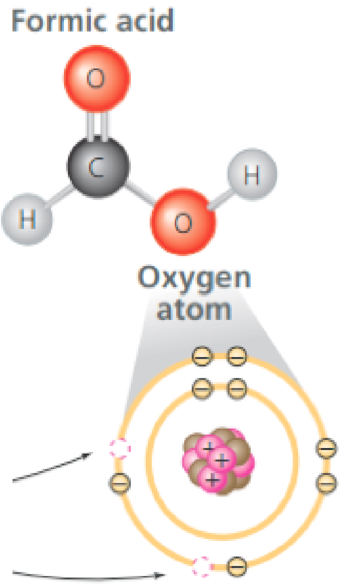

একটি পরমাণুর **প্রোটনের সংখ্যা (Proton Number)** নির্ধারণ করে সেটি কোন মৌল। যেমন, অক্সিজেন পরমাণুতে ৮টি প্রোটন থাকে, তাই এটি অক্সিজেন মৌল।

একটি পরমাণুর **ইলেকট্রন বিন্যাস (Electron Distribution)** নির্ধারণ করে সেটি কীভাবে বন্ধন গঠন করতে পারবে। অক্সিজেনের ২টি ইলেকট্রনের জায়গা খালি থাকে, তাই এটি দুটি বন্ধন তৈরি করতে পারে।

যৌগের বৈশিষ্ট্য (Compound Properties) নির্ভর করে এর পরমাণুগুলোর প্রকৃতি এবং তারা কীভাবে যুক্ত হয়েছে তার ওপর।

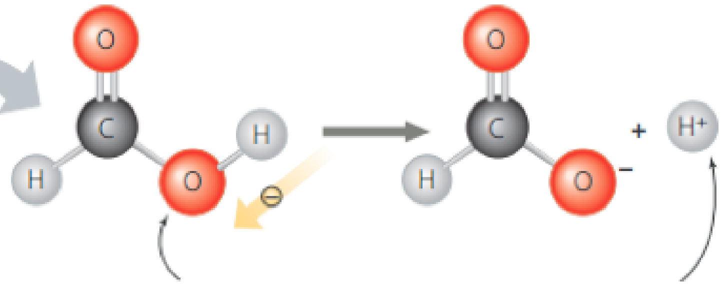

ফর্মিক অ্যাসিডে, অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে, ফলে H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন) মুক্ত হয়। এই কারণেই ফর্মিক অ্যাসিড একটি অম্লীয় (Acidic) যৌগ, যা জ্বালা বা পোড়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন বছর আগে, একটি বিশাল বিস্ফোরণ সম্ভবত মহাবিশ্বের সূচনা ঘটায়। এই বিস্ফোরণের পর শুরু হয় তারা ও গ্রহের সৃষ্টি প্রক্রিয়া, যা পরবর্তীতে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর গঠনের দিকে নিয়ে যায়। ধারণা করা হয় প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে বৈচিত্র্য লাভ করে। জীবনের প্রকৃতি বোঝার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে পদার্থের প্রকৃতি, কারণ জীবন গঠিত হয়েছে এই পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলো দিয়ে। মানব সভ্যতার প্রাথমিক কৌতূহলগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই প্রশ্নঃ "পৃথিবী আসলে কী দিয়ে তৈরি?" প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বড় জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিস দ্বারা গঠিত হতে পারে। এই ধারণা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত হয়, যখন পদার্থবিদরা মৌলিক পদার্থ, অণু, পরমাণু ভাঙার চেষ্টা শুরু করেন। সেই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক গবেষণায়, আমরা দেখতে পাই যে অণু-পরমাণু জগতের চিত্র আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবন্ত ব্যবস্থাগুলো কীভাবে গঠিত, তা বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে — পরমাণুর গঠন, কীভাবে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে পরমাণুগুলো যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করে, এবং কীভাবে ছোট অণুগুলো যুক্ত হয়ে বড় অণু তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত কোষ এবং তারপর জীবের গঠন সৃষ্টি করে। অতএব, পৃথিবীতে জীববিজ্ঞানের অধ্যয়ন শুরু হয় পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান দিয়ে। অনেকের জন্য এই অধ্যায়টি আগের শেখা পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোর একটি পুনরালোচনা হিসেবে কাজ করবে।

৩.১ পদার্থ গঠিত হয় বিশুদ্ধ রাসায়নিক মৌল এবং যৌগ দ্বারা।

সব জীবন্ত জীব **পদার্থ (Matter)** দিয়ে গঠিত। পদার্থ হলো যেকোনো কিছু যা স্থান দখল করে এবং যার **ভর (Mass)** আছে। পদার্থ বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান, যেমনঃ পাথর, ধাতু, তেল, গ্যাস, এবং জীবন্ত প্রাণী (Living organism)। প্রকৃতিতে অসীম বৈচিত্র্যের বিভিন্ন পদার্থ দেখা যায়।

মৌল ও যৌগ (Elements and Compounds)।

পদার্থ গঠিত হয় **রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ বা মৌল (Chemical Elements)** দ্বারা। একটি **মৌল (Element)** হলো এমন এক পদার্থ যা **রা**সায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরও ছোট পদার্থে বিভক্ত করা যায় না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে **৯২টি মৌল** সনাক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ: সোনা (Gold), তামা (Copper), কার্বন (Carbon), এবং অক্সিজেন (Oxygen)। প্রতিটি মৌলের একটি **প্রতীক (Symbol)** থাকে, সাধারণত তার নামের প্রথম একটি বা দুটি অক্ষর দিয়ে। কিছু প্রতীক ল্যাটিন বা জার্মান শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, যেমনঃ সোডিয়ামের প্রতীক Na, যা এসেছে ল্যাটিন শব্দ *Natrium* থেকে।

একটি **যৌগিক পদার্থ বা যৌগ (Compound)** হলো এমন এক পদার্থ যা দুটি বা ততোধিক ভিন্ন মৌল নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, টেবিল লবণ ($NaCl$) হলো একটি যৌগ, যা সোডিয়াম (Na) এবং ক্লোরিন (Cl) মৌল দ্বারা **১:১** অনুপাতে গঠিত। বিশুদ্ধ সোডিয়াম একটি ধাতু, আর বিশুদ্ধ ক্লোরিন একটি বিষাক্ত গ্যাস; কিন্তু রাসায়নিকভাবে যুক্ত হলে তারা খাবারযোগ্য লবণ তৈরি করে।আরেকটি উদাহরণ হলো পানি (H_2O), যা হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) দ্বারা ২:১ অনুপাতে গঠিত। এই ধরনের যৌগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলোঃ যৌগের গুণাগুণ তার উপাদান মৌলগুলোর গুণাগুণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন **(চিত্র ৩.১.১)**।

চিত্র ৩.১.১: একটি যৌগের উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent properties)। ধাতু সোডিয়াম (Sodium) যখন বিষাক্ত গ্যাস ক্লোরিন (Chlorine)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তারা একসঙ্গে গঠন করে খাদ্যযোগ্য যৌগ সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride), যা আমরা টেবিল লবণ নামে চিনি। এটি দেখায় যে, যৌগের

বৈশিষ্ট্য তার মৌল উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।

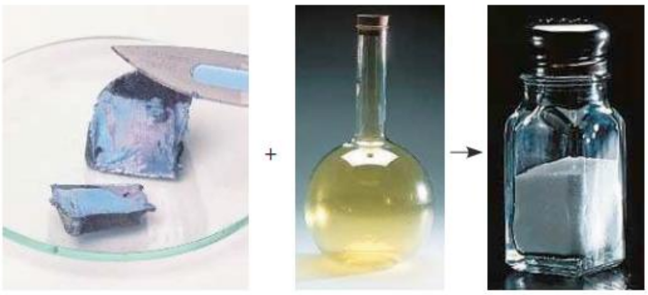

জীবনের মৌলসমূহ (The Elements of Life)।

প্রকৃতির ৯২টি মৌলের মধ্যে মাত্র ২০–২৫% মৌল জীবের জীবনধারণ ও প্রজননের জন্য অপরিহার্য (Essential Elements) **(তালিকা ৩.১.২)**। যদিও জীবের মধ্যে এই মৌলগুলো মোটামুটি একই, তবু কিছু পার্থক্য আছে। মানুষের জন্য ২৫টি মৌল প্রয়োজন, কিন্তু উদ্ভিদের জন্য মাত্র ১৭টি। চারটি মৌল — অক্সিজেন (O), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), এবং নাইট্রোজেন (N) — মিলে জীবন্ত পদার্থের প্রায় ৯৬% গঠন করে। বাকি প্রায় ৪% ভর আসে অন্যান্য মৌল থেকে, যেমন, ক্যালসিয়াম (Ca), ফসফরাস (P), পটাসিয়াম (K), সালফার (S) ইত্যাদি।

মাইক্রো বা ট্রেস মৌল (Micro/Trace Elements) হলো সেই মৌল, যেগুলো জীবে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু অপরিহার্য। যেমন, লোহা (Fe) সব জীবের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু কিছু মৌল কেবল নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, কশেরুকী প্রাণীর (vertebrates) জন্য আয়োডিন (I) একটি অপরিহার্য মৌল, যা থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন মাত্র ০.১৫ মিলিগ্রাম আয়োডিন গ্রহণ মানব থাইরয়েডের স্বাভাবিক কাজের জন্য যথেষ্ট। আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়, যা গয়টার (Goiter) নামে পরিচিত। সামুদ্রিক খাদ্য বা আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

তালিকা ৩.১.২: মানব দেহে বিদ্যমান মৌলসমূহ।

মৌল	প্রতীক	শরীরের ভরের শতকরা হার (পানি-সহ)
অক্সিজেন	O	৬৫.০%
কার্বন	C	১৮.৫%
হাইড্রোজেন	H	৯.৫%
নাইট্রোজেন	N	৩.৩%
ক্যালসিয়াম	Ca	১.৫%
ফসফরাস	P	১.০%
পটাসিয়াম	K	০.৪%
সালফার	S	০.৩%
সোডিয়াম	Na	০.২%
ক্লোরিন	Cl	০.২%
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	০.১%

মোট:

- **প্রধান ৪টি মৌল (O, C, H, N)** মিলে শরীরের প্রায় **৯৬.৩% ভর** গঠন করে।
- **অন্য মৌলগুলো** মিলে বাকি **৩.৭% ভর** তৈরি করে।

ট্রেস মৌল (অত্যন্ত অল্প পরিমাণে উপস্থিত, ০.০১% এরও কম): বোরন (B), ক্রোমিয়াম (Cr), কোবাল্ট (Co), কপার (Cu), ফ্লোরিন (F), আয়োডিন (I), লোহা (Fe), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), মলিবডেনাম (Mo), সেলেনিয়াম (Se), সিলিকন (Si), টিন (Sn), ভ্যানাডিয়াম (V), জিঙ্ক (Zn)।

এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, মানব দেহের গঠন মূলত কয়েকটি প্রধান মৌলের উপর নির্ভরশীল, তবে অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত ট্রেস মৌলগুলোও দেহের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কিছু প্রাকৃতিক মৌল জীবের জন্য বিষাক্ত (Toxic)। উদাহরণস্বরূপ, আর্সেনিক (Arsenic) মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং অনেক রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বের কিছু অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়, ভূগর্ভস্থ জলে প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক মিশে থাকে। ফলে কূপের পানি ব্যবহার করার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা কমানোর প্রচেষ্টা চলমান আছে।

প্রকৃতিতে কিছু জীব পাওয়া যায় যারা বিষাক্ত মৌলসমৃদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে। তারা এমন পরিবেশে **অভিযোজিত** (Adapted) হয়েছে, যেখানে সাধারণত **বিষাক্ত মৌল** (Toxic Elements) উপস্থিত থাকে। এর একটি উদাহরণ হলো সার্পেন্টাইন (Serpentine) মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ সম্প্রদায়। সার্পেন্টাইন হলো এমন একটি বিরল ধরনের মাটি, শিলা বা খনিজ পদার্থ, যা সাধারণত ক্রোমিয়াম (Chromium), নিকেল (Nickel), এবং কোবাল্ট (Cobalt) এর উচ্চমাত্রা ধারণ করে। বেশিরভাগ গাছপালা এই ধরনের সার্পেন্টাইন মাটিতে বাঁচতে পারে না, কারণ সেখানে এই মৌলগুলো বিষাক্ত মাত্রায় উপস্থিত। তবে কিছু বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ এমন পরিবেশে টিকে থাকার মতো অভিযোজন (Adaptations) করেছে **(চিত্র ৩.১.৩)**। ধারণা করা হয়, এই উদ্ভিদগুলো মূলত অবিষাক্ত মাটিতে জন্মানো প্রাচীন প্রজাতির রূপান্তরিত রূপ, যারা ক্রমাগত প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্পেন্টাইন মাটিতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সার্পেন্টাইন মাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে যে বিশিষ্ট উদ্ভিদ সম্প্রদায় (Distinctive Plant Community) দেখি, তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলাফল। সার্পেন্টাইন-অভিযোজিত উদ্ভিদ গবেষকদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়, কারণ এগুলো অধ্যয়ন করে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তনীয় অভিযোজন (Evolutionary Adaptation) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

চিত্র ৩.১.৩: সার্পেন্টাইন মাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর উদ্ভিদ সম্প্রদায়। এই গাছগুলো সার্পেন্টাইন মাটিতে জন্মে, যেখানে এমন মৌল থাকে যা সাধারণত উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত। চিত্রের অন্তর্নিবিষ্ট (Inset) অংশে দেখানো হয়েছে সার্পেন্টাইন শিলা ও একটি বিশেষ উদ্ভিদ টিবুরন ম্যারিপোসা লিলি (*Calochortus tiburonensis*)। এই প্রজাতিটি শুধু আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের টিবুরন উপদ্বীপের একটি পাহাড়ে পাওয়া যায় এবং এটি এই পরিবেশের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত।

৩.২ একটি মৌলের গুণাবলি নির্ভর করে তার পরমাণুর গঠনের উপর।

প্রতিটি **মৌল** (Element) একই ধরনের **পরমাণু** (Atom) দিয়ে তৈরি, যা অন্য মৌলের পরমাণুর থেকে ভিন্ন।

পরমাণু হলো পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক, যা এখনো সেই মৌলের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে। পরমাণু এতই ছোট যে, প্রায় এক মিলিয়ন (১০ লক্ষ) পরমাণু একসাথে রাখলে কেবল এই বাক্যের একটি দাড়ির সমান দৈর্ঘ্য পূর্ণ হবে। আমরা পরমাণু বোঝাতে সেই একই প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করি যা সংশ্লিষ্ট মৌলের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, C প্রতীকটি বোঝায় কার্বন মৌল এবং একই সঙ্গে একটি কার্বন পরমাণুকেও।

অতিপারমাণবিক কণা (Subatomic Particles)।

যদিও পরমাণু কোনো মৌলের ক্ষুদ্রতম একক, একটি পরমাণুকে আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়, যেগুলোকে বলে **অতিপারমাণবিক কণা (Subatomic Particles)**। বিজ্ঞানীরা উচ্চ শক্তির সংঘর্ষ (High-Energy Collisions) ব্যবহার করে পরমাণু থেকে ১০০-রও বেশি প্রকারের কণা শনাক্ত করেছেন। উচ্চ-শক্তির সংঘর্ষ (High-Energy Collisions) হলো অত্যন্ত শক্তিশালী বিক্রিয়া, যেখানে সাধারণত পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা অতিপারমাণবিক কণা প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই সংঘর্ষে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা ও ঘনত্ব সৃষ্টি হয়, যা বিজ্ঞানীদের পদার্থের সবচেয়ে মৌলিক বা গভীর স্তর সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা মূলত তিনটি অতিপারমাণবিক কণাকে গুরুত্ব দিই:

১) **প্রোটন** (Proton)
২) **নিউট্রন** (Neutron)
৩) **ইলেকট্রন** (Electron)

প্রোটন এবং ইলেকট্রন বৈদ্যুতিকভাবে চার্জযুক্ত (Charged) কণা। **চার্জ** (Charge) হলো পদার্থের একটি অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই চার্জের কারণে অতিপারমাণবিক কণিকাগুলো একে অপরের কাছে এলে এক ধরনের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ (টান বা ঠেলা) বল অনুভব করে। যদি কোনো বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রন বেশি থাকে, তবে সেটি নেতিবাচক (Negative) চার্জযুক্ত হয়। আর যদি প্রোটন বেশি থাকে, তবে সেটি ধনাত্মক (Positive) চার্জযুক্ত হয়। বৈদ্যুতিক চার্জের একক হলো **কুলম্ব** (C)। একটি ইলেকট্রনের চার্জ প্রায় -১.৬০২×১০^{-১৯} কুলম্ব।

- প্রতিটি প্রোটনের ধনাত্মক (+১) চার্জ থাকে।
- প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক (–১) চার্জ থাকে।
- আর নিউট্রন কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করে না; এটি নিরপেক্ষ (Neutral)।

প্রোটন এবং নিউট্রন একত্রে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা ঘন অংশে (Atomic Nucleus) অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটনের কারণে এটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়। ইলেকট্রনগুলো দ্রুতগতিতে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরে একটি ঋণাত্মক চার্জের মেঘ (Electron Cloud) তৈরি করে। বিপরীত চার্জের আকর্ষণ শক্তি (Electrostatic Attraction) ইলেকট্রনগুলোকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি রাখে। চিত্র ৩.২.১–এ হিলিয়াম (Helium) পরমাণুর দুটি সাধারণ মডেল দেখানো হয়েছে।

পরমাণুর ভর ও ডালটন একক (Mass of Atoms and the Dalton Unit)।

প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, প্রতিটির ভর প্রায় ১.৭×১০^{-২৪} গ্রাম (g)। তবে এই পরিমাণ এত

ক্ষুদ্র যে গ্রাম বা কিলোগ্রামের মতো সাধারণ একক এখানে কার্যকর নয়। তাই, পরমাণু, অতিপারমাণবিক কণা এবং অণু (Molecule)-এর ভর মাপতে বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ একক ব্যবহার করেন, যার নাম ডালটন (Dalton) — এটি জন ডালটন (John Dalton)-এর নামে রাখা হয়েছে, যিনি ১৮০০ সালের দিকে পরমাণু তত্ত্ব (Atomic Theory) প্রণয়ন করেন।

চিত্র ৩.২.১: হিলিয়াম (He) পরমাণুর সরল মডেল। হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ২টি নিউট্রন (বাদামী) এবং ২টি প্রোটন (গোলাপি)। ২টি ইলেকট্রন (হলুদ) নিউক্লিয়াসের বাইরে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে। এই মডেলগুলো আসল আকার অনুযায়ী নয় (Not to scale), এগুলোতে নিউক্লিয়াসের আকার ইলেকট্রন মেঘের তুলনায় অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে।

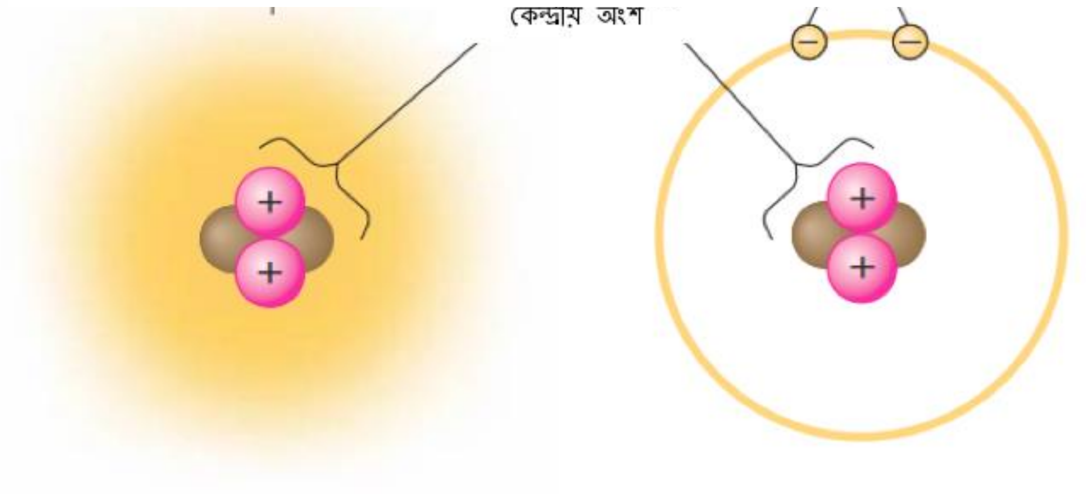

(ক) এই মডেলটি দুটি ইলেকট্রনকে নেতিবাচক চার্জের একটি মেঘ হিসেবে দেখায়, যা নিউক্লিয়াসের চারপাশে তাদের চলাচলের ফলে সৃষ্টি হয়।

(খ) আরও সরল মডেলে, ইলেকট্রনগুলোকে দুটি ছোট হলুদ গোলক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটি বৃত্ত বরাবর ঘুরছে।

১ ডালটন (Da) = ১ পারমাণবিক ভর একক (atomic mass unit, amu)

- প্রোটন ও নিউট্রনের ভর ≈ ১ ডালটন
- ইলেকট্রনের ভর ≈ প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের ১/২০০০ অংশ
  তাই পরমাণুর মোট ভর নির্ণয়ের সময় ইলেকট্রনের ভর প্রায় উপেক্ষা করা হয়।

পরমাণু সংখ্যা এবং পরমাণু ভর (Atomic Number and Atomic Mass)।

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলোর মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ বিভিন্ন পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় তাদের অতিপারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে। একটি নির্দিষ্ট মৌলের সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক প্রোটন থাকে। এই প্রোটনের সংখ্যা, যা প্রতিটি মৌলের জন্য আলাদা, তাকে বলা হয় **পরমাণু সংখ্যা (Atomic Number)**। এটি মৌলের প্রতীকের বাম পাশে নিচে সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript, নিম্নে ছোট লিখনি) আকারে লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, $_{2}He$ প্রতীকটি বোঝায় যে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ২টি প্রোটন আছে। যদি না অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে প্রতিটি পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। তাই পরমাণু সংখ্যা আমাদের জানায়, প্রোটনের সংখ্যা এবং একটি নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রনের সংখ্যাও। আর **নিউট্রনের সংখ্যা** জানা যায় একটি দ্বিতীয় পরিমাণ থেকে, যাকে বলে **ভর সংখ্যা (Mass Number)**। এটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা। ভর সংখ্যা মৌলের প্রতীকের বাম পাশে উপরে সুপারস্ক্রিপ্ট (Superscript, শীর্ষে ছোট লিখনি) আকারে লেখা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, হিলিয়ামের পরমাণুকে লেখা যায় $^{4}_{2}He$। এখানে,

- পরমাণু সংখ্যা = ২ (প্রোটন সংখ্যা, ইলেকট্রন সংখ্যা)

- ভর সংখ্যা = ৪ (প্রোটন + নিউট্রন)

অতএব, **নিউট্রনের সংখ্যা = ভর সংখ্যা – পরমাণু সংখ্যা = ৪ – ২ = ২**

আরও একটি উদাহরণ: সোডিয়াম ($^{23}_{11}Na$)

- ভর সংখ্যা = প্রোটন + নিউট্রন = ২৩
- পরমাণু সংখ্যা = প্রোটন সংখ্যা = ইলেকট্রন সংখ্যা = ১১
- নিউট্রনের সংখ্যা = ২৩ – ১১ = ১২

সবচেয়ে সরল পরমাণু হলো **হাইড্রোজেন ($^{1}_{1}H$)**, যার কোনো নিউট্রন নেই; এটি এক প্রোটন ও এক ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত।

যেহেতু ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত কম, তাই পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত থাকে। পরমাণু আসল ভর (Atomic Mass) তার ভর সংখ্যার সমান নয়। একটি নিউট্রন বা প্রোটনের ভর প্রায় ১ ডালটন হওয়ায়, পরমাণুর ভর সংখ্যা তার প্রায় আসল ভরের (Atomic Mass) কাছাকাছি, সামান্য পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সোডিয়ামের ($^{23}_{11}Na$) ভর সংখ্যা ২৩, কিন্তু তার পরমাণু ভর ২২.৯৮৯৮ ডালটন।

সমস্থানিক বা আইসোটোপ (Isotopes)।

একটি নির্দিষ্ট মৌলের সব পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু কিছু পরমাণুর নিউট্রনের সংখ্যা বেশি বা কম হতে পারে। ফলে তাদের ভর (Mass) ভিন্ন হয়। একই মৌলের এই ভিন্ন ভরবিশিষ্ট পরমাণুগুলোকেই বলা হয় **সমস্থানিক** (Isotopes)। প্রকৃতিতে কোনো মৌল সাধারণত তার একাধিক আইসোটোপ বা সমস্থানিকের মিশ্রণ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক **কার্বন** (Carbon), যার পারমাণবিক সংখ্যা ৬। কার্বনের প্রকৃতিতে তিনটি প্রাকৃতিক সমস্থানিক বা আইসোটোপ রয়েছে:

- **কার্বন-১২** ($^{12}_{6}C$) — এতে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন থাকে, এবং এটি মোট কার্বনের প্রায় **৯৯%** গঠন করে।
- **কার্বন-১৩** ($^{13}_{6}C$) — এতে ৬টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রন থাকে, এবং এটি বাকি প্রায় **১%** গঠন করে।
- **কার্বন-১৪** ($^{14}_{6}C$) — এতে ৬টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন থাকে, তবে এটি অত্যন্ত বিরল।

এই তিনটি সমস্থানিকের প্রোটনের সংখ্যা সমান (৬), তাই এগুলো একই মৌল অর্থাৎ কার্বন। যদি প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তিত হতো, তবে মৌলটিও পরিবর্তিত হয়ে যেত। যদিও সমস্থানিকগুলোর ভর সামান্য আলাদা, তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একইভাবে আচরণ করে। কোনো মৌলে যদি একাধিক সমস্থানিক বা আইসোটোপ থাকে তবে মৌলটির **পারমাণবিক ভর** (Atomic Mass) নির্ধারিত হয় তার সব সমস্থানিকের ভর গড় করে। এইভাবে, কার্বনের পারমাণবিক ভর হলো **১২.০১ ডালটন** (Daltons)।

কার্বন-১২ ও কার্বন-১৩ হলো **স্থিতিশীল সমস্থানিক** (Stable Isotopes) কারণ এদের নিউক্লিয়াস ভেঙে যায় না। কিন্তু **কার্বন-১৪** (^{14}C) হলো **অস্থিতিশীল বা তেজস্ক্রিয়** (radioactive isotope)। এর নিউক্লিয়াস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যায় এবং অতিপারমাণবিক কণা ও শক্তি নির্গত করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **তেজস্ক্রিয় ক্ষয়** (radioactive decay)। তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ে কখনো প্রোটনের সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, ফলে পরমাণুটি অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয়। যেমন, কার্বন-১৪ ক্ষয় হলে একটি নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, এবং তখন পরমাণুটি **নাইট্রোজেন-১৪** ($^{14}_{7}N$)-এ পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপে, সমস্থানিক হলো একই মৌলের পরমাণুর ভিন্ন ভরবিশিষ্ট রূপ, যা রাসায়নিকভাবে একই কিন্তু ভৌতভাবে ভিন্ন হতে পারে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (Radioactive Isotope) ক্ষয় হয়ে নতুন মৌল তৈরি করে এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকগুলোকে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে **(চিত্র ৩.২.২)** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো হয়।

চিত্র ৩.২.২: একটি PET অভিবীক্ষণ বা স্ক্যান (Scan)-এর ছবি, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকগুলোর ব্যবহারের একটি উদাহরণ। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকগুলো শরীরের ভেতরে তীব্র রাসায়নিক কার্যকলাপের স্থান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। PET শব্দটি Positron Emission Tomography (পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি যন্ত্রের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের অঙ্কন বা প্রতিবিম্ব তৈরির (Imaging, ইমেজিং) পদ্ধতি, যেখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা টিস্যুর বিপাকীয় কার্যকলাপ (Metabolic Activity) দেখা যায়। ছবিতে দেখা উজ্জ্বল হলুদ দাগটি এমন একটি স্থানের নির্দেশ দেয় যেখানে তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজের মাত্রা বেশি। এটি নির্দেশ করে যে সেখানে উচ্চ মাত্রার বিপাকীয় কার্যকলাপ (Metabolic Activity) হচ্ছে, যা সাধারণত কর্কটরোগ বা ক্যান্সারআক্রান্ত কোষকলা বা টিস্যুর একটি বৈশিষ্ট্য।

রেডিওমেট্রিক ডেটিং (Radiometric Dating)।

রেডিওমেট্রিক ডেটিং (Radiometric Dating) হলো একটি বয়স-নির্ণয় পদ্ধতি যা কোনো ভূতাত্ত্বিক উপাদান (যেমন শিলা বা খনিজ) এবং জৈব পদার্থের বয়স নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। কিছু নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সময়ের সাথে সাথে তাপমাত্রা, চাপ বা অন্যান্য পরিবেশগত কারণে একটি স্থিতিশীল আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়, যাকে বলা হয় **তেজস্ক্রিয় ক্ষয় (Radioactive Decay)**। রেডিওমেট্রিক ডেটিং পদ্ধতিতে, কোনো পদার্থে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ও তার ভাঙনের ফলে সৃষ্ট স্থিতিশীল আইসোটোপের অনুপাত পরিমাপ করে, বিজ্ঞানীরা সেই পদার্থ বা উপাদানটি কখন গঠিত হয়েছিল তা অনুমান করতে পারেন। গবেষকরা জীবাশ্মের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় (Radioactive Decay) পরিমাপ করে এগুলোর বয়স নির্ধারণ করেন। জীবাশ্ম (Fossil) হলো অতীতে বাস করা কোনো জীবন্ত জিনিসের সংরক্ষিত অবশিষ্টাংশ, যেমনঃ হাড়, দাঁত, খোলস, ছাপ বা অন্যান্য চিহ্ন। এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে ডাইনোসর বা বিশাল গাছপালা পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। জীবের মৃতদেহ বায়ুর অনুপস্থিতিতে মাটির নিচে চাপা পড়ে এবং তাপ, চাপ ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবাশ্ম আকারে সংরক্ষিত হয়। সহজভাবে, জীবাশ্ম হচ্ছে অতীত জীবনের নিদর্শন, যার মাধ্যমে আগের দিনে বেঁচে থাকা জীব আর বর্তমান দিনের জীবের মধ্যকার পার্থক্যগুলো দেখা যায়। জীবাশ্ম সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর অভিযোজন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের হার প্রতিটি মৌলের জন্য স্থির থাকে। এই হার সাধারণত **অর্ধ-আয়ু (Half-life)** দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যা হলো সেই সময়কাল যখন কোনো নমুনার অর্ধেক তেজস্ক্রিয় পরমাণু ক্ষয় হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন-১৪ এর অর্ধ-আয়ু ৫,৭৩০ বছর। অর্থাৎ, আজ যদি কোনো নমুনায় ১ গ্রাম কার্বন-১৪ থাকে, তাহলেঃ

- ৫,৭৩০ বছর পরে থাকবে ০.৫ গ্রাম,
- ১১,৪৬০ বছর পরে থাকবে ০.২৫ গ্রাম,

- ১৭,১৯০ বছর পরে থাকবে ০.১২৫ গ্রাম, ইত্যাদি

এই নীতির ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম ও পাথরের বয়স নির্ধারণ করেন। জীবাশ্ম বা পাথরের মধ্যে বিভিন্ন সমস্থানিকের অনুপাত বিশ্লেষণ করে নির্ভুলভাবে বোঝা যায়, এগুলোর গঠন কত বছর আগে হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কার্বন-১৪ (Carbon-14) ব্যবহার করে বিভিন্ন জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করছেন **(চিত্র ৩.২.৩)** এবং ইউরেনিয়াম-২৩৮ ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন চাঁদের পাথর প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর পুরানো, যা পৃথিবীর আনুমানিক বয়সের সাথে প্রায় মিলে যায়।

চিত্র ৩.২.৩: গবেষকরা কার্বন-১৪ (Carbon-14) ব্যবহার করে আল্পস পর্বতমালার বরফে জমে থাকা এক শিকারির দেহাবশেষ ও তার পোশাকের বয়স নির্ধারণ করেন, যিনি "ওটসি দ্য আইসম্যান (Ötzi the Iceman)" নামে পরিচিত। কার্বন ডেটিং-এর মাধ্যমে জানা যায়, তিনি প্রায় ৫,৩০০ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। তার জুতা চামড়া, ঘাস এবং দড়ি দিয়ে তৈরি ছিল। স্বত্বাধিকার: সাউথ টাইরোল মিউজিয়াম অব আর্কিওলজি (South Tyrol Museum of Archaeology)।

পরমাণুতে পৃথক শক্তিস্তর থাকে (Atoms contain discrete energy levels)।

চিত্র ৩.২.১-এ প্রদর্শিত পরমাণুর সরলীকৃত মডেলগুলোতে নিউক্লিয়াসের আকারকে পরমাণুর তুলনায় অনেক বেশি বড় দেখায়। যদি একটি হিলিয়াম পরমাণুকে একটি বড় ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান ধরা হয়, তাহলে তার নিউক্লিয়াসটি মাঠের মাঝখানে রাখা একটি পেন্সিলের রাবারের মতো ছোট হবে। অন্যদিকে, ইলেকট্রনগুলো হবে দুটি ছোট মাছির মতো, যারা স্টেডিয়ামের চারপাশে ঘুরছে। আর একটি পরমাণুর বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা স্থান (Empty Space)।

যখন দুটি পরমাণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় একে অপরের কাছে আসে, তখন তাদের নিউক্লিয়াস একে অপরের সঙ্গে সংস্পর্শে আসে না। আমরা যে তিনটি অতিপারমাণবিক কণা (Subatomic Particles) নিয়ে আলোচনা করেছি, প্রোটন, নিউট্রন, এবং ইলেকট্রন, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইলেকট্রনই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে।

যেহেতু ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক চার্জ বা আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা টান থাকে, তাই এই টানের বিপরীতে তাদেরকে নিজেদের অবস্থানে ধরে রাখতে হলে **কাজ (Work)** করতে হয়, যেমন করে মাধ্যাকর্ষণের টানে পড়ে যাওয়া থেকে একটি ফল (যেমন জাম্বুরা) হাতে ধরে রাখতে হলে কাজ করা লাগে।

একটি পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের শক্তি (Energy) ধারণ করে। শক্তি (Energy) মানে হলো পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা বা কাজ করার ক্ষমতা। কেউ যখন একটি জাম্বুরা মাটির উপরে ধরে রাখে, এই কাজটির কারণে তখন এটি তার অবস্থানের জন্য **বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি (Potential Energy)** অর্জন করে। যদি সেটি ছেড়ে দেয়া হয় , এটি নিচে পড়ে যায় এবং তার স্থিতি শক্তি কমে যায়। আবার, যদি সেটিকে ভবনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তার স্থিতি শক্তি বেড়ে যায়। অর্থাৎ, স্থিতি শক্তি (Potential energy) হলো এমন শক্তি, যা কোনো বস্তুর অবস্থান বা গঠনের কারণে বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। স্থিতি শক্তির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, পাহাড়ের উপর বাঁধে জমা পানির স্থিতি শক্তি বেশি থাকে কারণ এটি উচ্চ স্থানে

থাকে। যখন বাঁধের দরজা খোলা হয় এবং পানি নিচে নেমে আসে, তখন এই শক্তি **কাজে (Work)** ব্যবহার করা যায়, যেমন টারবাইনের ব্লেড ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। পানি নিচে নেমে এলে তার শক্তি কমে যায়, কারণ কিছু শক্তি ব্যবহার হয়েছে। প্রকৃতিতে বস্তু সাধারণত তার সবচেয়ে কম স্থিতি শক্তির অবস্থায় যেতে চায়। আবার সেই পানি উপরে তুলতে হলে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় এবং শক্তি ব্যয় হয়।

ঠিক তেমনই, একটি ইলেকট্রনের স্থিতি শক্তি তার অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ শক্তির বিপরীতে ইলেকট্রনকে দূরের কোনো অবস্থানে স্থানান্তর করতে হলে অতিরিক্ত শক্তি যোগ করতে হয়। ফলে ইলেকট্রনটির স্থিতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের সবুজ রঙের জন্য দায়ী **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll) এইভাবেই **ফটোসিন্থেসিসের** (Photosynthesis) সময় সূর্যের আলো থেকে শক্তি ধারণ করে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে খাদ্য তৈরি করে। আলো ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রনগুলোকে উত্তেজিত করে উচ্চ শক্তিস্তরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, যখন একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি শেলে ফিরে আসে (Fall Back), তখন শক্তি নিঃসৃত হয়, যা সাধারণত **আলোক (Visible Light) বা অতিবেগুনি বিকিরণ (Ultraviolet Radiation)** হিসেবে পরিবেশে মুক্ত হয়, এবং ইলেকট্রনটির স্থিতি শক্তি কমে যায়।

অর্থাৎ প্রত্যেক ইলেকট্রনের শক্তি স্তর তার নিউক্লিয়াস থেকে গড় দূরত্বের সাথে সম্পর্কিত। পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনগুলো **পৃথক শক্তিস্তরে (Discrete Energy Levels)** অবস্থান করে। এই পৃথক স্তরগুলোকে বলা হয় **কোয়ান্টা** (Quanta), একবচন **কোয়ান্টাম** (Quantum), যার অর্থ "নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি"। এই স্তরগুলো একধরনের খোলক (Shell, শেল) তৈরি করে, যাতে ইলেকট্রনগুলো বিচরণ করে। এই ইলেকট্রন শেলগুলোকে (Electron Shell) সমকেন্দ্রিক বৃত্ত হিসেবে প্রদর্শন করা যায় **(চিত্র ৩.২.৪)**। প্রথম শেল নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছে থাকে এবং এর ইলেকট্রনগুলোর শক্তি সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় শেল-এর ইলেকট্রনগুলোর শক্তি বেশি, আর তৃতীয় শেল-এর ইলেকট্রনগুলোর শক্তি আরও বেশি। আবার যেহেতু ইলেকট্রনের শক্তি তার নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্বের সাথে সম্পর্কিত, তাই একই দূরত্বে অবস্থানকারী ইলেকট্রনগুলোর শক্তিও সমান হয়, এমনকি তারা ভিন্ন কক্ষপথে থাকলেও। এই ধরনের ইলেকট্রনকে বলা হয় তারা একই শক্তিস্তরে (Energy Level) আছে।

চিত্র ৩.২.৪: একটি পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তিস্তর। ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভব শক্তি বা স্থিতি শক্তি (Potential Energy) বিশিষ্ট স্তরে অবস্থান করে, যেগুলোকে বলা হয় ইলেকট্রন শেল (Electron Shell)।

(ক) যেমন একটি বল সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় কেবল প্রতিটি ধাপে থামতে পারে, কিন্তু ধাপগুলোর মাঝখানে নয়, ঠিক তেমনি একটি ইলেকট্রনও শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে (Energy Level) থাকতে পারে, দুটি স্তরের মাঝখানে নয়।

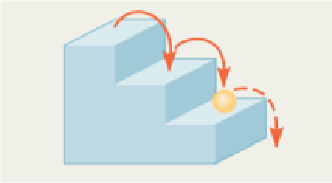

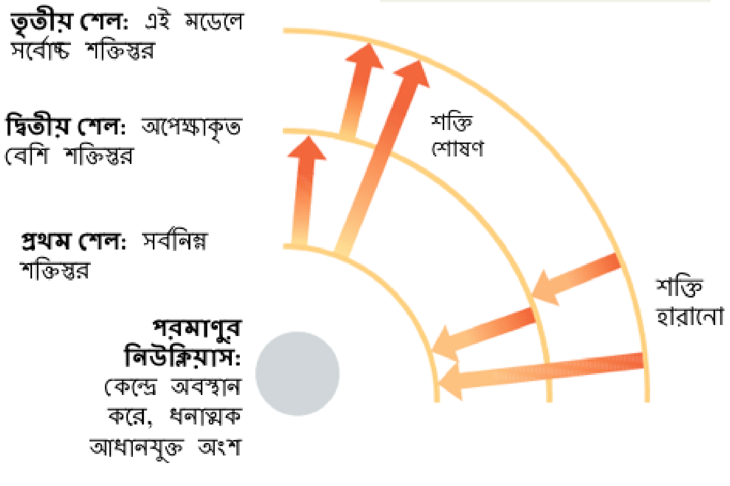

ইলেকট্রন বিন্যাস ও রাসায়নিক ধর্ম (Electron Distribution and Chemical Properties)।

প্রাকৃতিকভাবে মোট ৯৪টি মৌল বা উপাদান পাওয়া যায় যাদের প্রতিটির প্রোটন সংখ্যা ও ইলেকট্রন বিন্যাস একে অপরের থেকে ভিন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলেভ (Dmitri Mendeleev) উপাদানগুলোকে তাদের পরমাণু সংখ্যা অনুযায়ী একটি সারণিতে সাজানোর সময় বিজ্ঞান ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে, উপাদানগুলোর রাসায়নিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যে একটি নিয়মিত পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ প্রতি আটটি উপাদানের পর একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আবার ফিরে আসে। এই নিয়মিত বা পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত ধরণ থেকেই সারণিটির নাম হয়েছে, “পর্যায় সারণি” (Periodic Table of Elements) (**চিত্র ৩.২.৫**) ।

একটি পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ নির্ভর করে তার ইলেকট্রনগুলোর বণ্টনের উপর, যা ইলেকট্রন শেল বা খোলের মধ্যে অবস্থান করে। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হলো হাইড্রোজেন, যার মধ্যে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন আছে। বাকি পরমাণুগুলো গঠিত হয়েছে ধাপে ধাপে ১টি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন যোগ করার মাধ্যমে (এবং উপযুক্ত সংখ্যক নিউট্রন সহ)। **চিত্র ৩.২.৬**-এ দেখানো হয়েছে পর্যায় সারণি প্রথম ১৮টি উপাদানের (হাইড্রোজেন থেকে আর্গন পর্যন্ত) ইলেকট্রন বণ্টন। এই উপাদানগুলোকে তিনটি সারি বা পিরিয়ডে সাজানো হয়েছে, যা পরমাণুর ইলেকট্রন শেলের সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত। প্রতিটি সারিতে বাম থেকে ডানদিকে উপাদানগুলোর অবস্থান নির্ভর করে ইলেকট্রন ও প্রোটনের ক্রমানুসারে যোগের উপর।

হাইড্রোজেনের ১টি ইলেকট্রন এবং হিলিয়ামের ২টি ইলেকট্রন প্রথম শেলে অবস্থান করে। অন্যান্য পদার্থের মতো, ইলেকট্রনও সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে থাকতে চায়, অর্থাৎ প্রথম শেলে। তবে, প্রথম শেল সর্বাধিক ২টি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে। এজন্য হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই শুধুমাত্র প্রথম সারিতে থাকে।

যে পরমাণুতে ২টির বেশি ইলেকট্রন আছে, তাদের অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলোকে উচ্চতর শেলগুলোতে অবস্থান করতে হয়, কারণ প্রথম শেল পূর্ণ হয়ে যায়।

চিত্র ৩.২.৫: মৌলিক পদার্থের পর্যায় সারণি: (ক) এই চিত্রে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে উপাদানগুলোর উপস্থিতির হার (Frequency) বা পরিমাণ খণ্ড বা ব্লকের (Block) উচ্চতা দ্বারা দেখানো হয়েছে। যে উপাদানগুলো সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে, সেগুলো জীবিত প্রাণীতে ট্রেস মৌলের (Trace Element) থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। (খ) জীবিত প্রাণীতে সাধারণভাবে পাওয়া যায় এমন ১২টি প্রচলিত উপাদান এখানে পরিমাণ অনুযায়ী বেশি থেকে কম ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

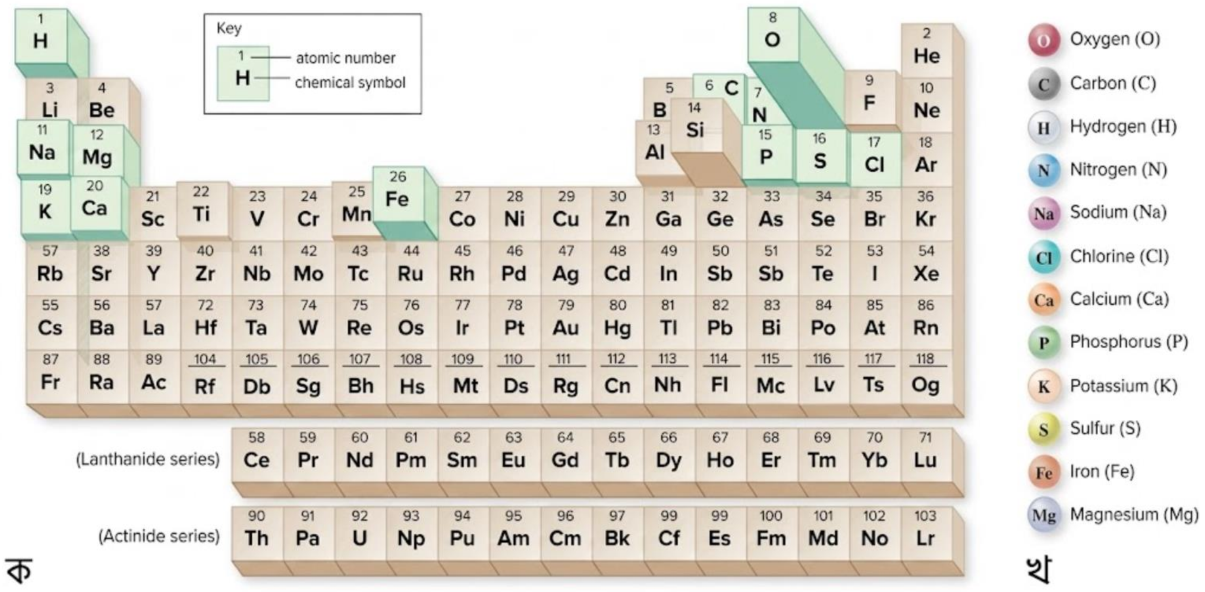

উদাহরণস্বরূপ, লিথিয়াম-এ ৩টি ইলেকট্রন আছে। প্রথম দুটি ইলেকট্রন প্রথম শেল পূর্ণ করে, এবং তৃতীয় ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় শেলে যায়। দ্বিতীয় শেল সর্বোচ্চ ৮টি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয় সারির শেষ উপাদান নিয়ন (Ne)-এর দ্বিতীয় শেল পূর্ণ, মোট ১০টি ইলেকট্রন রয়েছে।

একটি পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ মূলত নির্ভর করে তার বহিঃস্থ শেলের (Outermost Shell) ইলেকট্রন সংখ্যার উপর। এই বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় ভ্যালেন্স ইলেকট্রন **(Valence Electron)**, এবং যে শেলে এগুলো থাকে সেটিকে বলা হয় ভ্যালেন্স শেল **(Valence Shell)**। উদাহরণস্বরূপ, লিথিয়ামের ভ্যালেন্স শেলে মাত্র ১টি ইলেকট্রন থাকে।

যেসব পরমাণুর ভ্যালেন্স শেলে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে, তারা একই ধরনের রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে। যেমন, ফ্লোরিন (F) এবং ক্লোরিন (Cl) — উভয়েরই ৭টি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে এবং উভয়ই সোডিয়াম (Na)-এর সঙ্গে যৌগ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF) দাঁতের ক্ষয় রোধে টুথপেস্টে ব্যবহার করা হয়, এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) হলো সাধারণ খাবার লবণ (Table Salt)।

যেসব পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ, তারা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা অক্রিয় (inert)। অর্থাৎ, তারা সহজে অন্য পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। পর্যায় সারণির ডান প্রান্তে থাকা হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), ও আর্গন (Ar) এই ধরনের নিষ্ক্রিয় উপাদান। অন্যদিকে, যেসব পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল অসম্পূর্ণ, তারা রাসায়নিকভাবে সক্রিয় এবং সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশ নেয়।

চিত্র ৩.২.৬: পর্যায় সারণির প্রথম ১৮টি উপাদানের ইলেকট্রন বিন্যাস বা বণ্টন চিত্র। একটি সাধারণ পর্যায় সারণিতে, প্রতিটি উপাদানের তথ্য হিলিয়াম উদাহরণের মতোভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই সারণির চিত্রগুলোতে ইলেকট্রনগুলোকে হলুদ বিন্দু দ্বারা এবং ইলেকট্রন শেল বা খোলসগুলোকে (Shells) কেন্দ্রিক বৃত্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই চিত্রগুলো একটি পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো কীভাবে বিভিন্ন খোলসের মধ্যে বণ্টিত থাকে, তা সহজভাবে কল্পনা করার একটি উপায়। তবে, এই সরলীকৃত মডেলগুলো পরমাণুর আসল আকৃতি বা ইলেকট্রনগুলোর সঠিক অবস্থান সঠিকভাবে প্রকাশ করে না। উপাদানগুলোকে সারি আকারে সাজানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি সারি একটি ইলেকট্রন শেল বা খোলস পূরণের ধাপ নির্দেশ করে। যখন শেলে নতুন ইলেকট্রন যোগ হয়, তারা সর্বপ্রথম সবচেয়ে নিম্ন শক্তিস্তরের খোলসে অবস্থান নেয়।

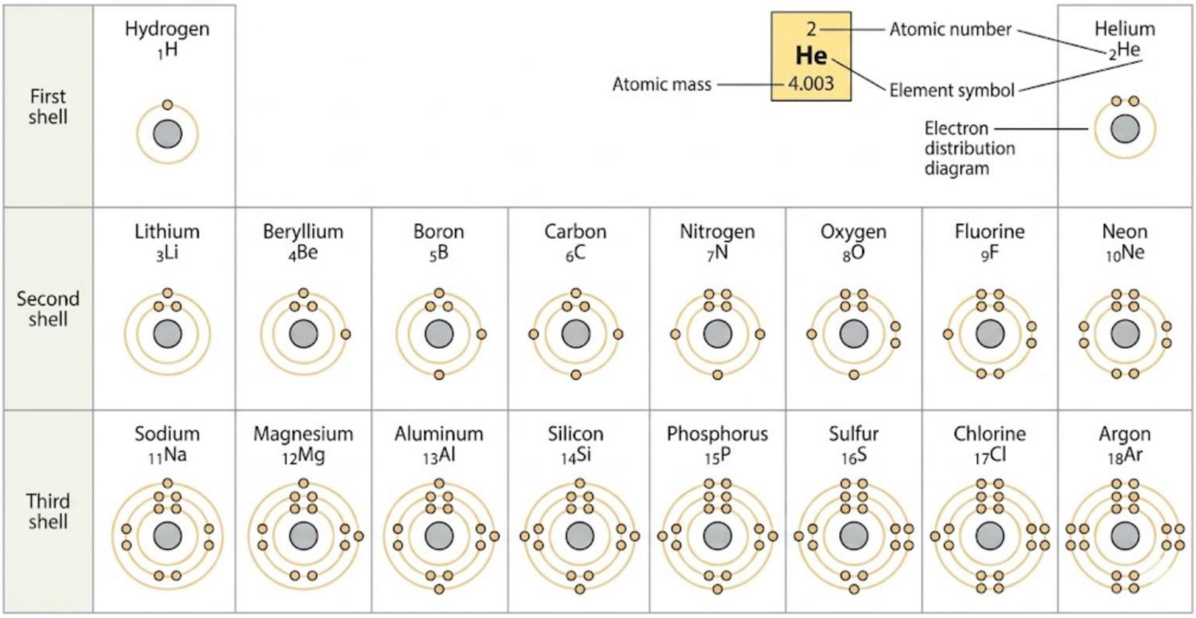

ইলেকট্রন কক্ষপথ বা অরবিটাল। (Electron Orbital)

১৯০০ সালের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ইলেকট্রন শেল বা খোলসগুলোকে (Electron Shells) এমনভাবে কল্পনা করেছিলেন যেন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে, যেমন গ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আজও, পরমাণুর ইলেকট্রন শেলগুলো দেখানোর জন্য দ্বিমাত্রিক কেন্দ্রিক বৃত্তের (concentric-circle) চিত্র ব্যবহার করা সুবিধাজনক (যেমন **চিত্র ৩.২.৬**-এ দেখা যায়)। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি কেন্দ্রিক বৃত্ত কেবলমাত্র ওই খোলসে থাকা ইলেকট্রনের গড় (Average) দূরত্ব নির্দেশ করে, যা নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের গড় অবস্থান বোঝায়। অতএব, এই বৃত্তাকার চিত্রগুলো পরমাণুর প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে না। বাস্তবে, আমরা ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান কখনো নির্দিষ্টভাবে জানতে পারি না। পরিবর্তে, আমরা বলতে পারি ইলেকট্রনটি কোন স্থানে বেশিরভাগ সময় থাকে। যে ত্রিমাত্রিক স্থানে একটি ইলেকট্রন প্রায় ৯০% সময় পাওয়া যায়, সেটিকে বলা হয় ইলেকট্রনের **কক্ষপথ বা অরবিটাল** (Orbital)।

প্রতিটি ইলেকট্রন তার শেলে বা খোলসে নির্দিষ্ট শক্তিস্তরের ইলেকট্রন থাকে, যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অরবিটালে বণ্টিত থাকে, এবং এসব অরবিটালের আলাদা আকার ও অবস্থান (Orientation) থাকে। উদাহরণ হিসেবে, **চিত্র ৩.২.৭**-এ নিয়ন (Neon)-এর অরবিটাল দেখানো হয়েছে তার ইলেকট্রন বণ্টন চিত্রসহ। ইলেকট্রন শেল আর অরবিটাল এক নয়। একটি অরবিটালকে ইলেকট্রন খোলসের একটি অংশ হিসেবে ভাবা যায়। প্রথম

চিত্র ৩.২.৭: ইলেকট্রন কক্ষপথ বা অরবিটাল।

নিয়ন (Neon) পরমাণুতে দুটি পূর্ণ ইলেকট্রন খোলস থাকে (**মোট ১০টি ইলেকট্রন**)।

(ক) ইলেকট্রন বণ্টন চিত্র (Electron distribution diagram): এই চিত্রে নিয়ন পরমাণুর ইলেকট্রন বণ্টন দেখানো হয়েছে, যার মোট ১০টি ইলেকট্রন রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রিক বৃত্ত (Concentric circle) একটি ইলেকট্রন খোলস নির্দেশ করে, যা আবার নিচের দেখানো ইলেকট্রন অরবিটালে (Electron orbitals) বিভক্ত থাকে।

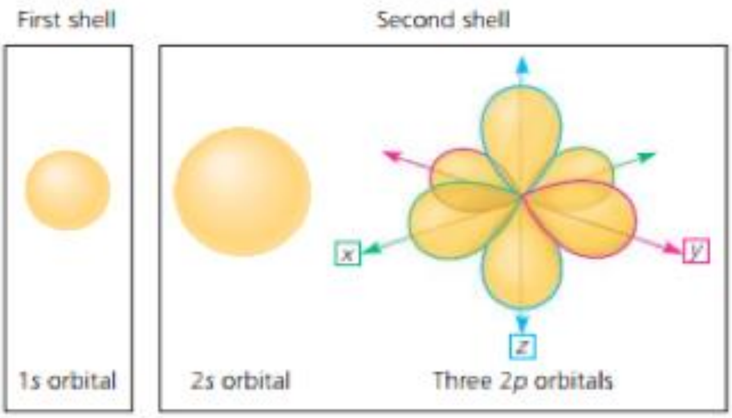

(খ) পৃথক ইলেকট্রন অরবিটাল (Separate electron orbitals): ত্রিমাত্রিক আকারগুলো পরমাণুর ইলেকট্রন অরবিটাল নির্দেশ করে—অর্থাৎ সেই স্থান বা অঞ্চল, যেখানে ইলেকট্রনগুলো বেশিরভাগ সময়ে অবস্থান করে। প্রতিটি অরবিটালে সর্বাধিক দুইটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। প্রথম ইলেকট্রন খোলসে থাকে একটি গোলাকার s অরবিটাল (1s)। দ্বিতীয় খোলসে থাকে একটি বড় গোলাকার s অরবিটাল (2s) এবং তিনটি ডাম্বেল আকৃতির p অরবিটাল (2p)। এই তিনটি 2p অরবিটাল পরমাণুর কল্পিত x-, y-, এবং z-অক্ষ বরাবর একে অপরের সাথে সমকোণে (Right angles) অবস্থান করে। এখানে প্রতিটি 2p অরবিটালকে আলাদা রঙে দেখানো হয়েছে।

(গ) অরবিটালের উপরিস্থাপন (Superimposed electron orbitals): নিয়ন পরমাণুর সম্পূর্ণ ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝাতে, প্রথম খোলসের 1s অরবিটাল এবং দ্বিতীয় খোলসের 2s ও তিনটি 2p অরবিটাল একত্রে (উপরিস্থাপন বা Superimposed করে) প্রদর্শন করা হয়েছে।

ইলেকট্রন খোলসে থাকে কেবল একটি গোলাকার (Spherical) অরবিটাল (যাকে 1s বলে)। দ্বিতীয় খোলসে থাকে চারটি অরবিটাল—একটি বড় গোলাকার s অরবিটাল (2s) এবং তিনটি ডাম্বেল (Dumbbell) আকৃতির p অরবিটাল (2p)। তৃতীয় ও তার পরের উচ্চ খোলসগুলোতেও s ও p অরবিটাল থাকে, পাশাপাশি আরও জটিল আকারের অরবিটালও থাকে। প্রতিটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুইটি ইলেকট্রন থাকতে পারে। তাই প্রথম ইলেকট্রন খোলসে সর্বাধিক ২টি ইলেকট্রন থাকতে পারে এবং উভয়ই 1s অরবিটালে অবস্থান করে। হাইড্রোজেন পরমাণুর একমাত্র ইলেকট্রন এবং হিলিয়াম পরমাণুর দুইটি ইলেকট্রন, দুটিই 1s অরবিটালে থাকে। দ্বিতীয় খোলসের চারটি অরবিটালে মোট ৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, প্রতিটি অরবিটালে ২টি করে। দ্বিতীয় খোলসের এই চারটি অরবিটালের ইলেকট্রনগুলোর শক্তি প্রায় একই, তবে তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (Space) বা আয়তনের (Volume) মধ্যে চলাচল করে।

৩.৩ যৌগের গঠন, বৈশিষ্ট্য, ও কার্যকারিতা নির্ভর করে তাদের পরমাণুগুলোর মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনের (Chemical Bonding) ওপর।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানার পর এখন দেখা যাক, কীভাবে পরমাণুগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **অণু (Molecule)** ও **যৌগ (Compound)** তৈরি করে। যৌগ বা যৌগিক পদার্থ (Compound) হলো সেই পদার্থ যা দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পদার্থগুলোকে রাসায়নিকভাবে ভাঙলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, এবং যৌগের ধর্ম তার উপাদান মৌলিক পদার্থগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পানি বা জল হলো (H_2O) যৌগিক পদার্থ, যা হাইড্রোজেন (H_2) এবং অক্সিজেন (O_2) নামের দুটি ভিন্ন বৈশিষ্টের মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি।

অণু (Molecule) হলো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, যা ঐ পদার্থের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। অর্থাৎ, একটি অণুর মধ্যে ঐ পদার্থের সমস্ত গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। অণু দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটি পরমাণুতে বিয়োজিত হতে পারে। পরমাণুর তুলনায় অণু আকারে বড় হয়। H_2 এবং O_2 হলো বিশুদ্ধ মৌলিক অণু (Pure Elements), যৌগ (Compound) নয়। H_2 এবং O_2 মিলে তৈরি হয় পানি বা জল (H_2O), যা হচ্ছে যৌগ (Compound) এবং এটির অণু হচ্ছে একটি যৌগিক অণু।

যেসব পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রন শেল (Valence Shell) পূর্ণ নয়, তারা অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় যাতে তাদের বাইরের শেল পূর্ণ হয়। এজন্য তারা ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে নেয় বা ইলেকট্রনকে এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে স্থানান্তর করে। এইভাবে পরমাণুগুলো একে অপরের কাছে থেকে যুক্ত থাকে, আর এই সংযোগকে বলে **রাসায়নিক বন্ধন (Chemical bond)**। অর্থাৎ, রাসায়নিক বন্ধন হলো পরমাণুগুলোর মধ্যে থাকা এক ধরনের আকর্ষণ বল, যা তাদের একত্রে ধরে রেখে অণু তৈরি করে। এই বন্ধন গঠিত হয় ইলেকট্রন শেয়ার (Share) বা আদান-প্রদানের মাধ্যমে, যা পরমাণুগুলোকে স্থিতিশীলতা অর্জনে সাহায্য করে। শক্তিশালী দুইটি রাসায়নিক বন্ধন হলো:

- **সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Covalent bond)** – অণুতে পাওয়া যায়
- **আয়নিক বন্ধন (Ionic bond)** – কঠিন আয়নিক যৌগে পাওয়া যায়

(তবে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিক বন্ধন তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়, যা আমরা পরে দেখব।)

- ***সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Covalent Bonds)***

সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধন হলো দুইটি পরমাণুর মধ্যে এক জোড়া ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে নেওয়া।

উদাহরণ হিসেবে দেখা যাক, দুটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু একে অপরের কাছে এলে কী ঘটে। প্রত্যেক হাইড্রোজেনের ১টি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন (বহিঃস্তরের শেলের ইলেকট্রন) থাকে, কিন্তু তার শেলের ২টি ইলেকট্রন ধারণের ক্ষমতা আছে। একটি পরমাণুর শেলের অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং এর পরিমাণ নির্ভর করে অরবিটালের ধরনের ওপর। একটি অরবিটালে সর্বাধিক ২টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। যখন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একে অপরের যথেষ্ট কাছাকাছি আসে, তখন একটি পরমাণুর 1s ইলেকট্রন কক্ষপথ বা অরবিটালের কিছু অংশ আরেক পরমাণুর 1s অরবিটালের কিছু অংশকে আবৃত করে বা প্রাবরণ করে (Overlap, ওভারল্যাপ) এবং এই আবৃত কক্ষপথে তারা তাদের ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে, প্রত্যেক হাইড্রোজেন এখন ২টি ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত, যা একটি সম্পূর্ণ ভ্যালেন্স শেল গঠন করে স্থিত হয়। এইভাবে দুই বা ততোধিক পরমাণু যখন সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে, তখন তারা একটি **অণু (molecule)** তৈরি করে। এই ক্ষেত্রে এটি হলো একটি **হাইড্রোজেন অণু (H_2) (চিত্র ৩.৩.১, চিত্র ৩.৩.২ক)**।

চিত্র ৩.৩.১: সমযোজী বন্ধনের (Covalent Bond) গঠন।

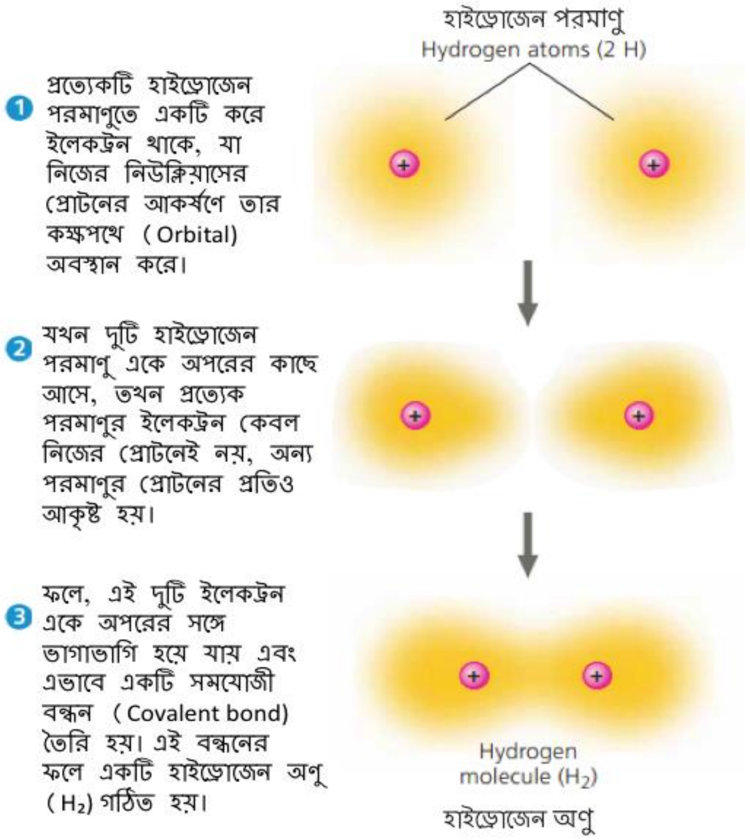

অণুকে লিখে বোঝানোর বিভিন্ন উপায় আছে **(চিত্র ৩.৩.২)**:

- **আণবিক বা মলিকিউলার** (Molecular) **সূত্র** (Formula)→ এই সূত্রটি অণুতে কতগুলো পরমাণু আছে তা দেখায়। যেমন, H_2।
- **ইলেকট্রন বিতরণ চিত্র** (Electron Distribution Diagram) বা **লুইস ডট স্ট্রাকচার** (Lewis Dot Structure) → একটি ডায়াগ্রাম যা পরমাণুর মধ্যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এবং রাসায়নিক বন্ধন দেখায়। এতে পরমাণুর প্রতীক ব্যবহার করা হয় এবং তার চারপাশে ডট বা বিন্দু দিয়ে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বোঝানো হয়, যা অণুতে কিভাবে ইলেকট্রন ভাগাভাগি হয় তা প্রকাশ করে। যেমন, H:H।
- **কাঠামোগত বা স্ট্রাকচারাল (Structural) সূত্র** → রাসায়নিক বন্ধন বোঝানোর জন্য ডট ব্যবহার না করে একটি রেখা (—) ব্যবহার করা হয়, যেখানে প্রতিটি রেখা দুটি ইলেকট্রনকে প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, (H–H)।
- **স্পেস-ফিলিং** (A Space Filling Model) **বা বল-অ্যান্ড-স্টিক মডেল** → অণুর আসল আকৃতির কাছাকাছি একটি প্রতিরূপ দেয়। স্পেস-ফিলিং এবং বল-অ্যান্ড-স্টিক মডেল হলো অণুর ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনা। বল-অ্যান্ড-স্টিক মডেলে পরমাণুগুলোকে বল দিয়ে এবং

রাসায়নিক বন্ধনগুলোকে স্টিক বা দণ্ড দিয়ে দেখানো হয়, যা অণুর বন্ধনগুলো বুঝতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, স্পেস-ফিলিং মডেলে প্রতিটি পরমাণুর বাস্তব আকারের কাছাকাছি গোলাকার ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়, যা অণুর একটি সামগ্রিক, বাস্তবসম্মত আকৃতি এবং আকার দেখায়।

চিত্র ৩.৩.২: চারটি অণুতে সমযোজী বন্ধন। কোনো পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রন স্তর (Valence Shell) পূর্ণ করতে যতটি ইলেকট্রন প্রয়োজন হয়, তা সাধারণত নির্ধারণ করে সেই পরমাণু কতটি সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond) তৈরি করতে পারবে। এই চিত্রে বিভিন্ন অণুর সমযোজী বন্ধন গঠনের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

হাইড্রোজেনের বহিঃস্তরের শেলের ১টি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে। আবার, **অক্সিজেন** (O)-এর বহিঃস্তরের শেলে ৬টি ইলেকট্রন থাকে। হাইড্রোজেনের শেল হচ্ছে একটি এবং এর একটি ইলেকট্রনের দরকার হয় তার ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে। কিন্তু একটি অক্সিজেন পরমাণুর শেল হচ্ছে দুইটি এবং তার দ্বিতীয় বা বহিঃস্তরের শেলে পূর্ণ হতে আরও ২টি ইলেকট্রন লাগে। তাই, দুটি অক্সিজেন পরমাণু দুই জোড়া ইলেকট্রন (৪টি ইলেকট্রন) ভাগাভাগি করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, একটি **অক্সিজেন অণু** (O_2) তৈরি করে। এখানে দুই পরমাণুর মধ্যে একটি ডাবল (Double) বা দ্বি-বন্ধন (O=O) থাকে **(চিত্র ৩.৩.২খ)**।

নাম এবং আণবিক সূত্র	ইলেকট্রন বিতরণ চিত্র	লুইস ডট স্ট্রাকচার বা কাঠামোগত সূত্র	স্পেস-ফিলিং মডেল
(ক) হাইড্রোজেন (H_2): দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক জোড়া ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে একটি একক বন্ধন (Single bond) তৈরি করে।	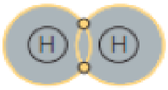	H:H H—H	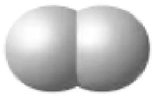
(খ) অক্সিজেন (O_2): দুটি অক্সিজেন পরমাণু দুই জোড়া ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে একটি দ্বৈত বন্ধন (Double bond) তৈরি করে।	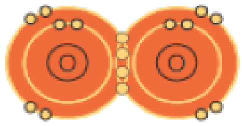	Ö::Ö O═O	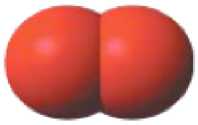
(গ) পানি (H_2O): দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি পানির অণু তৈরি করে।	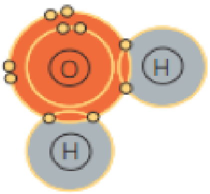	:Ö:H H O—H | H	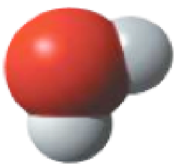
(ঘ) মিথেন (CH_4): চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি কার্বন পরমাণুর ভ্যালেন্স পূর্ণ করে, ফলে মিথেন অণু গঠিত হয়।	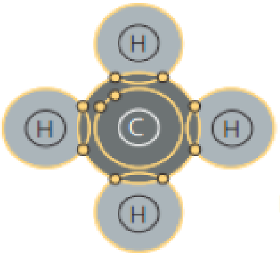	H H:C:H H H | H—C—H | H	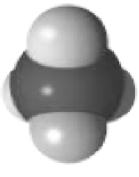

প্রত্যেক পরমাণুর একটি নির্দিষ্ট বন্ধনক্ষমতা (Bonding Capacity) থাকে। এই বন্ধনক্ষমতা নির্দেশ করে একটি পরমাণু কয়টি বন্ধন তৈরি করতে পারে। এটি সাধারণত সেই ইলেকট্রন সংখ্যার সমান, যা পরমাণুর বহিঃস্তরের ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে প্রয়োজন হয়। এজন্য বন্ধনক্ষমতাকে বলা হয় পরমাণুর ভ্যালেন্স। যেহেতু হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রনের দরকার হয় তার ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে, তাই হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্স হচ্ছে ১। একইভাবে, অক্সিজেন (O)-এর ২; নাইট্রোজেন (N)-এর ৩; কার্বন (C)-এর ৪। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল হয়। যেমন, ফসফরাস (P) পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ের মৌল হওয়ায় এটি ভিন্ন ধরনের বন্ধন তৈরি করে ৩ বা ৫ পর্যন্ত ভ্যালেন্স প্রদর্শন করতে পারে (যেমন

একক ও দ্বৈত বন্ধনের মিশ্রণ তৈরি করে)।

যৌগ গঠনের ক্ষেত্রেও পরমাণুগুলো তাদের ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করে। পানির (H_2O) ক্ষেত্রে একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভ্যালেন্স পূর্ণ করতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রয়োজন হয় **(চিত্র ৩.৩.২গ)**। পানির গঠন ও বৈশিষ্ট্য জীবনের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে পরবর্তী অধ্যায়ে এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

যৌগের আরেকটি উদাহরণ হলো **মিথেন (CH_4)**, যা প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান।এতে একটি কার্বন পরমাণু (যার ভ্যালেন্স ৪) এবং চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু (প্রত্যেকের ভ্যালেন্স ১) যুক্ত থাকে। ফলে প্রতিটি হাইড্রোজেন তার একটি ইলেকট্রন ভাগ করে নিয়ে কার্বনের ভ্যালেন্স স্তর পূর্ণ করে **(চিত্র ৩.৩.২ঘ)**।

রাসায়নিক বন্ধনের ধরন ও তড়িৎ ঋণাত্মকতা (Electronegativity)।

একটি অণুর মধ্যে থাকা পরমাণুগুলো ভাগ করা (shared) ইলেকট্রনকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আকর্ষণ করে। কোনো পরমাণু তার কোভ্যালেন্ট বন্ধনের ইলেকট্রনকে যতটা আকর্ষণ করে, তাকে বলে **তড়িৎ ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি (Electronegativity)**। সহজভাবে, তড়িৎ ঋণাত্মকতা হলো কোনো রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ পরমাণুর ইলেকট্রন-জোড়কে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা। এটি পারমাণবিক সংখ্যা এবং পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর দূরত্বের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, প্রোটনের সংখ্যা যত বেশি, ইলেকট্রনের উপর আকর্ষণ তত শক্তিশালী হয়। আর ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে থাকে, আকর্ষণ তত কম হয়।সাধারণত, পর্যায় সারণির বাম থেকে ডানে গেলে তড়িৎ ঋণাত্মকতা বাড়ে এবং উপর থেকে নিচে গেলে কমে।

যে পরমাণুর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, সে ভাগ করা ইলেকট্রনকে নিজের দিকে বেশি টেনে নেয়। একই মৌলের দুই পরমাণুর মধ্যে বন্ধনে (যেমন H_2 বা O_2) উভয়ের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সমান হওয়ায় ইলেকট্রন সমানভাবে ভাগ হয়। একে বলা হয় **অমেরু সমযোজী বা ননপোলার কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Nonpolar Covalent Bond)**। উদাহরণ: H_2-এর একক বন্ধন এবং O_2-এর দ্বৈত বন্ধন → অমেরু সমযোজী বন্ধন।

যখন কোনো পরমাণু একটি **বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক বা ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুর সঙ্গে বন্ধন গঠন করে,** তখন ইলেকট্রনগুলো সমানভাবে ভাগ হয় না (Unequal sharing)। এই ধরণের বন্ধনকে বলে **মেরু সমযোজী বা পোলার কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Polar Covalent Bond)**। এই বন্ধন কতটা "মেরু (Polar)" হবে, তা নির্ভর করে দুই পরমাণুর ইলেকট্রোনেগেটিভিটির পার্থক্যের ওপর। উদাহরণস্বরূপ, পানির (H_2O) ক্ষেত্রে:

- অক্সিজেন হাইড্রোজেনের তুলনায় অনেক বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ।
- ফলে যৌথ ইলেকট্রনগুলো অক্সিজেনের দিকে বেশি সময় থাকে।
- এর ফলে অক্সিজেন পরমাণুর ওপর **আংশিক ঋণাত্মক আধান বা চার্জ (δ^-)** এবং হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর ওপর **আংশিক ধনাত্মক আধান বা চার্জ (δ^+)** তৈরি হয়।

এই বৈদ্যুতিক বিভাজনই পানিকে একটি **মেরু বা পোলার অণু (Polar Molecule)** করে তোলে, যা তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ **(চিত্র ৩.৩.৩)**। অন্যদিকে, মিথেন (CH_4)-এর ক্ষেত্রে কার্বন ও হাইড্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি প্রায় সমান, তাই এর বন্ধনগুলো প্রায় অমেরু (Nonpolar)। অর্থাৎ, তাদের ইলেকট্রনগুলো সমানভাবে ভাগ হয়।

আয়নিক এবং সমযোজী যৌগ গঠনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ইলেকট্রনের আচরণ। আয়নিক যৌগে, একটি পরমাণু ইলেকট্রন দান করে এবং অন্যটি গ্রহণ করে, ফলে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয়। অন্যদিকে, সমযোজী যৌগে পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে, যা সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। আয়নিক যৌগের

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশি, কিন্তু সমযোজী যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তুলনামূলকভাবে কম হয়।

চিত্র ৩.৩.৩: পানির অণুতে মেরু সমযোজী বন্ধন (Polar Covalent Bond)।

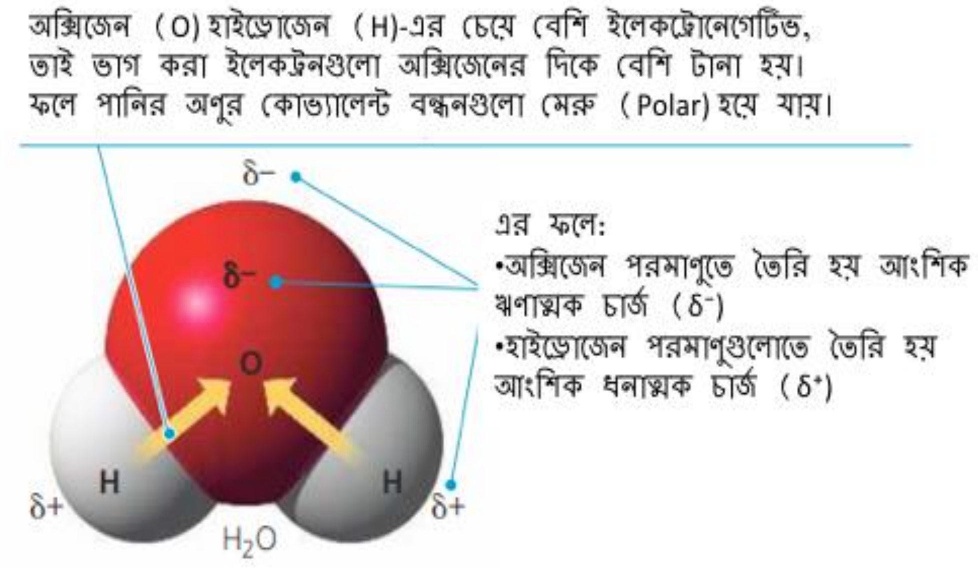

আয়নিক বন্ধন (Ionic Bonds)।

কিছু ক্ষেত্রে দুটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আকর্ষণের পার্থক্য এত বেশি হয় যে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুটি তার সঙ্গী পরমাণুর থেকে ইলেকট্রন সম্পূর্ণভাবে টেনে নেয়। এর ফলে বিপরীত চার্জযুক্ত দুটি পরমাণু (বা অণু) তৈরি হয়, যাদের বলা হয় **আয়ন (Ions)**। আয়ন দুই ধরনেরঃ

- ধনাত্মক আয়ন (Cation) = যে আয়ন ইলেকট্রন হারিয়েছে
- ঋণাত্মক আয়ন (Anion) = যে আয়ন ইলেকট্রন পেয়েছে

(সহজভাবে মনে রাখার উপায়: *Cation (ক্যাটায়ন)* -এর "t" চিহ্নটি প্লাস (+) এর মতো, আর *Anion (অ্যানায়ন)*-এর an or N মানে "Negative (নেগেটিভ) " অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়ন।)

বিপরীত চার্জ থাকার কারণে ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকেই বলে **আয়নিক বন্ধন (Ionic Bond)**। তবে মনে রাখতে হবে, ইলেকট্রন স্থানান্তর নিজে বন্ধন তৈরি করে না, বরং এটি দুটি বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে আয়নগুলোর মধ্যে বন্ধন গঠিত হয়। যেকোনো দুটি বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নের মধ্যে আয়নিক বন্ধন তৈরি হতে পারে, এমনকি যদি তারা একে অপরের কাছ থেকে সরাসরি ইলেকট্রন বিনিময় না করে থাকে (সমযোজী বন্ধনের মত ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে না)। উদাহরণ: **সোডিয়াম (Na)** ও **ক্লোরিন (Cl)** একটি সোডিয়াম (Na) পরমাণুর মোট **১১**টি ইলেকট্রন থাকে; এর তৃতীয় স্তরে একটি মাত্র ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে। ক্লোরিন (Cl) পরমাণুর মোট **১৭**টি ইলেকট্রন থাকে, যার মধ্যে ৭টি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। যখন এই দুটি পরমাণু কাছাকাছি আসে, সোডিয়ামের সেই একক ভ্যালেন্স ইলেকট্রনটি ক্লোরিনে স্থানান্তরিত হয়। ফলে উভয় পরমাণুর বাহ্যিক ইলেকট্রন স্তর পূর্ণ হয়।

এই স্থানান্তরের ফলে:

- সোডিয়াম (Na) এখন একটি ইলেকট্রন কমে যায় → এটি Na^+ (Cation) হয়
- ক্লোরিন (Cl) একটি ইলেকট্রন বেশি পায় → এটি Cl^- (Anion) হয়

এই বিপরীত চার্জের আকর্ষণ থেকেই তৈরি হয় NaCl, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ, **চিত্র ৩.৩.৪**)।

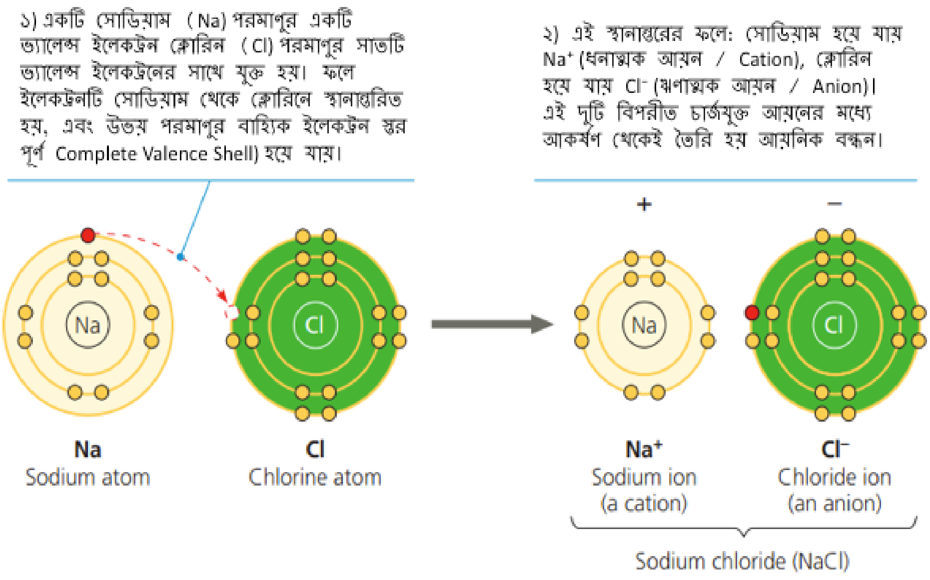

চিত্র ৩.৩.৪: ইলেকট্রন স্থানান্তর ও আয়নিক বন্ধন (Electron Transfer and Ionic Bonding)। বিপরীত চার্জযুক্ত পরমাণু বা আয়নের মধ্যে আকর্ষণ শক্তিকে বলে আয়নিক বন্ধন (Ionic Bond)। যেকোনো দুটি বিপরীত চার্জযুক্ত আয়নের মধ্যে আয়নিক বন্ধন তৈরি হতে পারে, এমনকি তারা একে অপরের কাছ থেকে সরাসরি ইলেকট্রন বিনিময় বা ভাগাভাগি না করলেও।

আয়নিক বন্ধনে গঠিত যৌগগুলোকে বলে আয়নিক যৌগ বা লবণ (Salts) (**চিত্র ৩.৩.৫**)। লবণ সাধারণত প্রকৃতিতে স্ফটিক আকারে (Crystals) পাওয়া যায়, যেখানে বিপুল সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়ন একসাথে ত্রিমাত্রিক বিন্যাসে (3D Lattice) যুক্ত থাকে। কোভ্যালেন্ট যৌগের মতো নির্দিষ্ট অণু সংখ্যা বা আকার এখানে থাকে না। NaCl সূত্রটি কেবল আয়নের অনুপাত নির্দেশ করে, কোনো একক অণু নয়। সব লবণে সমান সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক আয়ন থাকে না। যেমন, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$)-এ, এক ম্যাগনেসিয়াম আয়নের সাথে দুই ক্লোরাইড আয়ন যুক্ত থাকে। ম্যাগনেসিয়াম (Mg) দুটি ইলেকট্রন হারিয়ে Mg^{2+} হয়, আর প্রতিটি ক্লোরিন একটি করে ইলেকট্রন পেয়ে Cl^- হয়।

কিছু ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ অণু-ই চার্জ বহন করে, যাদেরকে জটিল আয়ন (Complex Ions) বলে, অর্থাৎ আয়ন অণু বা পরমাণু উভয়তেই হতে পারে। যেমন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)-এ:

- ঋণাত্মক আয়ন হলো একক Cl^- (-1)
- ধনাত্মক আয়ন হলো NH_4^+ (অ্যামোনিয়াম আয়ন) — যেখানে একটি নাইট্রোজেন চারটি হাইড্রোজেনের সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ধনে যুক্ত, কিন্তু পুরো গঠনটির চার্জ +1।

যৌগে আয়নিক বন্ধনের শক্তি পরিবেশের উপর নির্ভর করে। শুকনো স্ফটিকে আয়নিক বন্ধন খুব শক্তিশালী, যা ভাঙতে বা ফাটাতে হাতুড়ি প্রয়োজন হতে পারে। জলে দ্রবীভূত অবস্থায়, পানির অণু প্রতিটি আয়নকে আংশিকভাবে আচ্ছাদিত করে (Shield), ফলে এই

চিত্র ৩.৩.৫: সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) স্ফটিক। সোডিয়াম আয়ন (Na^+) এবং ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) আয়নিক বন্ধন দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। NaCl, এই রাসায়নিক সূত্রটি আমাদের জানায় যে, সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের অনুপাত ১:১। অর্থাৎ, প্রতিটি সোডিয়াম আয়নের জন্য একটি ক্লোরাইড আয়ন থাকে।

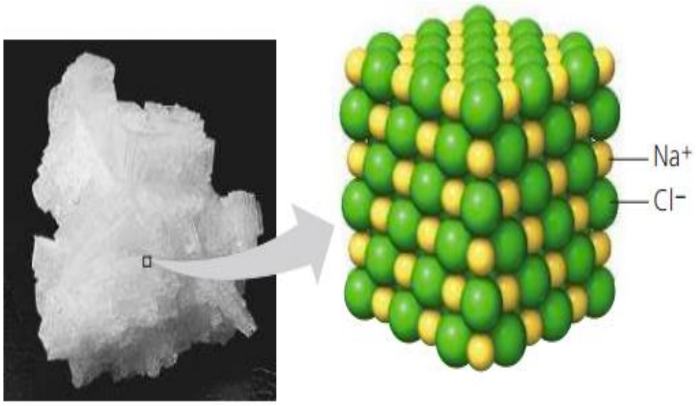

ক্ষেত্রে আয়নিক বন্ধন দুর্বল হয়। এই কারণেই বেশিরভাগ ঔষধ (drugs) লবণ আকারে তৈরি করা হয় যাতে শুকনো অবস্থায় ঔষধগুলো স্থিতিশীল থাকে, কিন্তু পানিতে সহজেই ভেঙে বা মিশে যায় (Dissociate)। *(পরে কিভাবে পানি লবণকে দ্রবীভূত করে তা আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।)*

দুর্বল রাসায়নিক বন্ধন (Weak Chemical Bonds)।

জীবদেহে সবচেয়ে শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধন হলো সমযোজী বন্ধন (Covalent Bonds), যা পরমাণুগুলোকে একসাথে বেঁধে **স্থিতিশীল (Stable)** অণু তৈরি করে।। যেসমস্ত অণু (Molecules) দিয়ে জীবের কোষ তৈরি হয় তার অধিকাংশই সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ। তবে কিছু অণুর মধ্যে একধরনের **দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া (Weak Interactions)** দেখা যায়, যা জীবের গঠন ও কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।।

অনেক বড় **জৈব অণু (Biological Molecules)** তাদের সঠিক বা কার্যকর আকারে (Functional Form) থাকে এই দুর্বল বন্ধনগুলোর কারণে। আবার, কোষের ভেতরে দুটি অণু যখন কাছাকাছি আসে, তখন তারা অল্প সময়ের জন্য দুর্বলভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই দুর্বল রাসায়নিক বন্ধনগুলো **(Weak Chemical Bonds)** সহজে তৈরি হয় ও ভেঙে যায়, ফলে অণুগুলো একে অপরকে প্রভাবিত করে পরে আবার আলাদা হয়ে যেতে পারে। জীবদেহে কয়েক ধরনের দুর্বল রাসায়নিক বন্ধন দেখা যায়, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একটি হলো জলে দ্রবীভূত আয়নের মধ্যে আয়নিক বন্ধন (Ionic Bond in Aqueous Solution), যা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি রয়েছে, **হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bonds)** এবং **ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ধন (Van Der Waals Interactions)**। এই দুর্বল বন্ধনগুলোই জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি তৈরি করে।

হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bonds): দুর্বল রাসায়নিক বন্ধনগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন জীবনের রসায়নে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটির উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়ার এবং আলোচনার প্রয়োজন আছে। যখন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু কোনো ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুর (যেমন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন) সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে, তখন হাইড্রোজেনের উপর আংশিক ধনাত্মক চার্জ (δ^+) তৈরি হয়। এই আংশিক ধনাত্মক চার্জের কারণে, সেই হাইড্রোজেন পরমাণু কাছাকাছি থাকা অন্য একটি ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুর আংশিক ঋণাত্মক চার্জ (δ^-) দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। এই ধরণের অ-সমযোজী আকর্ষণ (Non-Covalent Attraction), যেখানে হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় হাইড্রোজেন বন্ধন। জীবন্ত কোষে, হাইড্রোজেন বন্ধনের ইলেকট্রোনেগেটিভ অংশীদার সাধারণত অক্সিজেন (O) বা নাইট্রোজেন (N) পরমাণু হয়। **চিত্র ৩.৩.৬**-এ দেখানো হয়েছে কিভাবে পানি (H_2O) এবং অ্যামোনিয়া (NH_3) অণুর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয়।

চিত্র ৩.৩.৬: হাইড্রোজেন বন্ধন।

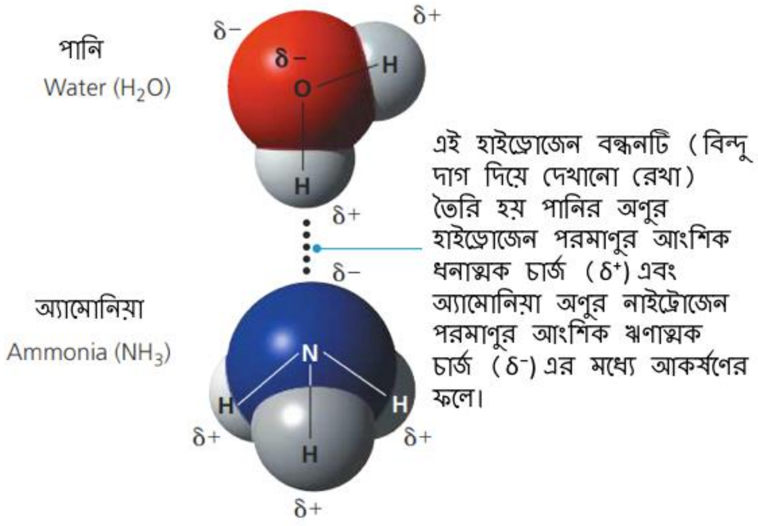

ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ধন (Van der Waals Bonds): যদিও কোনো অণুতে **অমেরু সমযোজী বন্ধন (Nonpolar Covalent Bonds)** থাকে, তবুও তার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ তৈরি হতে পারে। এর কারণ হলো, ইলেকট্রন সবসময় সমানভাবে বিতরণ হয় না; কোনো মুহূর্তে তারা অণুর এক অংশে বেশি জড়ো হতে পারে, আবার অন্য অংশে কম থাকতে পারে। এর ফলে অণুর মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের ক্ষুদ্র অঞ্চল তৈরি হয়, যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে পারে। এই চার্জের কারণে অণু ও পরমাণুগুলো একে অপরের প্রতি দুর্বলভাবে আকৃষ্ট হয়।
এই ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণগুলোকে বলে **ভ্যান ডার ওয়ালস মিথস্ক্রিয়া (Van der Waals Interactions)**।

প্রত্যেকটি ভ্যান ডার ওয়ালস মিথস্ক্রিয়ার ফলে তৈরি বন্ধন খুব দুর্বল এবং কেবল তখনই ঘটে যখন পরমাণু বা অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে। তবে যখন একসঙ্গে অনেকগুলো এমন বন্ধন তৈরি হয়, তখন সেগুলোর সম্মিলিত প্রভাব খুব শক্তিশালী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গেকো (Gecko) নামের টিকটিকি প্রজাতির প্রাণীটি দেয়াল বেয়ে সোজা ওপরে হাঁটতে পারে। এর পায়ের গঠন, বিশেষ করে প্রতিটি আঙুলে থাকা লক্ষাধিক সূক্ষ্ম লোম এবং তাদের অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রক্ষেপণ (Projections), দেয়ালের সঙ্গে সংস্পর্শের ক্ষেত্র (Surface Area) বাড়িয়ে তোলে **(চিত্র ৩.৩.৭)**। ফলে গেকোর পায়ের অণু ও দেয়ালের অণুর মধ্যে অসংখ্য ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ধন তৈরি হয়। এই বন্ধনগুলো একসঙ্গে এত শক্তিশালী হয় যে, তারা পুরো গেকোর শরীরের ওজন বহন করতে সক্ষম।

চিত্র ৩.৩.৭: গেকো (Gecko) নামের টিকটিকির পায়ের আঙুলে অসংখ্য ক্ষুদ্র লোম ও প্রক্ষেপণ থাকে, যা দেয়ালের সঙ্গে সংস্পর্শ করে দেয়ালের অণুর সাথে ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ধন তৈরি করে। ফলে সে পড়ে যায় না এবং সোজা দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে।

ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ধন (Van der Waals Bonds), হাইড্রোজেন বন্ধন, পানিতে থাকা আয়নিক বন্ধন এবং অন্যান্য দুর্বল আকর্ষণ কেবল দুটি পৃথক অণুর মধ্যে নয়, বরং একটি বড় অণুর ভেতরের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও তৈরি হতে পারে, যেমনঃ প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডে। এই সব দুর্বল আকর্ষণগুলোর সম্মিলিত প্রভাব একটি বড় অণুর ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional, 3D) গঠনকে স্থিতিশীল ও দৃঢ় রাখে। (পরবর্তীতে, এই দুর্বল বন্ধনগুলোর জীববৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।)

অণুর আকৃতি ও কাজ (Molecular Shape and Function)।

প্রতিটি অণুর একটি নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি থাকে, যা জীবিত কোষে তার কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, অণুটি কোষে কি কাজ করবে তা নির্ভর করে তার গঠনের উপর। যেমন, দুটি পরমাণু নিয়ে গঠিত অণুঃ H_2 বা O_2, সবসময় সোজা (Linear) হয়। কিন্তু দুইয়ের বেশি পরমাণু থাকলে অণুগুলোর আকৃতি আরও জটিল হয়। এই আকৃতি নির্ভর করে পরমাণুর অরবিটালের অবস্থান এর উপর **(চিত্র ৩.৩.৭)**। যখন একটি পরমাণু সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond) তৈরি করে, তখন তার বহিঃস্থ (Valence) অরবিটালগুলো পুনর্বিন্যাসিত হয়। যেসব

পরমাণুর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন s এবং p অরবিটাল উভয়েই থাকে, সেখানে একটিমাত্র s এবং তিনটি p অরবিটাল মিলে চারটি নতুন **সঙ্কর বা হাইব্রিড (Hybrid) অরবিটাল** তৈরি করে। এই অরবিটালগুলো দেখতে একই রকম অশ্রুবিন্দু (Teardrop) আকৃতির হয়, যা পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে চারদিকে প্রসারিত থাকে। এই চারটি অরবিটালের প্রান্তগুলোকে যদি রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়, তবে আমরা পাই একটি **চতুস্তলক (Tetrahedron)** আকৃতি বা একটি ত্রিভুজাকার পিরামিড।

পানির অণুতে (H_2O), অক্সিজেন পরমাণুর চারটি হাইব্রিড অরবিটালের মধ্যে দুটি হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে, আর দুটি অযোজিত (Lone pair) ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে। ফলস্বরূপ, পানির অণুটি V-আকৃতির হয়, যেখানে দুটি সমযোজী বন্ধনের মধ্যে কোণটি প্রায় 104.5°।

মিথেনের (CH_4) অণুটি সম্পূর্ণ একটি চতুস্তলক আকৃতির হয়, কারণ কার্বনের চারটি হাইব্রিড অরবিটালই চারটি হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ধন গঠন করে। চতুস্তলক কার্বন হলো একটি ত্রিমাত্রিক (3D) কাঠামো যেখানে একটি কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর সাথে চারটি অন্যান্য পরমাণু (যেমন, মিথেন যৌগে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু) চতুস্তলকীয়ভাবে (Tetrahedrally) যুক্ত থাকে। এই কাঠামোতে, কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুটি চতুস্তলকের কেন্দ্রে থাকে এবং অন্য চারটি পরমাণু চতুস্তলকের চারটি শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত থাকে। যেসব বড় অণুতে অনেকগুলো কার্বন থাকে (যেমন, জীবদেহের প্রধান অণুগুলোঃ আমিষ, শর্করা, ইত্যাদি), সেগুলোর আকৃতি আরও জটিল। তবে, তাদের গঠনে বা কাঠামোতে চারটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত কার্বনের চতুর্মুখ আকৃতির প্রায়ই পুনরাবৃত্ত দেখা যায়।

চিত্র ৩.৩.৮: হাইব্রিড অরবিটাল (Hybrid Orbitals) দ্বারা অণুর আকৃতি গঠন।

(ক) সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণকারী একটি পরমাণুর

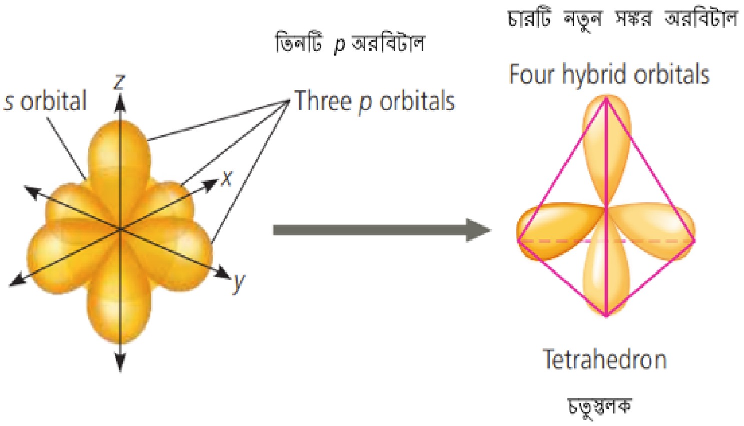

ভ্যালেন্স শেলের (Valence Shell) একক s অরবিটাল এবং তিনটি p অরবিটাল একত্রে মিশে চারটি নতুন হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি করে।

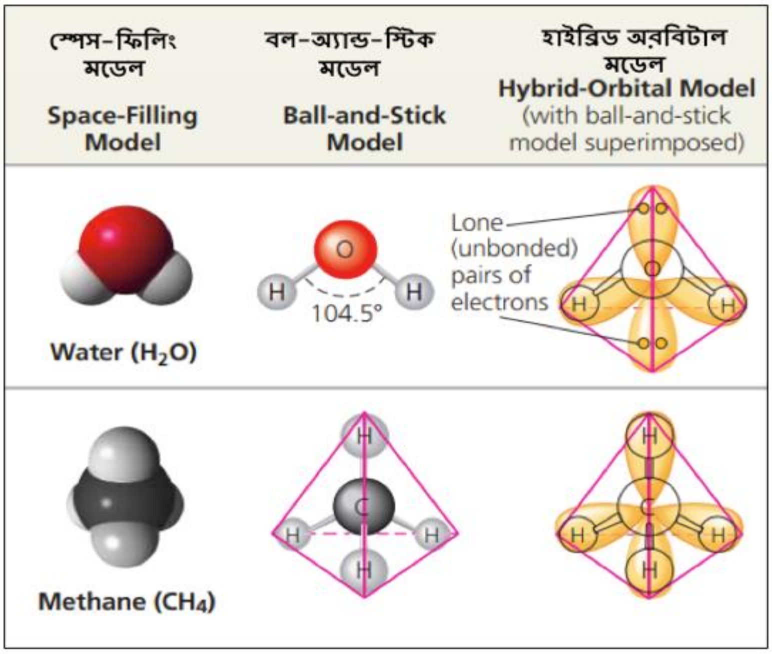

(খ) অণুর আকৃতির মডেল (Molecular-shape models): পানির (H_2O) এবং মিথেনের (CH_4) অণুর জন্য তিনটি ভিন্ন মডেল দেখানো হয়েছে, যা তাদের আকৃতি প্রদর্শন করে। পরমাণুর হাইব্রিড

অরবিটালগুলোর অবস্থানই নির্ধারণ করে অণুর সামগ্রিক আকৃতি কেমন হবে। এই হাইব্রিড অরবিটালগুলো দেখতে জলবিন্দু বা অশ্রুবিন্দুর মতো (teardrop-shaped) হয় এবং তারা একটি কাল্পনিক টেট্রাহেড্রনের (tetrahedron) চার কোণে প্রসারিত থাকে (চিত্রে গোলাপি রেখায় দেখানো হয়েছে)।

অণুর গঠন ও আকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নির্ধারণ করে শরীরের বিভিন্ন কাজে জৈব অণুগুলো কীভাবে একে অপরকে চিনবে ও প্রতিক্রিয়া করবে। জৈব অণুগুলো প্রায়ই দুর্বল পারস্পরিক আকর্ষণের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, কিন্তু এটি কেবল তখনই ঘটে যখন তাদের আকৃতি পরস্পরের সঙ্গে মানানসই বা একে অপরের পরিপূরক (Complementary) হয়। উদাহরণ হিসেবে মরফিন ও হেরোইন (Opiates) জাতীয় ওষুধের প্রভাব দেখা যায়, যেগুলো অপিয়াম থেকে তৈরি। এই ওষুধগুলো ব্যথা কমায় এবং শান্তি দেয়, কারণ তারা মস্তিষ্কের কোষের পৃষ্ঠে থাকা নির্দিষ্ট জৈব অণুর সঙ্গে দুর্বলভাবে যুক্ত হয়। কোষের পৃষ্ঠে বা ভিতরে থাকা এই বিশেষ জৈব অণু যা নির্দিষ্ট সংকেত বা পদার্থের সাথে আবদ্ধ হয়, তাদেরকে বলা হয় **গ্রাহক অণু বা রিসেপ্টরের (Receptor)**। রিসেপ্টর কোষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। অর্থাৎ, এরা কোষকে পরিবেশের পরিবর্তন সনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দিতে সাহায্য করে।

তাহলে প্রশ্ন হলো, মস্তিষ্কে এমন রিসেপ্টর কেন আছে যা শরীরের ভিতরে থাকে না এমন ধরনের বাহ্যিক (Non-endogenous) পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ১৯৭৫ সালে পাওয়া যায়, যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এনডোরফিন (Endorphin) নামের পদার্থ, যা পিউষ বা পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland) দ্বারা তৈরি এক ধরনের সংকেত অণু (Signaling Molecule)। পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland) হলো মস্তিষ্কের নিচে অবস্থিত একটি ছোট গ্রন্থি, যা শরীরের বিভিন্ন হরমোনজাতীয় পদার্থ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।এটিকে 'প্রভু গ্রন্থি' (Master Gland) বলা হয় কারণ এটি অন্যান্য গ্রন্থির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৃদ্ধি, বিপাক, প্রজনন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এনডোরফিন ও অপিয়েটের আকৃতি প্রায় একই রকম, তাই তারা একই রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, এবং এজন্য তাদের প্রভাবও একরকম। অতিরিক্ত ব্যায়াম বা মানসিক চাপের সময়, শরীরে এনডোরফিনের নিঃসরণ হয়, যা ব্যথা কমায় এবং আনন্দ বা প্রশান্তি সৃষ্টি করে। অপিয়েটের গঠন অনেকটা এনডোরফিনেরমত হওয়াতে এটিও এনডোরফিনের রিসেপ্টরে বাঁধতে পারে এবং একই রকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে **(চিত্র ৩.৩.৯)**। এই উদাহরণটি দেখায় যে, জৈব অণুর গঠন (Structure)

চিত্র ৩.৩.৯: একটি আণবিক অনুকারক (Molecular Mimic)। মরফিন (Morphine) মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক এনডোরফিন (Endorphin)-এর মতো কাজ করে, যার ফলে এটি ব্যথা অনুভূতি ও মানসিক অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে।

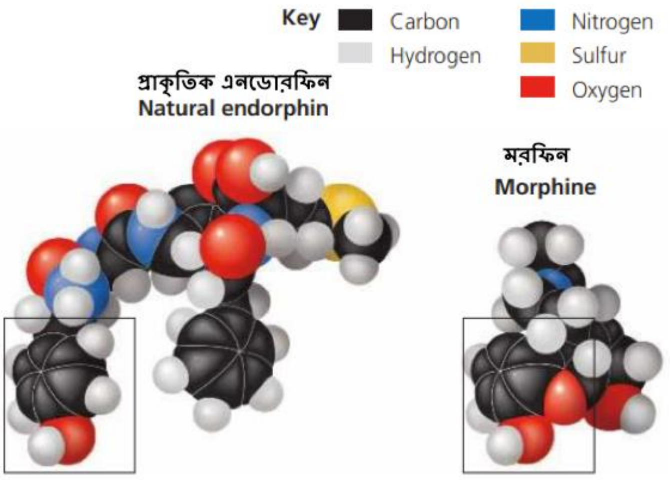

(ক) এনডোরফিন ও মরফিনের গঠন: বাম দিকের চিত্রে থাকা এনডোরফিন অণুর বক্স করা অংশটি মস্তিষ্কের কোষের রিসেপ্টর অণুর

ও কার্যকারিতা (Function) এর মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জৈব অণুর গঠন তার কাজকে নির্ধারণ করে - এটি জীববিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক ধারণা এবং একীকরণকারী বা একীভূতকারী মূলনীতি (Unifying Theme, ইউনিফাইইং থিম)। জীবের এই বিশাল জগৎকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা কিছু মূল ধারণা বা থিম (Themes) নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো সব জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে "একীকরণকারী মূলনীতি" (Unifying Themes) বলা হয়, কারণ এগুলো জীবনের সব স্তরকে একটি সাধারণ ভিত্তিতে যুক্ত করে একসাথে জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে। পূর্বে, অধ্যায় ১-এ জীববিজ্ঞানের অন্যান্য একীকরণকারী মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছিল।

সঙ্গে যুক্ত হয়। ডান দিকের চিত্রে থাকা মরফিন অণুর বক্স করা অংশটি আকার ও গঠনে প্রায় একই রকম, অর্থাৎ এটি এনডোরফিনের গঠনকে অনুকরণ করে (Mimic)।

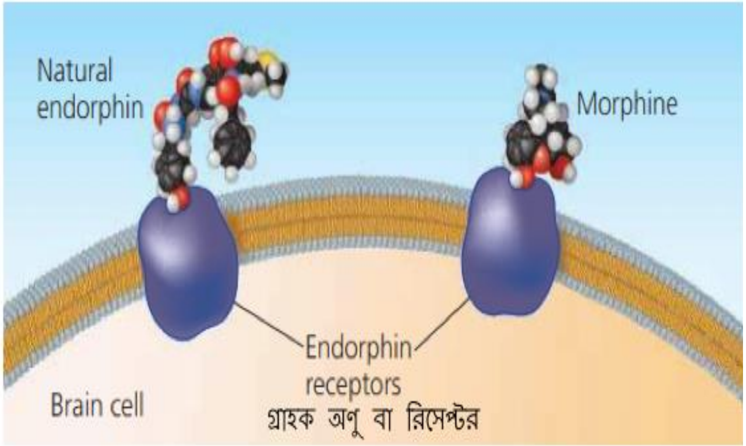

(খ) এনডোরফিন রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া: এনডোরফিন ও মরফিন, উভয়ই মস্তিষ্কের কোষের পৃষ্ঠে অবস্থিত এন্ডোরফিন রিসেপ্টর-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই কারণেই মরফিন শরীরে এন্ডোরফিনের মতোই প্রভাব সৃষ্টি করে — যেমন ব্যথা কমানো ও প্রশান্তির অনুভূতি।

৩.৪ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি ও ভাঙন হয়।

রাসায়নিক বন্ধন তৈরি ও ভাঙার মাধ্যমে পদার্থের গঠন পরিবর্তিত হয়। আর নতুন পদার্থ গঠনের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction)**। অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়া হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পদার্থের অণু একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থের অণুতে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) অণুর বিক্রিয়ায় পানির (H_2O) অণু তৈরি হয় **(চিত্র ৩.৪.১)**।

পানি তৈরির বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পুরনো সমযোজী বন্ধন ভেঙে যায়, এবং নতুন বন্ধন তৈরি হয়ে পানি গঠন করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলোকে **বিকারক বা বিক্রিয়ক পদার্থ** (Reactants) বলা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার

চিত্র ৩.৪.১: পানি তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়া।

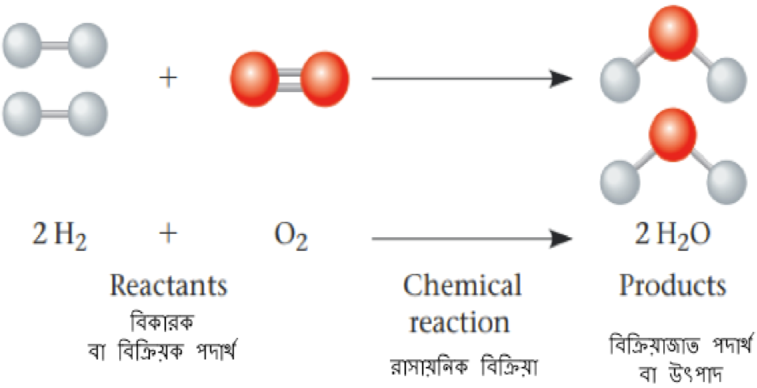

ফলে নতুন যেসব পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের

বিক্রিয়াজাত পদার্থ বা উৎপাদ (Products) বলা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়ক পরমাণুগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান বা ভাগাভাগির ফলে হয়ে থাকে। পদার্থের পরমাণুগুলোর নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন হলে তাকে সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয় না। যখন আমরা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখি, তখন একটি তীরচিহ্ন (→) ব্যবহার করি যা দেখায় বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ তৈরি হচ্ছে। অণুর সামনের সংখ্যা বা Coefficient দ্বারা জানানো হয় কতটি অণু বিক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। যেমন, $2H_2$ মানে দুটি হাইড্রোজেন অণু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। মনে রাখতে হবে, বিক্রিয়ার আগে ও পরে সব পরমাণুর হিসাব মিলতে হবে, কারণ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু সৃষ্টি বা বিনষ্ট হয় না, কেবল পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর বিন্যাস পরিবর্তিত হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)। এটি একটি জৈব প্রক্রিয়া যা সবুজ উদ্ভিদের কোষে ঘটে **(চিত্র ৩.৪.২)**। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা পরোক্ষভাবে এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে খাদ্য ও অক্সিজেনের জন্য।

সালোকসংশ্লেষণে উদ্ভিদ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও মাটি থেকে পানি (H_2O) গ্রহণ করে। সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করে এগুলোকে গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$, চিনি বা শর্করা) ও অক্সিজেন (O_2)-এ রূপান্তরিত করে। জলজ উদ্ভিদ যখন সালোকসংশ্লেষণ করে, তখন তারা অক্সিজেন গ্যাসকে একটি পার্শ্ব-উৎপাদ (By-product) হিসেবে নির্গত করে। এই অক্সিজেন গ্যাসটি পানির মধ্যে ছোট ছোট বুদবুদের আকারে দেখা যায় **(চিত্র ৩.৪.৩)**। সালোকসংশ্লেষণ

চিত্র ৩.৪.২: সালোকসংশ্লেষণের সরল সমীকরণ।

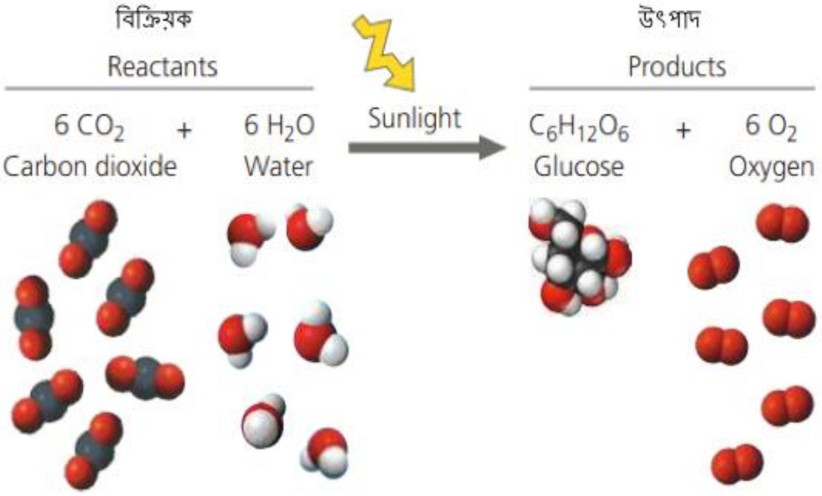

বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু হারায় না বা সৃষ্টি হয় না; শুধু নতুনভাবে বিন্যস্ত হয় সূর্যালোকের শক্তি দিয়ে।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার পশ্চাৎ বা বিপরীতমুখিতা (Reversibility)

সব রাসায়নিক বিক্রিয়া তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) উল্টোদিকে ঘটতে পারে। অর্থাৎ, সামনের বিক্রিয়ার উৎপাদগুলো (Products) আবার পিছনের বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক (Reactants) হতে পারে।

উদাহরণ:

$$3\ H_2 + N_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$$

অ্যামোনিয়া তৈরির এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণে দুই দিকের তীরচিহ্ন (⇌) দেখায় যে বিক্রিয়াটি উল্টোপথে ঘটতে পারে, অর্থাৎ এটি একটি **উভমুখী বিক্রিয়া (Reversible reaction)**। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়, আবার উৎপাদ পদার্থগুলো বিক্রিয়া করে পুনরায় বিক্রিয়কে পরিণত হয়, তাকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে। বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ হওয়ার বিক্রিয়া হলো সম্মুখমুখী বিক্রিয়া (→) । উৎপাদ থেকে বিক্রিয়কে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়া হলো পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া/ বিপরীতমুখী বিক্রিয়া (←)। অ্যামোনিয়া তৈরির বিক্রিয়াতে **সম্মুখমুখী বিক্রিয়া (Forward reaction)**

চিত্র ৩.৪.৩: সালোকসংশ্লেষণ: সূর্যালোক-নির্ভর পদার্থ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। এলোডিয়া (Elodea) একটি স্বাদুপানির উদ্ভিদ, যা সালোকসংশ্লেষণ নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং পানির (H_2O)-এর পরমাণুগুলোকে পুনর্গঠন করে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি সূর্যালোকের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। উৎপন্ন গ্লুকোজ পরে বিভিন্ন খাদ্য অণুতে (Food molecules) রূপান্তরিত হয়। অক্সিজেন গ্যাস (O_2) সালোকসংশ্লেষণের একটি পার্শ্ব-উৎপাদ (By-product); পানিতে নিমজ্জিত পাতাগুলো থেকে নির্গত অক্সিজেনের ছোট ছোট বুদবুদগুলো চিত্রে দেখানো হয়েছে।

হলো: নাইট্রোজেন (N_2) ও হাইড্রোজেন (H_2) মিলে অ্যামোনিয়া (NH_3) তৈরি করা। আর **বিপরীতমুখী বিক্রিয়া (Reverse reaction)** হলো: তৈরি হওয়া অ্যামোনিয়া আবার ভেঙে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন তৈরি করা। সব বিক্রিয়াই সাধারণত উভমুখী, তবে কিছু বিক্রিয়ায় সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ায় হার এত কম থাকে, যে বিক্রিয়াকে একমুখী মনে হয়।

রাসায়নিক ভারসাম্য (Chemical Equilibrium)।

যখন সম্মুখমুখী ও পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া, অর্থাৎ সামনের ও পিছনের বিক্রিয়া সমান হারে ঘটে, তখন সেই অবস্থাকে বলে রাসায়নিক ভারসাম্য (Chemical Equilibrium)। এই অবস্থায় বিক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু বিক্রিয়ক ও উৎপাদের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ভারসাম্য মানে এই নয় যে বিক্রিয়ক বা উৎপাদ উভয়ের পরিমাণ বা ঘনমাত্রা (Concentration) সমান, বরং তারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থিতিশীল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যামোনিয়া গঠনের বিক্রিয়ায়, অ্যামোনিয়া যত দ্রুত তৈরি হয়, তত দ্রুতই ভেঙেও যায়। ফলে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু আসলে দুই দিকের বিক্রিয়া চলছেই, শুধু সমান হারে। যখন দুই দিকের বিক্রিয়ার গতি সমান হয়ে যায়, তখন বিক্রিয়াটি রাসায়নিক ভারসাম্যে পৌঁছে। সহজভাবে বোঝার জন্য এই উদাহরণটি ধরা যাক। কেউ একটি বড় বালতি থেকে মগে করে পানিকে অন্য একটি বালতিতে ঢালছে, আর একইসঙ্গে দ্বিতীয় বালতি থেকে আরেকজন একই মাপের আরেকটি মগে করে পানি আবার প্রথম বালতিতে ঢালছে। এখন যেহেতু দুই বালতিতেই সমান হারে পানি ঢালা হচ্ছে, তাই দুই বালতিতে পানির স্তর অপরিবর্তিত থাকবে এবং বালতি দুটোতে পানির ভারসাম্য বজায় থাকবে, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভারসাম্যের মতো অবস্থা। কিছু বিক্রিয়ায় ভারসাম্য এমনভাবে ডানদিকে সরে যায় যে প্রায় সব বিক্রিয়কই উৎপাদে রূপান্তরিত হয়। আমরা জীববিজ্ঞানের পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অণুর গঠন ও বিক্রিয়া নিয়ে আরও বিস্তারিত জানব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব পানি (H_2O) সম্পর্কে, যে পদার্থের মধ্যে জীবদেহের সব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

অনুশীলনী ৩

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। টেবিল লবণ কীভাবে উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) প্রদর্শন করে তা ব্যাখ্যা করো।

২। ট্রেস উপাদান (Trace Element) কি অপরিহার্য উপাদান? ব্যাখ্যা করো।

৩। মানুষের শরীরে আয়রন একটি ট্রেস উপাদান, যা রক্তের লোহিত কণিকায় অক্সিজেন বহনকারী হিমোগ্লোবিনের সঠিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয়। আয়রনের ঘাটতি হলে কী প্রভাব পড়তে পারে?

৪। সার্পেন্টাইন মাটিতে সহনশীল প্রজাতির বিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা কীভাবে কাজ করেছে তা ব্যাখ্যা করো।

৫। ভর সংখ্যা (Mass Number) কী?

৬। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুতে ৭টি প্রোটন থাকে, এবং সাধারণত এতে ৭টি নিউট্রন থাকে। একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে ৮টি নিউট্রন রয়েছে। এই তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা রাসায়নিক প্রতীকে লেখো।

৭। ফ্লোরিনে (F) কয়টি ইলেকট্রন আছে? কয়টি শেল বা শক্তিস্তর (electron shell) আছে? কোন কোন অরবিটালে ইলেকট্রন থাকে? এবং ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে কয়টি ইলেকট্রন প্রয়োজন?

৮। পর্যায় সারণিতে যদি দুই বা ততোধিক উপাদান একই সারিতে থাকে, তবে তাদের মধ্যে কী মিল রয়েছে? আর যদি তারা একই কলামে থাকে, তবে তাদের মধ্যে কী মিল রয়েছে?

৯। H–C≡C–H গঠনটি রাসায়নিকভাবে কেন সঠিক নয়?

১০। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) স্ফটিকে কোন বন্ধন পরমাণুগুলোকে একসাথে ধরে রাখে?

১১। তুমি যদি একজন ওষুধ গবেষক হও, তবে প্রাকৃতিকভাবে শরীরেতৈরি বিভিন্ন সংকেত অণুগুলোর ত্রিমাত্রিক গঠন জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে?

১২। রাসায়নিক ভারসাম্য বা সমতাবস্থায় (Equilibrium) কোন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত ঘটে—বিক্রিয়ক থেকে উৎপন্ন পদার্থ তৈরি হয়, নাকি উৎপন্ন পদার্থ থেকে বিক্রিয়ক গঠিত হয়?

১৩। একটি সমীকরণ লেখো যেখানে সালোকসংশ্লেষণের উৎপন্ন পদার্থগুলো বিক্রিয়ক হিসেবে এবং বিক্রিয়কগুলো উৎপন্ন পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এতে শক্তিকেও একটি উৎপন্ন পদার্থ হিসেবে যুক্ত করো। এই নতুন সমীকরণটি তোমার কোষে ঘটে এমন একটি প্রক্রিয়াকে প্রকাশ করে। সমীকরণটি কথায় ব্যাখ্যা করো এবং এটি কীভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত তা বোঝাও।

১৪। যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ভারসাম্যে পৌঁছালে সেটিকে কীভাবে বোঝানো যায়?

১৫। সালফারের (S) পারমাণবিক সংখ্যা ১৬। এটি হাইড্রোজেনের সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড নামের একটি যৌগ তৈরি করে। সালফার পরমাণুর ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের সংখ্যা বিবেচনা করে যৌগটির আণবিক সূত্র অনুমান করো।

১৬। নিচে দেওয়া কাল্পনিক অণুগুলোর জন্য প্রতিটি পরমাণুর সঠিক সংখ্যক ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ব্যবহার করে লুইস ডট গঠন আঁকো। কোন অণুটি যৌক্তিক (প্রতিটি পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ এবং বন্ধনে সঠিক সংখ্যক ইলেকট্রন রয়েছে) তা নির্ধারণ করো। অপর অণুটি কেন অযৌক্তিক তা ব্যাখ্যা করো, এক্ষেত্রে প্রতিটি পরমাণু কতটি বন্ধন তৈরি করতে পারে তা বিবেচনা করো।

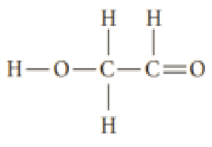

ক

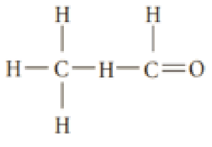

খ

১৭। এই বোমবার্ডিয়ার বিটলটি (Bombardier Beetle) তার শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ফুটন্ত গরম তরল ছুড়ে দেয়, যাতে জ্বালাতনকর বা দাহজনক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। বিটলটি এই রাসায়নিক পদার্থ দুটি আলাদা গ্রন্থিতে সংরক্ষণ করে। এই অধ্যায়ে শেখা রাসায়নিক ধারণা ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করোঃ কেন বিটলটি নিজে সংরক্ষিত রাসায়নিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কীভাবে এই বিস্ফোরণধর্মী পদার্থ তৈরি হয় এবং এর নির্গমন ঘটে।

১৮। মানুষের শরীরে উপস্থিত প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া উপাদানগুলোর শতকরা হার অন্যান্য জীবের মধ্যেও প্রায় একই রকম। জীবগুলোর মধ্যে এই মিল কীভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

১৯। লুনা নামের স্ত্রী প্রজাপতি (*Actias luna*) বাতাসে রাসায়নিক সংকেত নির্গত করে পুরুষ প্রজাপতিকে আকর্ষণ করে। কয়েক শত মিটার দূরে থাকা পুরুষ প্রজাপতিও এই অণুগুলো শনাক্ত করে উৎসের দিকে উড়ে আসে। এই আচরণের জন্য দায়ী সংবেদন অঙ্গ হলো ছবিতে দেখা চিরুনি আকৃতির শুঁয়ো (Antennae)। প্রতিটি শুঁয়োর সূক্ষ্ম অংশে হাজার হাজার গ্রাহী কোষ থাকে, যা যৌন আকর্ষণকারী অণুগুলো শনাক্ত করে। এই অধ্যায় থেকে যা শিখেছো, তার ভিত্তিতে এমন একটি অনুকল্প (Hypothesis) দাও যা ব্যাখ্যা করবে কীভাবে পুরুষ প্রজাপতি বাতাসে থাকা বহু অণুর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি অণু শনাক্ত করতে পারে। তোমার অনুকল্পটি যাচাই করার জন্য অন্তত একটি পরীক্ষার নকশা (Experimental Design) বা পরিকল্পনা তৈরি করো।

২০। ধর কেউ একজন তোমাকে এই বক্তব্য শুনালো: “শিল্প বা কৃষি থেকে আসা রাসায়নিক বর্জ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণের বিষয়ে চিন্তা করা অযৌক্তিক ও অজ্ঞতা, কারণ এই পদার্থগুলোও তো সেই একই পরমাণু দিয়ে গঠিত, যা আগে থেকেই আমাদের পরিবেশে ছিল।” ইলেকট্রন বণ্টন, বন্ধন, এবং উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ব্যবহার করে ১০০-১৫০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো, যেখানে তুমি এই যুক্তির প্রতিবাদ করবে এবং একে ভুল প্রমাণ করবে।

অধ্যায় ৪

পানি এবং জীবন।

(Water and Life)

এই অধ্যায়ের মূল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

৪.১ পানিঃ জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য (Vital) যৌগ।

৪.২ পানির অণুতে মেরু সমযোজী (Polar Covalent) বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি করে।

৪.৩ পানির চারটি উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) পৃথিবীতে জীবনের উপযোগিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪.৪ পানির অম্লীয় (Acidic) ও ক্ষারীয় (Basic) অবস্থা জীবের শারীরিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে।

চিত্র ৪.১: রিংড সিল (*Phoca hispida*) বরফের উপর নির্ভর করে মাছ শিকার করার জন্য। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যখন আর্কটিকের বরফ গলে যায়, তখন এই ভাসমান বরফের উপর, নিচে, ও আশেপাশে বসবাসকারী প্রজাতিগুলো হুমকির মুখে পড়ে।

পানির গঠন কীভাবে এর কঠিন রূপ (বরফ)-কে তরল পানির উপর ভাসতে সাহায্য করে?

পানি (H_2O) একটি মেরু অণু (Polar Molecule): অণুর এক প্রান্তে অক্সিজেন (O) ইলেকট্রনগুলো নিজের দিকে টানার কারণে আংশিক ঋণাত্মক (Partial Negative) চার্জ ধারণ করে।
অন্য প্রান্তে হাইড্রোজেন (H) পরমাণুগুলোর আংশিক ধনাত্মক (Partial Positive) চার্জ থাকে।

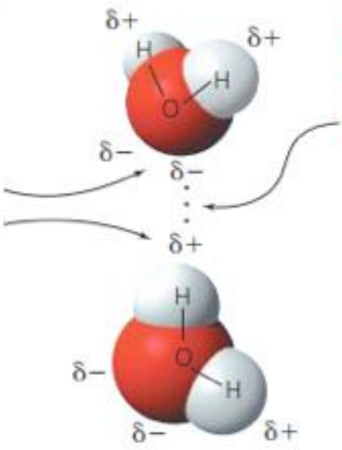

বিপরীত চার্জযুক্ত অংশগুলোর মধ্যে দুর্বল আকর্ষণ, যাকে **হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bond)** বলা হয়, পানির অণুগুলিকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

তরল পানিতে, এই হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো **অবিরতভাবে (Constantly) ভাঙে ও পুনরায় তৈরি হয়**, ফলে অণুগুলো **পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে।**

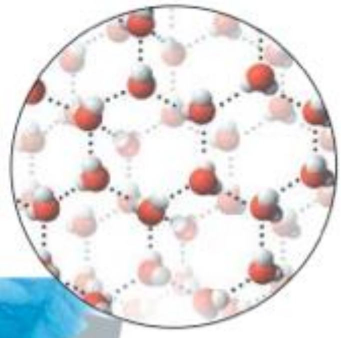

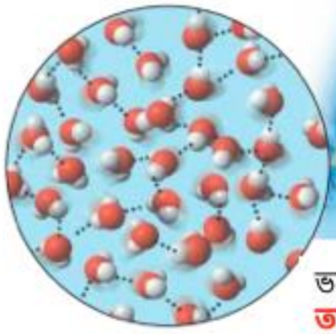

অন্যদিকে, **বরফে**, হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো **স্থিতিশীল থাকে**, যার ফলে পানির অণুগুলো **একটু দূরে অবস্থান করে**। এজন্যই বরফের **ঘনত্ব (Density)** তরল পানির চেয়ে **কম**, এবং **বরফ পানির উপর ভেসে থাকে।**

ভাসমান বরফ নিচের পানির জন্য **তাপরোধক (Insulator)** হিসেবে কাজ করে, যা **জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**। পানির এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, এর আরও অনেক গুণ রয়েছে যা **জীবন ধারণে সহায়ক।**

৪.১ পানিঃ জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য (Vital) যৌগ।

সবচেয়ে সাধারণ অণুগুলোর মধ্যে, কেবল পানিই এমন একটি পদার্থ যা তুলনামূলকভাবে নিম্ন তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অংশ তরল পানিতে আচ্ছাদিত (**চিত্র ৪.১.১**)। জীবনের শুরুতে পানি এমন একটি মাধ্যম (Medium) হিসেবে কাজ করেছিল, যেখানে অন্যান্য অণুগুলো স্বাধীনভাবে পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারত, শক্তিশালী সমযোজী বা আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই। ধারণা করা হয়, জীবন প্রথমে পানির মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল এবং প্রায় দুই বিলিয়ন বছর ধরে জলজ পরিবেশেই বিবর্তিত হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে স্থলে বিস্তৃত হয়েছে। আজও জীবন সম্পূর্ণভাবে পানির ওপর নির্ভরশীল। যেকোনো জীবের শরীরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অংশ পানি দিয়ে গঠিত, এবং সব জীবের বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্য পানি-সমৃদ্ধ পরিবেশের প্রয়োজন হয়; তা শরীরের ভেতরে হোক বা বাইরে। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে গ্রীষ্মপ্রধান বা ক্রান্তীয় ঘনবর্ষণ বনাঞ্চলে (Tropical Rainforest) জীবনের প্রাচুর্য দেখা যায়, আর শুষ্ক মরুভূমি প্রায় প্রাণহীন মনে হয়। সাধারণত মরুভূমিতে তখনই জীবনের চিহ্ন দেখা দেয়, যখন সেখানে বৃষ্টি হয়ে পানি অনেক বৃদ্ধি পায়।

ক) কঠিন (Solid) খ) তরল (Liquid) গ) বায়বীয় (Gas)

চিত্র ৪.১.১: পানির বিভিন্ন রূপ। (ক) যখন পানির তাপমাত্রা ০°C-এর নিচে নেমে যায়, তখন এটি সুন্দর স্ফটিক (Crystal) আকারে জমে যায়, যা আমরা তুষার (Snow) ও বরফ (Ice) নামে চিনি। (খ) তাপমাত্রা ০°C-এর উপরে উঠলে, বরফ গলে তরল পানিতে পরিণত হয়। (গ) তাপমাত্রা ১০০°C-এর উপরে বাড়লে, তরল পানি বাষ্পে (steam) পরিণত হয়, যেমনঃ আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের (Yellowstone National Park) উষ্ণ প্রস্রবণে (Spring) দেখা যায়।

৪.২ পানির অণুতে থাকা মেরু সমযোজী বন্ধন (Polar Covalent Bond) হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি করে।

পানি আমাদের কাছে এতটাই পরিচিত যে, এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক সময় আমরা খেয়ালই করি না। পানির এই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো এর অণুর গঠন ও অণুগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল, যা উদ্ভূত বৈশিষ্ট্যের (Emergent Properties) একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পানির অণুটির রাসায়নিক সংকেত দেখতে সহজ মনে হলেও, এর গঠন আসলে বিশেষ ধরনের। এটি একটি প্রশস্ত V-আকৃতির (Wide V-shaped) অণু, যেখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে একক সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে। অক্সিজেন হাইড্রোজেনের তুলনায় বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ (Electronegative), ফলে কোভ্যালেন্ট বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো অক্সিজেনের দিকে বেশি সময় ব্যয় করে। এই অসম ইলেকট্রন ভাগাভাগির কারণে পানির বন্ধনগুলো **মেরু সমযোজী বন্ধন (Polar Covalent Bonds)** এবং পানির অণু একটি **মেরু অণু (Polar Molecule)**। অর্থাৎ, পানির মোট চার্জ তার অণুতে সমানভাবে বিতরণ করা নয়। আর এই কারণে, পানির

অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক চার্জ (δ^-) বহন করে, আর তার দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক চার্জ (δ^+) বহন করে। এক অণুর আংশিক ধনাত্মক হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য অণুর আংশিক ঋণাত্মক অক্সিজেন পরমাণুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে পানির দুইটি অণু হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় (**চিত্র ৪.২.১**)। পানির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয় তার অণুগুলোর মধ্যে এই হাইড্রোজেন বন্ধন, অর্থাৎ বিপরীত চার্জযুক্ত অংশগুলোর মধ্যকার আকর্ষণ শক্তি থেকে।

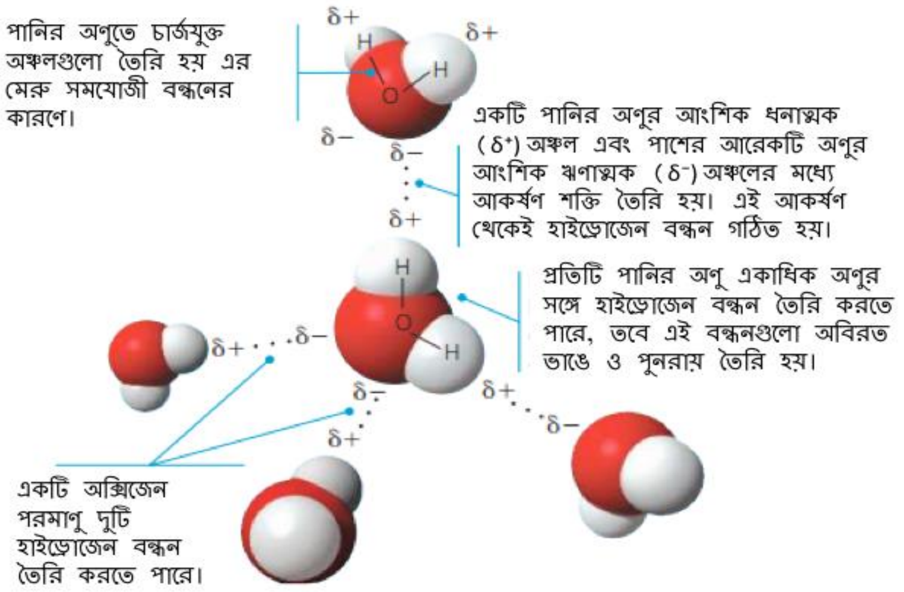

চিত্র ৪.২.১: পানির অণুগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন।

তরল অবস্থায় এই হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো অত্যন্ত দুর্বল; অণুগুলোর মধ্যকার প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন বন্ধন সমযোজী বন্ধনের প্রায় ১/২০ অংশ শক্তিশালী। এগুলো অবিরতভাবে গঠিত হয়, ভাঙে, এবং পুনরায় গঠিত হয়। প্রতিটি বন্ধন মাত্র এক সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ($১/১০^{১২}$) ভাগ থেকে অল্প কিছু বেশী সময় টিকে থাকে, কিন্তু পানি অণুগুলো অবিরামভাবে নতুন নতুন হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে। ফলে বলা যায়, যে কোনো একটি মুহূর্তে, অধিকাংশ পানির অণুই একে অপরের সঙ্গে, অর্থাৎ প্রতিবেশী অণুগুলোর সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত থাকে। পানির মধ্যে থাকা এই মেরু (Polar) হাইড্রোজেন বন্ধনই অণুগুলোকে একটি উচ্চতর গঠনগত বিন্যাসে (Higher Level of Structural Order) সংগঠিত করে এবং এর ফলে পানির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমনঃ সুনির্দিষ্ট তাপ ধারণ ক্ষমতা (Specific Heat Capacity), পৃষ্ঠটান (Surface Tension), ও পানিতে বরফের ভাসমানতা, উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন বন্ধন শুধুমাত্র পানির অণুতেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো অণুতে হাইড্রোজেন (H) যদি ইলেকট্রোনেগেটিভ পরমাণুর (সাধারণত অক্সিজেন (O) বা নাইট্রোজেন (N)) সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে সেটিও হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করতে পারে। যদিও একটি হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধনের মাত্র ৫–১০% সমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাইড্রোজেন বন্ধন কোষের ডিএনএ (DNA) এবং প্রোটিনের (Protein) গঠন বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কারণে আরও বলা যায়, হাইড্রোজেন বন্ধন জীবিত ব্যবস্থার (Living System) সংগঠন (Organization) ও স্থিতিশীলতার (Stability) মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৪.৩ পানির চারটি বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে জীবনের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।

পৃথিবীতে জীবন টিকে থাকার জন্য জল বা পানির চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent Properties) আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ পানির অণুগুলোর একসাথে লেগে থাকার বা সংসক্তির

প্রবণতা (Cohesion), তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Ability to moderate temperature), বরফ অবস্থায় আয়তনে বেড়ে যাওয়া বা প্রসারণ (Expansion), এবং বহুমুখী দ্রাবক (Versatile Solvent) হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা, অর্থাৎ পানি বিভিন্ন ধরনের পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পাড়ার সামর্থ্য।

পানি হচ্ছে সংসক্তি এবং আসঞ্জন প্রবণ।
(Water is cohesive and adhesive)

হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে পানি অণুগুলো একে অপরের কাছাকাছি থাকে, যার ফলেই পানির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যদিও তরল অবস্থায় পানির অণুগুলোর বিন্যাস ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, তবু যেকোনো মুহূর্তে বহু অণু একাধিক হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত থাকে। প্রতিটি হাইড্রোজেন বন্ধন আলাদাভাবে খুব দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী; গড়ে মাত্র $১০^{-১১}$ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক হাইড্রোজেন বন্ধন একত্রে বিশাল প্রভাব তৈরি করে। এই বন্ধনগুলি পানিকে অন্যান্য তরলের তুলনায় বেশি সুশৃঙ্খল করে। অণুগুলোর এই পারস্পরিক আকর্ষণকে **সংযোজন বা সংসক্তি প্রবণতা (Cohesion)** বলা হয়। সংসক্তির ফলেই পানির **পৃষ্ঠটান (Surface Tension)** খুব বেশি। পানির পৃষ্ঠটান হলো পানির একটি বৈশিষ্ট্য, যার কারণে পানির উপরিভাগ একটি টানটান স্থিতিস্থাপক বা ইলাস্টিক (Elastic) পর্দার মতো আচরণ করে। পানির পৃষ্ঠে অণুগুলো পরস্পর এবং নিচের অণুগুলোর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত থাকে, কিন্তু উপরিভাগে বায়ুর সাথে নয়। এই কারণে পানির পৃষ্ঠ যেন এক অদৃশ্য পাতলা পর্দার মতো আচরণ করে। আর পানির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এর উপর মাকড়সা বা ছোট পোকামাকড় হাঁটতে পারে **(চিত্র ৪.৩.১)** এবং কিছু উদ্ভিদ এর উপর ভাসতে পারে। একটি গ্লাসে পানি পুরো ভরে এর উপর সামান্য একটু বেশি পানি ঢাললে, পানি পড়ে যায় না; পানি গ্লাসের একটু উপরে উঠে থাকে। আর এটি হয় পানির পৃষ্ঠটানের কারণে।

চিত্র ৪.৩.১: পানির ওপর হাঁটা। পানির উচ্চ পৃষ্ঠটান, যা হাইড্রোজেন বন্ধনের সম্মিলিত শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়, একটি মাকড়সা জাতীয় পোকাকে পুকুরের পানির ওপর হাঁটতে সাহায্য করে।

উদ্ভিদের শরীরেও সংসক্তি গুরুত্বপূর্ণ; পাতার পানির বাষ্পীভবনের ফলে হাইড্রোজেন বন্ধন অণুগুলোকে নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে টানে, ফলে শিকড় থেকে পাতা পর্যন্ত পানি ও পুষ্টি উপাদানগুলো মহাকর্ষের বিপরীতে উঠে আসে। এখানে পানির সংযুক্তির পাশাপাশি আসঞ্জন (Adhesion), অর্থাৎ পানির অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে লেগে থাকার ক্ষমতাও ভূমিকা রাখে। কোষপ্রাচীরের (Cell Wall) অণুর সঙ্গে পানির হাইড্রোজেন বন্ধন এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহে সহায়তা করে **(চিত্র ৪.৩.২)**। আসঞ্জনের আরেকটি উদাহরণ হলোঃ একটি সরু কাঁচের নল পানিতে ডুবালে পানির স্তর নলের ভেতরে বাহিরের স্তরের চেয়ে উপরে উঠে যায়। কারণ পানির সাথে কাঁচের **আকর্ষণ বা আসঞ্জন (Adhesion)** বল পানিকে উপরের দিকে টানে, যা নিচের দিকে টেনে নেওয়া মাধ্যাকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। নল যত সরু হবে, জল তত বেশি উপরে উঠবে, কারণ পানির সাথে কাঁচের আকর্ষণ তত বেশি শক্তিশালী হয়।

পানির তাপ ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

পানিকে যখন ফুটানো হয়, তখন তা সাথে সাথেই বাষ্পে পরিণত হয় না। পানিতে তাপ দিলে প্রথমে তা

চিত্র ৪.৩.২: উদ্ভিদে পানি পরিবহন। পাতার পৃষ্ঠ থেকে পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে মূল থেকে উপরের দিকে পানি টেনে তোলে, যা পানি-পরিবাহী কোষগুলোর মাধ্যমে উপরে উঠে আসে। পানির সংসক্তি (Cohesion) ও আসঞ্জন (Adhesion) বৈশিষ্ট্যের কারণে সবচেয়ে লম্বা গাছও ১০০ মিটারের বেশি উচ্চতা পর্যন্ত পানি পরিবহন করতে পারে, যা প্রায় পঁচিশতলা বাড়ির সমান।

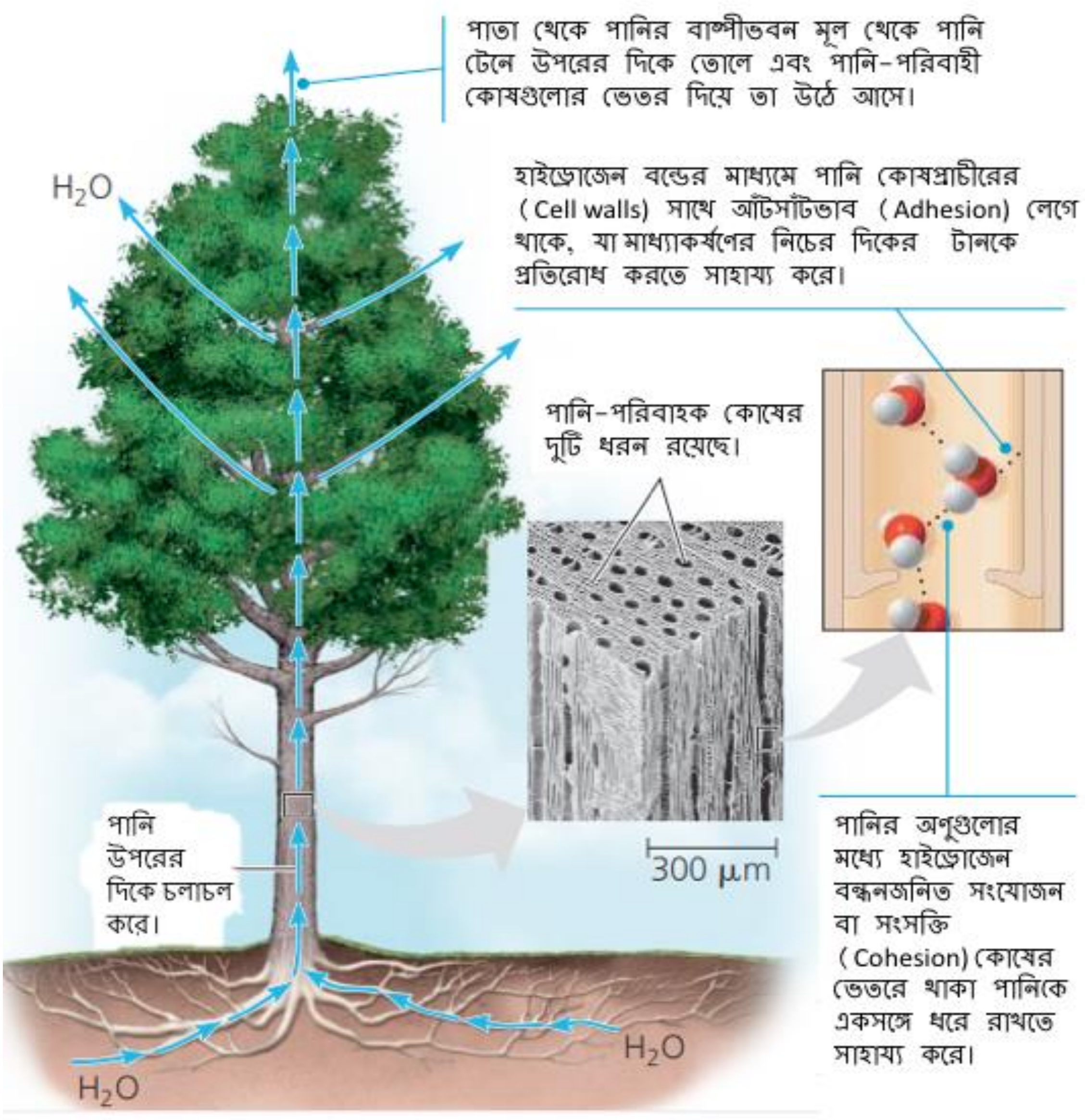

গরম হয়, অর্থাৎ পানির তাপমাত্রা বাড়ে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত (১০০°C) পানি তরল থাকে, তারপর তা বাষ্পে পরিণত হয়। এ থেকে বোঝা যায় পানির এক ধরনের তাপ ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। তাপ ধারণ ক্ষমতার কারণে পানি গরম বায়ু থেকে তাপ শোষণ করতে পারে এবং ঠান্ডা বায়ুতে সঞ্চিত তাপ ছেড়ে দিতে পারে, যা বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পানির তাপ ধারণ ক্ষমতার জন্য পানিকে **তাপ ভাণ্ডারও (Heat Bank)** বলা যায়, কেননা পানির তাপমাত্রা সামান্য পরিবর্তন করতে পানি তুলনামূলকভাবে অনেক তাপ শোষণ বা মুক্ত করতে সক্ষম। বিষয়টি বোঝার জন্য প্রথমে তাপ এবং তাপমাত্রা সম্পর্কে জেনে নেই।

যেকোনো গতিশীল কণারই **গতিশক্তি (Kinetic Energy)** থাকে। পরমাণু ও অণুগুলো ক্রমাগত এলোমেলোভাবে চলাফেরা করে, তবে কোনো নির্দিষ্ট দিকে নয়। যেই অণু বা পরমাণু যত জোরে চলে, তার গতি শক্তি তত বেশী। আর কোনো পদার্থের মধ্যে থাকা অণু ও পরমাণুর এলোমেলো গতির কারণে উৎপন্ন মোট গতিশক্তিকে বলা হয় **তাপীয় শক্তি (Thermal Energy)**। তাপীয় শক্তি তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু এক নয়। **তাপমাত্রা (Temperature)** হলো এই কণাগুলোর গড় গতিশক্তির পরিমাপ (Average Kinetic Energy), আর তাপীয় শক্তি নির্ভর করে মোট কণার সংখ্যার ওপর। বড় আয়তনের পানিতে তাপীয় শক্তি বেশি থাকে, যদিও তার তাপমাত্রা কম হতে পারে। তাই চা-এর গরম পাত্রের তুলনায় ঠান্ডা পুকুরে অনেক পানির বেশি তাপীয় শক্তি থাকে। যখন দুইটি ভিন্ন তাপমাত্রার পদার্থ একত্র হয়, তাপ উষ্ণ পদার্থ থেকে ঠান্ডা পদার্থে প্রবাহিত হয় যতক্ষণ না তাদের তাপমাত্রা সমান হয়। অর্থাৎ, **তাপ (Heat)** হলো তাপীয় শক্তির একটি রূপান্তর বা প্রবাহ, যা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে প্রবাহিত হয়। বরফ কোনো পানীয়কে ঠান্ডা করে "ঠান্ডা যোগ" করে নয়, বরং তরল থেকে তাপীয় শক্তি শোষণ করে নিজে গলে যায়। তাপের একক (Unit) হলো **ক্যালরি (Calorie, cal)**। ১ গ্রাম (g) পানির তাপমাত্রা ১°C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তা হলো ১ ক্যালরি। আবার ১ গ্রাম পানি ১°C ঠান্ডা হলে এই একই পরিমাণ তাপ চারপাশে ছাড়ে। ১০০০ ক্যালরি হলো **১ কিলোক্যালরি (kcal)**, যা খাবার মোড়ক বা প্যাকেটে "Calories" নামে লেখা থাকে। আরেকটি একক হলো জুল **(Joule, J)**: ১ জুল = ০.২৩৯ ক্যালরি; ১ ক্যালরি = ৪.১৮৪ জুল।

পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা পানির তাপমাত্রা স্থির রাখতে সাহায্য করেঃ পানি তার তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে পারে তার তাপ ধারণ ক্ষমতা বা তাপ ধারকত্বের কারণে। ১ গ্রাম কোনো পদার্থের তাপমাত্রা ১°C বাড়াতে বা কমাতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে বলা হয় **তাপ ধারকত্ব বা আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat)**। পানির আপেক্ষিক তাপ ১ cal/(g·°C), যার পরিমাণ নির্দিষ্ট (Specific) এবং যা অন্যান্য বেশিরভাগ পদার্থের তুলনায় বা আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ইথাইল অ্যালকোহলের সুনির্দিষ্ট তাপ মাত্র ০.৬ cal/(g·°C)। তাই সমপরিমাণ তাপে অ্যালকোহল পানির তুলনায় দ্রুত গরম হয়ে যায়। লোহার পাত্র হাত দিলে গরম লাগে, যদিও ভেতরের পানি তখনও সামান্য উষ্ণ, কারণ লোহার আপেক্ষিক তাপ পানির দশ ভাগের এক ভাগ। অন্যদিকে, অ্যামোনিয়া পানির তুলনায় বেশি মেরু (Polar) হওয়ায় তার আপেক্ষিক তাপ আরও বেশি (১.২৩ cal/g/°C)।

আপেক্ষিক তাপ আসলে বোঝায় কোনো পদার্থ তাপমাত্রা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিরোধ করে। পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপের কারণ হলো তার হাইড্রোজেন বন্ধন। বন্ধন ভাঙতে তাপ শোষিত হয়, আর বন্ধন গঠনে তাপ মুক্ত হয়। তাই পানির তাপমাত্রা সামান্য বাড়াতে অনেক শক্তি লাগে, কারণ তাপের অনেকটাই প্রথমে বন্ধন ভাঙতে ব্যয় হয়। এমনকি পানি ০°C থেকে ১০০°C পর্যন্ত গরম করার সময় মোট হাইড্রোজেন বন্ধনের মাত্র ২০% ভাঙে। তাপমাত্রা কমলে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয়, যা আবার তাপ ছাড়ে বা মুক্ত করে।

পানির উচ্চ সুনির্দিষ্ট আপেক্ষিক তাপের কারণে পানি অন্য বেশিরভাগ পদার্থের তুলনায় ধীরে গরম হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। পানির এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র বা হ্রদের মতো বড় জলভাগ দিনে প্রচুর সূর্যতাপ শোষণ করেও অল্প গরম হয়, আর রাতে ধীরে ধীরে তাপ ছেড়ে বায়ুকে উষ্ণ রাখে। ফলে উপকূলীয় এলাকার তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে **(চিত্র ৪.৩.৩)**। সমুদ্রের তাপমাত্রাও খুব বেশি ওঠানামা করে না, যা সামুদ্রিক জীবনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। যেহেতু জীবজগতের দেহের বড় অংশই পানি, পানির আপেক্ষিক তাপ তাদের দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা

স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করত, যদি পানি সেই তাপ শোষণ করে স্থিতিশীল না রাখতো।

চিত্র ৪.৩.৩: অক্টোবর মাসের কোনো এক দিনে বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশ এবং তার আসে পাশের অঞ্চলের তাপমাত্রা।

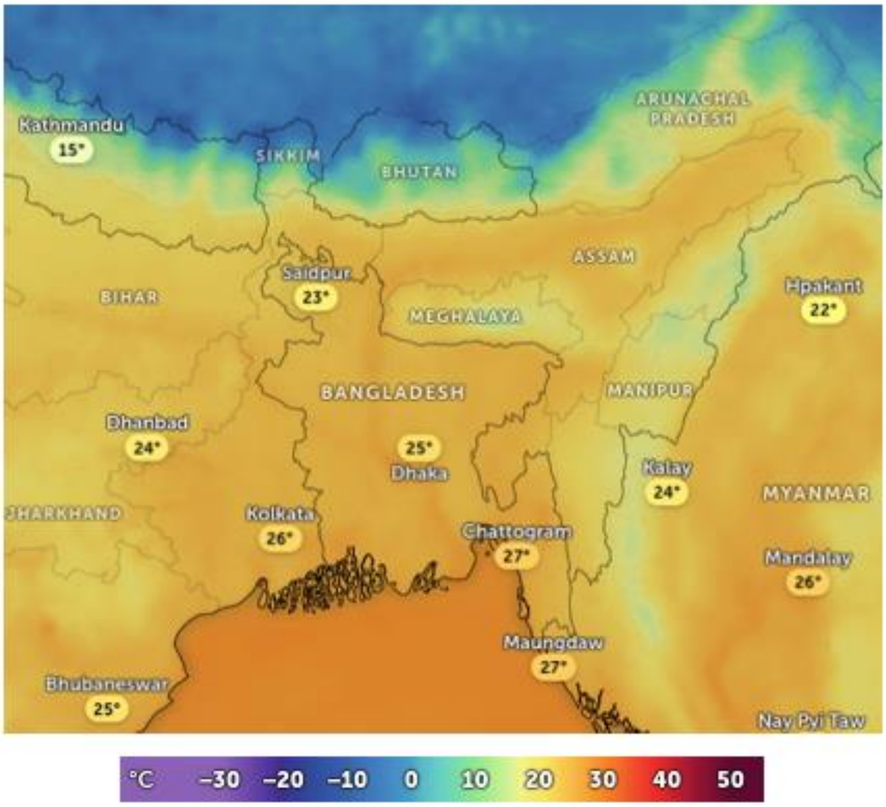

বাষ্পীভবনজনিত শীতলীকরণ (Evaporative Cooling): পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হলে তাপ নির্গত হয়ে ঠাণ্ডা হয়।

যেকোনো তরলের অণুগুলো একে অপরের প্রতি আকর্ষিত থাকার কারণে একসঙ্গে কাছাকাছি থাকে। কিন্তু কোনো অণু যদি যথেষ্ট দ্রুতগতিতে নড়তে পারে এবং এই আকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করতে পারে, তবে সেটি তরল অবস্থা থেকে **বাষ্প** (Vapor, Gas) হিসেবে বেরিয়ে যেতে পারে। তরল থেকে বাষ্পে এই পরিবর্তনকে **বাষ্পীভবন বা বাষ্পায়ন** (Vaporization or Evaporation) বলা হয়। মনে রাখতে হবে, সব অণুগুলোর গতি একরকম নয় এবং তাপমাত্রা হলো অণুগুলোর গড় গতিশক্তির মান। তাই কম তাপমাত্রাতেও কিছু দ্রুতগতির অণু বায়ুতে উড়ে যেতে পারে। এজন্য যেকোনো তাপমাত্রায় কিছু না কিছু বাষ্পীভবন ঘটে। এক গ্লাস পানি ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে সময়ের সাথে তা থেকে পানি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

যদি তরলকে গরম করা হয়, অণুগুলোর গড় গতিশক্তি বাড়ে, ফলে বাষ্পীভবন আরও দ্রুত ঘটে। **বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ** (Heat of Vaporization) বলতে বোঝায়: ১ গ্রাম তরলকে গ্যাসে পরিণত করতে যত পরিমাণ তাপ প্রয়োজন। ঠিক যেমন পানি উচ্চ সুনির্দিষ্ট আপেক্ষিক তাপ ধারণ করে, তেমনি পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপও অধিকাংশ তরলের তুলনায় বেশি। ২৫°C তাপমাত্রায় ১ গ্রাম পানি বাষ্পে পরিণত করতে প্রায় ৫৮০ ক্যালরি তাপ লাগে, যা অ্যালকোহল বা অ্যামোনিয়া বাষ্পীভূত করতে দরকারি তাপের প্রায় দ্বিগুণ। কারণ পানির শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো ভাঙতে প্রচুর শক্তি লাগে, এবং এই বন্ধন ভেঙেই পানির অণুগুলো বাষ্প হিসেবে বের হতে পারে।

পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে এত শক্তি লাগার ফলে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি হয়। পানির এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। উষ্ণমণ্ডলীয় (Tropical) সাগরের পৃষ্ঠে যে সূর্যালোক পড়ে, তার একটি বড় অংশ সাগরের পানির বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত হয়। পরে এই উষ্ণ, আর্দ্র বায়ু

যখন ঠাণ্ডা মেরু অঞ্চলের দিকে যায়, তখন আবার ঘনীভবনের মাধ্যমে তাপ ছেড়ে দেয় এবং বৃষ্টি তৈরি করে।

পানি বাষ্পীভূত হওয়ার সময় যে তাপ শোষিত হয়, তার ফলে যেই পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভবন ঘটে সে পৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়ে যায়। অর্থাৎ, যখন কোনো তরলের উপরের অংশ বাষ্পীভূত হয়, তখন তার নিচের বা বাকি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমে যায়। একে বলা হয় **বাষ্পীভবনজনিত শীতলীকরণ (Evaporative Cooling)**। কারণ সবচেয়ে দ্রুতগতির (সবচেয়ে "গরম") অণুগুলোই প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে বাকি অণুগুলোর গড় গতিশক্তি বা তাপমাত্রা কমে যায়। এটি ঠিক এমন, যেন কোনো কলেজের সবচেয়ে দ্রুত ১০০ জন দৌড়বিদ অন্য স্কুলে চলে গেল, তাহলে বাকি শিক্ষার্থীদের গড় গতি স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে।

পানির এই বাষ্পীভবনজনিত শীতলীকরণ হ্রদ-জলাশয়ের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে এবং স্থলজ প্রাণীদের অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উদ্ভিদের পাতার পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে পাতা অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীরের তাপ বের করে দেয়, ফলে গরম দিনে বা ব্যায়ামের সময় শরীর ঠান্ডা থাকে। আর্দ্রতা বেশি থাকলে অস্বস্তি বাড়ে, কারণ বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘাম দ্রুত বাষ্পীভূত হতে বাধা দেয়। যেসব প্রাণীর ঘর্মগ্রন্থি (Sweat Glands) নেই, যেমন হাতি—তারা শরীরের ওপর পানি ছিটিয়ে নিজেদের ঠান্ডা রাখে **(চিত্র ৪.৩.৪)**।

চিত্র ৪.৩.৪: বাষ্পীভবনজনিত শীতলতা (Evaporative Cooling)। গরম আবহাওয়ায় একটি হাতি তার শুঁড় থেকে পানি ছিটিয়ে মাথায় দেয়। এই পানির বাষ্পীভবনের ফলে হাতির শরীর ঠান্ডা হয়।

কঠিন হলেও বরফ কেন পানিতে ভাসতে পারে?

পানি এমন কয়েকটি পদার্থের মধ্যে একটি, যা কঠিন অবস্থায় (বরফ) তরল অবস্থার তুলনায় কম ঘন। অর্থাৎ, বরফ অবস্থায় পানির অণুগুলো পানির তরল অবস্থার চেয়ে দূরে দূরে থাকে। আর এই কারণেই বরফ পানির ওপর ভাসে। বেশিরভাগ পদার্থ জমাট বাঁধার সময় সঙ্কুচিত হয়ে আরও ঘন হয়, কিন্তু পানি উল্টোটা করে, জমাট বাঁধলে এটি সম্প্রসারিত (Expansion) হয়। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ হলো পানির হাইড্রোজেন বন্ধন **(চিত্র ৪.৩.৫)**।

৪°C এর উপরে পানি অন্যান্য তরলের মতো আচরণ করে; তাপ বাড়লে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডা হলে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ৪°C থেকে ০°C এর দিকে তাপমাত্রা কমার সময় পানি জমতে শুরু করে, কারণ এই তাপমাত্রায় অণুগুলোর গতি এত ধীর হয়ে যায় যে তারা আর হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙতে পারে না।

০°C এ পৌঁছালে পানি অণুগুলো একটি স্ফটিক (Crystal) বা জালকাঠামোতে আটকে যায়, যেখানে প্রতিটি অণু চারটি প্রতিবেশী অণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত থাকে। এই হাইড্রোজেন বন্ধন অণুগুলোকে তুলনামূলকভাবে দূরে ধরে রাখে, ফলে বরফ ৪°C তাপমাত্রার তরল পানির তুলনায় প্রায় ১০% কম ঘন (একই আয়তনে ১০% কম অণু থাকে)।

যখন বরফ ০°C এর উপরে তাপ পায়, হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো ভাঙতে শুরু করে। স্ফটিক-জালকাঠামো ভেঙে গেলে বরফ গলে যায় এবং অণুগুলো আরও কাছে সরে আসে। পানি ৪°C তে সর্বোচ্চ ঘনত্ব অর্জন করে এবং এরপর তাপমাত্রা বাড়লে অণুগুলোর গতি বাড়ায়, ফলে আবার প্রসারিত হতে শুরু করে। তরল পানিতেও অনেক অণু হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত থাকে, তবে এগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী; বারবার ভাঙে ও গঠিত হয়।

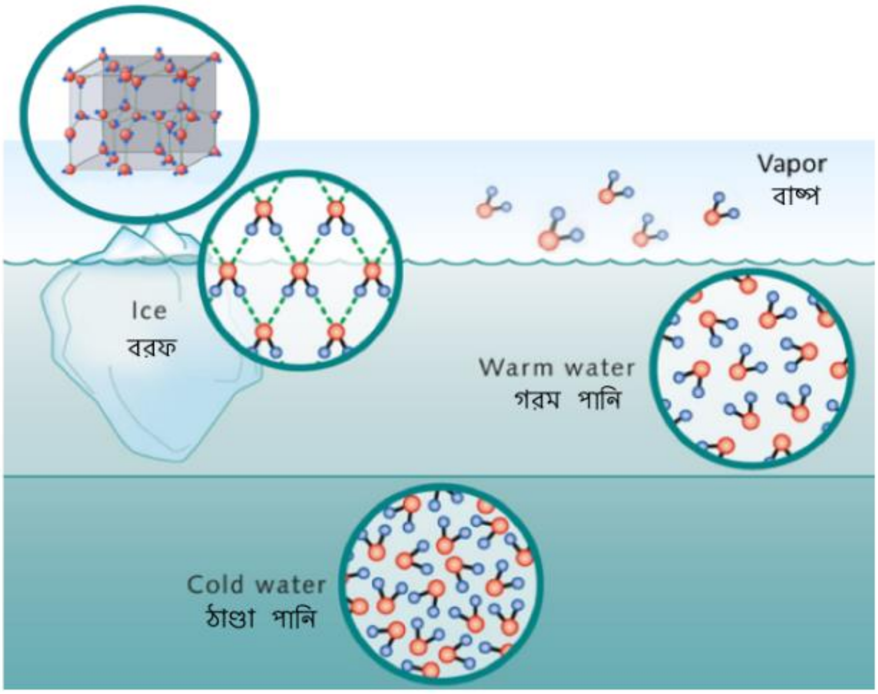

চিত্র ৪.৩.৫: তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, পানির অণুগুলোর মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ধনই পানির আকার ও অবস্থা নির্ধারণ করে।

বরফ ভাসার ক্ষমতা জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ বরফের কম ঘনত্বের কারণে এটি পানির ওপর ভেসে থাকে, যা পৃথিবীতে জীবনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে বড় ভূমিকা রাখে। যদি বরফ ডুবে যেত, তবে পুকুর, হ্রদ এমনকি মহাসাগর পর্যন্ত পুরোপুরি জমে যেত, যার ফলে পরিচিত জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে যেত। গ্রীষ্মকালে শুধু নদী, হ্রদ বা সাগরের পৃষ্ঠের অল্প অংশের পানি গলত। কিন্তু বাস্তবে কী হয়? গভীর জলাধারগুলো ঠান্ডা হলে বরফ উপরের দিকে তৈরি হয়, ভাসতে থাকে এবং সেটা নিচের তরল পানিকে ঢেকে রাখে। এই বরফ স্তর নিচের পানিকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে, ফলে গভীরে থাকা জীবেরা বেঁচে থাকতে পারে। বরফ শুধু রক্ষা করে না, এটি কিছু প্রাণীর জন্য আবাসস্থলও তৈরি করে, যেমন মেরুভালুক ও সিল **(চিত্র ৪.১)** ।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming) বরফভিত্তিক জীবনকে হুমকির মুখে ফেলছেঃ বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন, কারণ পৃথিবীর অনেক বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল দ্রুত বিলুপ্তির ঝুঁকিতে। কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্রিনহাউস (Green House) গ্যাসের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে। গ্রিনহাউস গ্যাস হল বায়ুমণ্ডলের এমন গ্যাস যা পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখে, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে উষ্ণ রাখে। এর প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ওজোন (O_3), এবং জলীয় বাষ্প। গ্রিনহাউস গ্যাসকে এই নামে ডাকার কারণ হলো এগুলি ঠিক একটি কাঁচের তৈরি

গ্রিনহাউসের (সবুজ ঘর) মতো কাজ করে। একটি গ্রিনহাউসের কাঁচের দেয়াল ও ছাদ সূর্যের আলোকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়। গ্রিনহাউসের ভেতরের মাটি, গাছপালা এবং বাতাস এই আলো শোষণ করে এবং তাপ হিসেবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কাঁচ সেই তাপকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেয় না, ফলে গ্রিনহাউসের ভেতরটা বাইরের পরিবেশের চেয়ে উষ্ণ থাকে। একইভাবে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের দৃশ্যমান আলোকে ভূপৃষ্ঠে আসতে দেয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা উপরে উল্লেখিত গ্যাসসমূহ ঠিক এই কাঁচের মতোই কাজ করে। এগুলি ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপশক্তি শোষণ করে এবং তার কিছু অংশ আবার পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়ে দেয়, যা তাপকে বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখে।

মানুষের কার্যকলাপের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটে। উত্তরমেরু বা সুমেরু (Arctic, আর্কটিক) অঞ্চলে ১৯৬১ সালের পর থেকে গড় বায়ু তাপমাত্রা ২.২°C বেড়েছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি বরফ ও পানির মৌসুমি ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন এনেছে। যেমন, বরফ দেরি করে তৈরি হচ্ছে, আগে থেকেই গলে যাচ্ছে, এবং বরফের মোট আয়তন কমে যাচ্ছে। হিমবাহ এবং সামুদ্রিক বরফ যে গতিতে গলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তা বরফনির্ভর প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে **(চিত্র ৪.৩.৬)**।

চিত্র ৪.৩.৬: উত্তরমেরুতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রীষ্মকালে আরও বেশি সমুদ্রের বরফ গলে যায়। বরফের এই হ্রাস পুরো পরিবেশব্যবস্থাকে ব্যাহত করে এবং বহু জীবের ওপর প্রভাব ফেলে।

পানি: জীবনের দ্রাবক।

এক চামচ চিনি পানি ভরা গ্লাসে দিলে তা ধীরে ধীরে গলে যায়। কিছু সময় পর পুরো গ্লাসে চিনি ও পানির একটি সমান মিশ্রণ তৈরি হয়; মিশ্রণের সব জায়গায় চিনির ঘনত্ব একই থাকে। এ ধরনের সম্পূর্ণ সমজাতীয় (Homogeneous) তরল মিশ্রণকে বলা হয় **দ্রবণ (Solution)**। যে পদার্থ দ্রবণ তৈরি করতে সাহায্য করে তাকে বলা হয় **দ্রাবক (Solvent)** এবং যে পদার্থ দ্রবীভূত হয় তাকে বলা হয় **দ্রবিত বা দ্রবীভূত পদার্থ (Solute)**। এই উদাহরণে পানি হলো দ্রাবক এবং চিনি হলো দ্রবিত পদার্থ। যখন কোনো দ্রবিত পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়, তাকে বলা হয় **জলীয় দ্রবণ (Aqueous Solution)**।

পানি একটি অত্যন্ত বহুমুখী দ্রাবক, এবং এই বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ হলো পানির অণুর **ধ্রুবতা বা মেরুপ্রবণতা (Polarity)**। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, এক চামচ টেবিল লবণ, আয়নিক যৌগ সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), পানিতে দেওয়া হলো। লবণের প্রতিটি স্ফটিকের (কণার) পৃষ্ঠে থাকা সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন দ্রাবকের সংস্পর্শে আসে। এই আয়ন ও পানির অণুর আংশিক চার্জযুক্ত অঞ্চলগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে, কারণ তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ বিপরীত (**চিত্র ৪.৩.৭**)।

পানির অণুর অক্সিজেন অংশে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ থাকে, যা সোডিয়াম (Na^+) ক্যাটায়নকে আকর্ষণ করে। পানির হাইড্রোজেন অংশে আংশিক ধনাত্মক চার্জ থাকে, যা ক্লোরাইড (Cl^-) অ্যানায়নকে আকর্ষণ করে। ফলে পানির অণুগুলো প্রতিটি আয়নের চারদিকে ঘিরে একটি **হাইড্রেশন শেল (Hydration Shell)** তৈরি করে। এই আবরণ আয়নগুলোকে একে অন্যের থেকে আলাদা ও আচ্ছাদিত রাখে, ফলে ক্রমান্বয়ে পুরো স্ফটিকটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। এভাবে পানিতে দুই ধরনের দ্রবিত পদার্থ, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন, সমভাবে মিশে যায়। সমুদ্রের পানি বা জীবন্ত কোষেও বহু ধরনের আয়ন একইভাবে দ্রবীভূত থাকে।

চিত্র ৪.৩.৭: খাবার লবণ যখন পানিতে দ্রবীভূত হয়, তখন প্রতিটি দ্রবিত আয়নের চারদিকে পানির অণু একটি গোলাকার আবরণ তৈরি করে, যাকে হাইড্রেশন শেল (Hydration shell) বলা হয়।

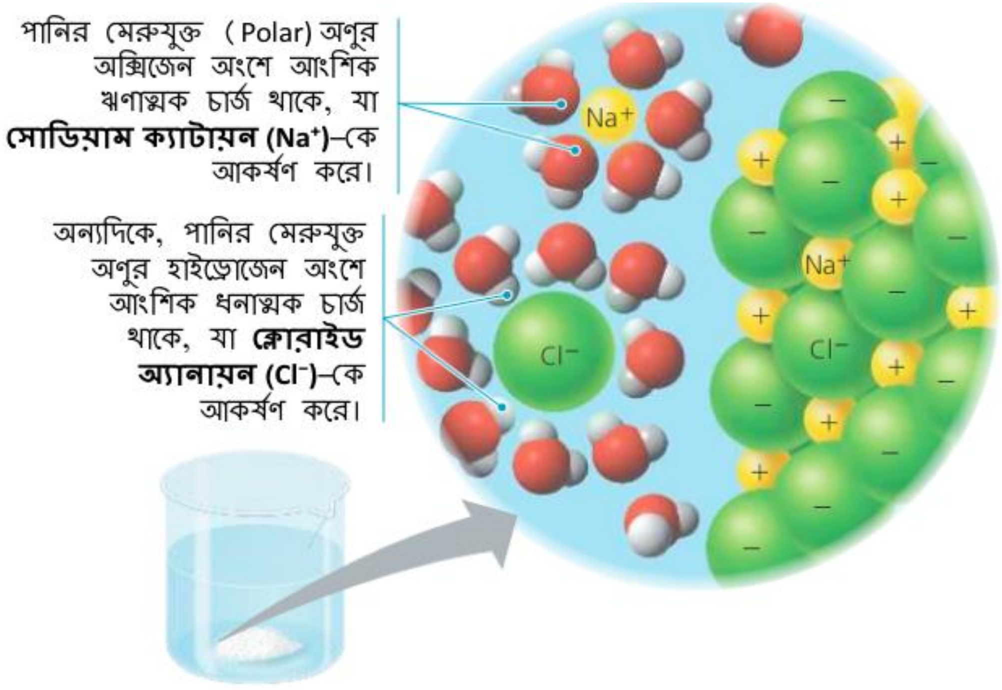

তবে কেবল আয়নিক যৌগই নয়, অনেক **অ-আয়নিক কিন্তু মেরুযুক্ত** (Polar) অণুও পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে। যেমন, চিনির অণুগুলো পানির সঙ্গে **হাইড্রোজেন বন্ধন** তৈরি করে এবং পানির অণুগুলো প্রতিটি চিনির অণুকে ঘিরে ধরে দ্রবীভূত করে। এমনকি বড় আকারের অণু, যেমন আমিষ বা প্রোটিনও পানিতে

দ্রবণীয় হতে পারে, যদি তাদের পৃষ্ঠে যথেষ্ট আয়নিক বা মেরুযুক্ত অঞ্চল থাকে (**চিত্র ৪.৩.৮**)।

চিত্র ৪.৩.৮: পানিতে দ্রবণযোগ্য প্রোটিন। হিউম্যান লাইসোজাইম হলো এক ধরনের প্রোটিন, যা অশ্রু ও লালায় পাওয়া যায় এবং যার জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচের মডেলে দেখানো হয়েছে জলীয় পরিবেশে কিভাবে লাইসোজাইম অণুটি থাকে (বেগুনি রঙের)। প্রোটিনের পৃষ্ঠে থাকা আয়নিক ও মেরুযুক্ত (Polar) অঞ্চলগুলো পানির অণুর আংশিক চার্জযুক্ত অংশকে আকর্ষণ করে, যা তাকে পানিতে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করে।

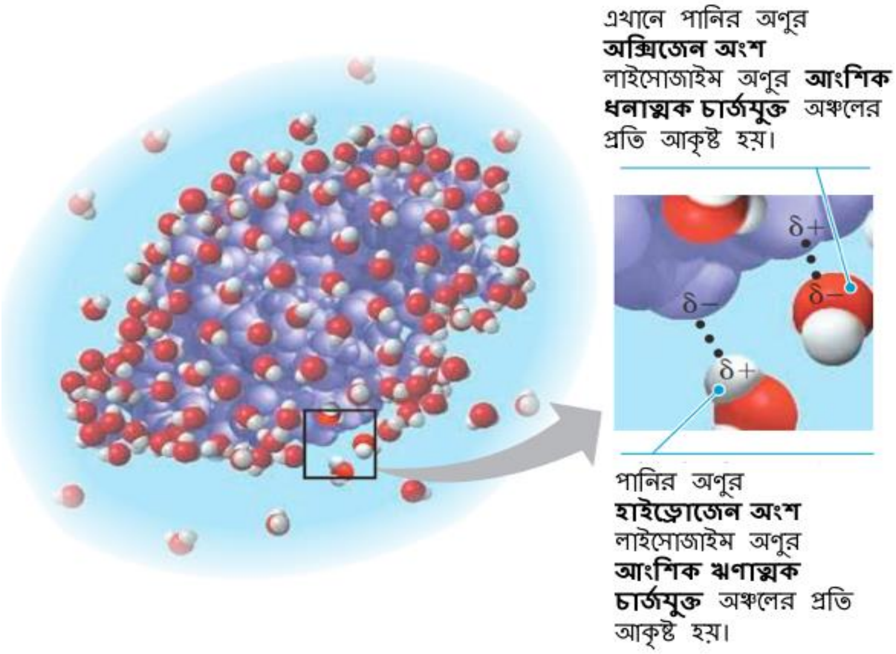

উদ্ভিদের রস, রক্ত বা কোষের অভ্যন্তরীণ তরলের মতো জৈবিক তরলগুলিতে অনেক ধরনের মেরুযুক্ত যৌগ ও আয়ন পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এ কারণেই বলা হয়, **পানি হলো জীবনের দ্রাবক**।

হাইড্রোফিলিক এবং হাইড্রোফোবিক পদার্থ (Hydrophilic and Hydrophobic Substances): যে কোনো পদার্থের পানির প্রতি আকর্ষণ থাকলে তাকে **হাইড্রোফিলিক, জলআকর্ষী বা জলপ্রেমী** বলা হয় (গ্রিক শব্দ *hydro* = পানি এবং *philos* = ভালোবাসা/প্রেমী)। কিছু ক্ষেত্রে পদার্থ পানির প্রতি আকর্ষণ দেখালেও পানিতে পুরোপুরি দ্রবীভূত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোষের কিছু অণু এত বড় যে তারা পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে না।

আরেকটি উদাহরণ হলো তুলা (Cotton), যা একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ। তুলা তৈরি হয় বৃহদাকার সেলুলোজ অণু দিয়ে। সেলুলোজে অনেক আংশিক ধনাত্মক ও আংশিক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত অঞ্চল থাকে, যা পানির সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে। পানি সেলুলোজ তন্তুর সঙ্গে লেগে থাকে (Adhesion)। এ কারণে একটি তুলার তোয়ালে শরীর খুব ভালোভাবে শুকাতে পারে, কিন্তু পানিতে নিজে দ্রবীভূত হয় না। সেলুলোজ উদ্ভিদের পানি পরিবাহক কোষের দেয়ালেও থাকে, এবং এই হাইড্রোফিলিক দেয়ালে পানির আঠালো বৈশিষ্ট্য (Adhesion) উদ্ভিদের ভেতর পানি ওপরের দিকে ওঠাতে সাহায্য করে।

কিন্তু সব পদার্থের পানির প্রতি আকর্ষণ থাকে না। যে পদার্থগুলো **অ-আয়নিক** এবং **অ-মেরুযুক্ত (Nonpolar)**—বা যেগুলো হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না—সেগুলো পানি থেকে দূরে থাকতে চায়। এ ধরনের পদার্থকে বলা হয় **হাইড্রোফোবিক, জলবিকর্ষী বা জলবিদ্বেষী** (গ্রিক *phobos* = ভয়, এড়িয়ে চলা, বা বিদ্বেষী)। রান্নাঘরের একটি পরিচিত হাইড্রোফোবিক পদার্থের উদাহরণ হলো উদ্ভিজ্জ তেল, যা পানির সঙ্গে স্থায়ীভাবে মেশে না।

তেল অণুর হাইড্রোফোবিক আচরণের কারণ হলো তাদের বহু **অ-মেরুযুক্ত কোভ্যালেন্ট বন্ধন**, বিশেষ করে

কার্বন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে, যেখানে ইলেকট্রন প্রায় সমানভাবে ভাগ হয়। তেলের মতো হাইড্রোফোবিক অণুগুলো কোষঝিল্লির (Cell membrane) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। (যদি কোষঝিল্লি পানিতে দ্রবীভূত হতো, তাহলে কোষের কী হতো!!)

পানিতে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ বা ঘনমাত্রা (Concentration): জীবের ভেতরে ঘটে যাওয়া অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াই পানিতে দ্রবীভূত পদার্থকে জড়িত করে। এসব বিক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের জানতে হয়, বিক্রিয়াতে কতগুলো পরমাণু ও অণু অংশ নিচ্ছে এবং জলীয় দ্রবণে (Aqueous Solution) দ্রবীভূত পদার্থের ঘনত্ব বা ঘনমাত্রা কত (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণে কত সংখ্যক দ্রবীভূত অণু আছে)।

ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় আমরা অণুর সংখ্যা নির্ণয়ে ভর ব্যবহার করি। এজন্য প্রথমে বের করতে হয় **আণবিক বা মোলিকুলার ভর (molecular mass)**, যা হচ্ছে একটি অণুতে থাকা সব পরমাণুর ভর যোগ করলে যা হয়।

উদাহরণ হিসেবে টেবিল সুগার (সুক্রোজ, Table Sugar), $C_{12}H_{22}O_{11}$, অর্থাৎ এক ধরনের চিনির মোলিকুলার ভর গণনা করি। প্রতিটি উপাদানের পরমাণু সংখ্যা তার পরমাণু ভর দিয়ে গুণ করতে হবে। একটি কার্বন পরমাণুর ভর প্রায় 12 ডাল্টন, হাইড্রোজেনের 1 ডাল্টন, আর অক্সিজেনের 16 ডাল্টন। তাই সুক্রোজের আণবিক বা মোলিকুলার ভর: $(12 \times 12) + (22 \times 1) + (11 \times 16) = 342$ ডাল্টন।

আমরা এত কম সংখ্যক অণু আলাদা করে ওজন করতে পারি না, তাই সাধারণত আমরা পদার্থের পরিমাণ **মোল (mol)** এককে প্রকাশ করি। যেমন "ডজন" সবসময় ১২ সংখ্যা বোঝায়, তেমনি **১ মোল বলতে 6.02×10^{23} সংখ্যা** (অণু, পরমাণু, ইত্যাদি) বোঝায়, যা **অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা** নামে পরিচিত। অর্থাৎ **১ মোল সুক্রোজ** হলো 6.02×10^{23} সুক্রোজ অণু। একটি সুক্রোজ অণু আবার 342 ডাল্টন। তাই, **১ মোল সুক্রোজ** হলো $342 \times 6.02 \times 10^{23}$ ডাল্টন। আবার 6.02×10^{23} ডাল্টন = 1 গ্রাম। তাই, **১ মোল সুক্রোজ** হলো 342×1 গ্রাম = 342 গ্রাম (g)। ল্যাবে ১ মোল সুক্রোজ নিতে চাইলে আমাদের 342 গ্রাম সুক্রোজ ওজন করতে হবে।

মোল এককে মাপার সুবিধা হলো, কোনো দুটি পদার্থের ১ মোলে সবসময় অণুর সংখ্যা সমান থাকে। যদি A-এর আণবিক বা মোলিকুলার ভর 342 ডাল্টন হয় আর B-এর 10 ডাল্টন হয়, তবে 342 গ্রাম A এবং 10 গ্রাম B, দুটোতেই সমান সংখ্যক অণু থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ১ মোল ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_6O)–এও 6.02×10^{23} অণু আছে, কিন্তু এর ভর মাত্র 46 গ্রাম, কারণ এর প্রতিটি অণুর ভর সুক্রোজের অণুর চেয়ে কম। এ কারণেই ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট অনুপাতে পদার্থ মেশানোর জন্য মোল একক খুব সুবিধাজনক।

এখন ধরি, আমরা ১ লিটার (L) দ্রবণ তৈরি করতে চাই, যাতে ১ মোল সুক্রোজ পানিতে দ্রবীভূত থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে 342 গ্রাম সুক্রোজ মেপে নেবো, তারপর নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে পানি যোগ করবো যতক্ষণ না সব চিনি পুরোপুরি দ্রবীভূত হয়। এরপর এতটুকু পানি যোগ করবো যাতে মোট দ্রবণের পরিমাণ ঠিক ১ লিটার হয়।

এতেই আমরা **১ মোলার (1 M)** সুক্রোজ দ্রবণ পেলাম। **মোলারিটি (Molarity)**, অর্থাৎ প্রতি লিটার দ্রবণে কত মোল দ্রবীভূত পদার্থ আছে (mol/L), জীববিজ্ঞানীরা জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব বা ঘনমাত্রা (Concentration) প্রকাশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন।

অন্যান্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা।

পানির বহুমুখী দ্রাবক হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা এবং এই অধ্যায়ে উল্লেখিত পানির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো চিন্তা করলে জীবনের জন্য পানি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। যেহেতু পানির এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে

সহায়তা করে, তাই মহাবিশ্বে জীবন খুঁজতে গেলে বিজ্ঞানীরা পানি আছে কি না তা বিশেষভাবে খুঁজে দেখেন। কারণ কোনো গ্রহে পানি থাকলে সেটি জীবনের সম্ভাবনা বহন করতে পারে।

মহাবিশ্বে জীবন অনুসন্ধানকারী জীববিজ্ঞানীরা, যাদের **জ্যোতির্জীববিজ্ঞানী** বা **অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট** (Astrobiologists) বলা হয়, তাদের অনুসন্ধানে প্রধান মনোযোগ থাকে এমন গ্রহে, যেখানে পানি থাকতে পারে। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এখন পর্যন্ত ৮০০-র বেশি গ্রহ পাওয়া গেছে, এবং এর মধ্যে কয়েকটির বায়ুমণ্ডলে পানির বাষ্পের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর আমাদের নিজেদের সৌরজগতের মঙ্গল গ্রহতে পানির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃথিবীর মতো মঙ্গলেও দুটি বরফের মেরু রয়েছে। মঙ্গলে পাঠানো মহাকাশযানের ছবিতে দেখা গেছে, এর মাটির নিচে বরফ রয়েছে এবং মঙ্গলের পাতলা বায়ুমণ্ডলে এতটুকু জলীয় বাষ্প আছে যে তুষার (Frost) তৈরি হতে পারে। ২০১৫ সালে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে পানির প্রবাহের প্রমাণ পান **(চিত্র ৪.৩.৯)**, এবং ২০১৮ সালের রাডার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাটির প্রায় এক মাইল নিচে তরল পানির একটি বড় ভাণ্ডার থাকতে পারে। মঙ্গলে জীবনের চিহ্ন খুঁজতে পরবর্তী ধাপ হতে পারে মাটির গভীরে খুঁড়ে দেখা বা ড্রিলিং (Drilling) করা। যদি কখনো সেখানে কোনো জীব বা জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তবে সেগুলো অধ্যয়ন করলে বিবর্তন সম্পর্কে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রমাণ পেয়েছেন, যা নির্দেশ করে যে সেখানে পানি উপস্থিত ছিল বা আছে। নিচের ডিজিটালভাবে প্রক্রিয়াকৃত ছবি মার্স রিকনাইসেন্স অরবিটার দ্বারা তোলা। মার্স রিকনাইস্যান্স অরবিটার (Mars Reconnaissance Orbiter - MRO) হলো NASA-এর একটি মহাকাশযান যা মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে, এর প্রধান কাজ হলো মঙ্গলের পৃষ্ঠের উচ্চমানের ছবি তোলা, পানি ও বরফের উপস্থিতি খোঁজা এবং মঙ্গলের আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা, যা মঙ্গলে ভবিষ্যতে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৪.৪ অম্লীয় (Acidic) ও ক্ষারীয় (Basic) পরিবেশ জীবের ওপর প্রভাব ফেলে।

কখনও কখনও দুটি পানির অণুর মধ্যে থাকা হাইড্রোজেন বন্ধনে অংশ নেওয়া একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক অণু থেকে অন্য অণুতে সরে যায়। এ সময় হাইড্রোজেন পরমাণুটি তার ইলেকট্রন ফেলে রেখে চলে যায়। অর্থাৎ বাস্তবে যা স্থানান্তরিত হয় তা হলো একটি **হাইড্রোজেন আয়ন** (H^+), যা মূলত একটি প্রোটন।

যে পানি অণুটি প্রোটন হারায়, সেটি হয়ে যায় **হাইড্রোক্সাইড আয়ন** (OH^-)। অন্যদিকে, হারানো প্রোটনটি আরেকটি পানি অণুর সাথে যুক্ত হয়ে তাকে তৈরি করে **হাইড্রোনিয়াম আয়ন** (H_3O^+)।

চিত্র ৪.৩.৮: মঙ্গলে তরল পানির প্রমাণ। গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া এই গাঢ় রেখাগুলো (Dark streaks) সম্ভবত তরল পানির উপস্থিতিতে তৈরি হয়েছে। নাসার বিজ্ঞানীরা হাইড্রেটেড লবণ (পানিযুক্ত লবণ)-এরও

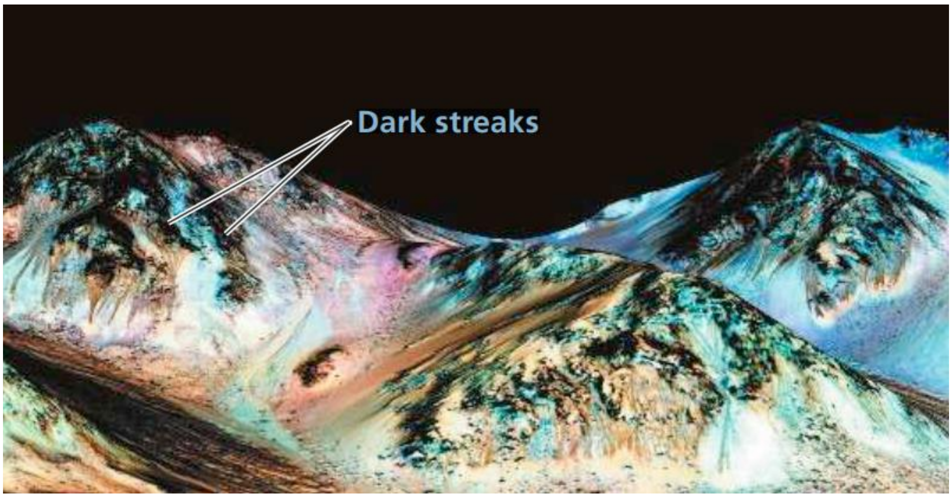

রাসায়নিক বিক্রিয়াটি এভাবে আঁকা যায়:

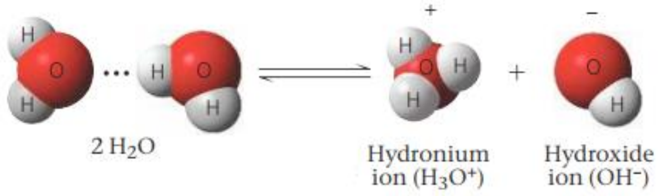

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, **H^+** চিহ্নটি **H_3O^+** বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, এবং এই বইয়েও সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, জলীয় দ্রবণে H^+ কখনও একা থাকে না; এটি সবসময় পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়ে **H_3O^+** আকারে থাকে।

ডাবল অ্যারো ($\rightleftharpoons$) নির্দেশ করে যে এটি একটি **উভমুখী (Reversible)** বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়া এমন এক **গতিশীল সাম্যাবস্থায় (Dynamic Equilibrium)** পৌঁছায় যেখানে পানির অণু যেই হারে ভাঙছে (H^+ ও OH^- তৈরি হচ্ছে), ঠিক সেই হারে আবার পুনর্গঠিত হচ্ছে।

এই সাম্যাবস্থায় পানি অণুর ঘনত্ব H^+ ও OH^- এর ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশি। বিশুদ্ধ পানিতে প্রতি **৫৫৪ মিলিয়ন** পানির অণুর মধ্যে মাত্র **একটি** অণু বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে ২৫°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিতে H^+ এবং OH^-—উভয়ের ঘনত্বই **10^{-7} M**।

অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানির প্রতি লিটারে মাত্র **এক-দশ-মিলিয়নতম মোল** হাইড্রোজেন আয়ন থাকে, এবং সমান পরিমাণ হাইড্রোক্সাইড আয়ন থাকে। (তবুও এই সংখ্যা বিশাল: এক লিটারে প্রতিটি আয়নের সংখ্যাই ৬০,০০০ ট্রিলিয়নের বেশি!)

যদিও পানির বিচ্ছিন্ন হওয়া খুবই কম ঘটে এবং উভমুখী (Reversible), এটি জীবরসায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **H^+ ও OH^- খুবই সক্রিয় আয়ন**, এবং তাদের ঘনত্বের পরিবর্তন কোষের প্রোটিনসহ অনেক জটিল অণুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

আগে দেখেছি, বিশুদ্ধ পানিতে H^+ ও OH^- এর ঘনমাত্রা (Concentration) সমান থাকে; কিন্তু কিছু দ্রবিত পদার্থ, যাদের **অম্ল (acid)** ও **ক্ষার (base)** বলা হয়, এই ঘনমাত্রার ভারসাম্যকে পরিবর্তিত করে।

জীববিজ্ঞানীরা কোনো দ্রবণ কতটা অম্লীয় বা ক্ষারীয় তা বোঝাতে **pH বা পিএইচ স্কেল** ব্যবহার করেন। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা অ্যাসিড, বেস ও pH সম্পর্কে এবং pH পরিবর্তন কীভাবে জীবের ক্ষতি করতে পারে—তা শিখব।

- ***অম্ল (Acids) ও ক্ষার (Bases)।***

একটি জলীয় দ্রবণে (Aqueous Solution) **H^+ (হাইড্রোজেন) এবং OH^- (হাইড্রোক্সাইড)** আয়নের পরিমাণে বা ঘনমাত্রায় অসাম্য কেন দেখা দিতে পারে? যখন কোনো **অম্ল (acid)** পানিতে দ্রবীভূত হয়, তখন এটি দ্রবণে অতিরিক্ত **হাইড্রোজেন H^+ আয়ন** যোগ করে।
অর্থাৎ, অম্ল হলো এমন পদার্থ যা কোনো দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) পরিমাণ বা ঘনমাত্রা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) পানিতে দিলে এটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায়:

$$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$$

এভাবে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত H^+ আয়ন (পানির স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও) দ্রবণকে **অম্লীয়** করে—অর্থাৎ যেখানে $H^+ > OH^-$।

অপরদিকে, যে পদার্থ কোনো দ্রবণে **H^+ আয়নের** পরিমাণ বা ঘনমাত্রা কমায়, তাকে **ক্ষার (base)** বলা হয়। ক্ষার দুটি উপায়ে H^+ কমাতে পারে:

- **১. সরাসরি H^+ গ্রহণ করে (Proton acceptor)**

উদাহরণ: অ্যামোনিয়া (NH_3)

অ্যামোনিয়া তার নাইট্রোজেন পরমাণুর অবিভক্ত ইলেকট্রন জোড়া ব্যবহার করে H^+ গ্রহণ করে এবং তৈরি করে:

$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$ (অ্যামোনিয়াম আয়ন)

- **২. OH^- আয়ন তৈরি করে, যা H^+ এর সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে**

উদাহরণ: সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH)

NaOH পানিতে দিলে ভেঙে যায়:

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

এখন $OH^- + H^+ \rightarrow H_2O$
ফলে দ্রবণে H^+ এর পরিমাণ বা ঘনমাত্রা কমে যায়।

- OH^- এর ঘনত্ব H^+ এর চেয়ে বেশি হলে দ্রবণকে ক্ষারীয় (Basic) বলা হয়।

আর H^+ ও OH^- এর ঘনত্ব সমান হলে দ্রবণ **নিরপেক্ষ (Neutral)**।

- ***শক্তিশালী (Strong) ও দুর্বল (Weak) অম্ল/ক্ষার।***

HCl ও NaOH—এই দুই যৌগ পানিতে **সম্পূর্ণভাবে** বিচ্ছিন্ন হয়।
তাই:

- HCl = **শক্তিশালী অম্ল**
- NaOH = **শক্তিশালী ক্ষার**

এগুলির সমীকরণে একমুখী তীর (→) ব্যবহার করা হয়।

অন্যদিকে, অ্যামোনিয়া (NH_3) একটি **দুর্বল ক্ষার**, কারণ এটি H^+ গ্রহণ করে আবার ছেড়ে দিতে পারে। এর বিক্রিয়া উভমুখী (Reversible):

$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$

- ***দুর্বল অম্লের উদাহরণ: কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)।***

কার্বনিক অ্যাসিড H^+ ছেড়ে দিতে পারে, আবার গ্রহণও করতে পারে:

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
কার্বনিক অ্যাসিড ⇌ বাইকার্বোনেট আয়ন + হাইড্রোজেন আয়ন

সাম্যাবস্থায় প্রতিক্রিয়াটি বামদিকে বেশি থাকে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানিতে এর মাত্র **১% অণু** বিচ্ছিন্ন হয়। তবুও এতটুকুই যথেষ্ট যা H^+ ও OH^- এর ভারসাম্য বদলে দিতে।

সংক্ষেপে, এমন অনেক ধরনের পদার্থ আছে, যাতে হাইড্রোজেন বা হাইড্রোক্সাইড আয়ন থাকে। যেসব পদার্থ পানিতে যোগ করলে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন দিতে পারে সেগুলো অম্ল। যেমন সিরকা (ভিনেগার) হলো অম্ল, কারণ পানিতে তা প্রোটন দিতে পারে। তেমনিভাবে পানে যে চুন খাওয়া হয় তা হলো ক্ষার, কারণ চুন হাইড্রোক্সাইড আয়ন দিতে পারে। অম্লের স্বাদ সাধারণত টক হয়। অম্ল ও ক্ষার দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব পরিবর্তন করে, যা জীবের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

pH স্কেল।

যেকোনো জলীয় দ্রবণে (Aqueous Solution) 25°C তাপমাত্রায় H^+ এবং OH^- আয়নের ঘনমাত্রার গুণফল সবসময় ধ্রুব থাকে—এর মান **10^{-14}**।

$[H^+][OH^-] = 10^{-14}$

(ব্র্যাকেট নির্দেশ করে মোলার ঘনমাত্রা।)

নিরপেক্ষ পানিতে (pure water) 25°C তে:

- **$[H^+] = 10^{-7}$ M**
- **$[OH^-] = 10^{-7}$ M**

এদের গুণফল: **$10^{-7} \times 10^{-7} = 10^{-14}$**।

যদি কোনো দ্রবণে অ্যাসিড যোগ করে H^+ এর ঘনমাত্রা **10^{-5} M** করা হয়, তাহলে OH^- এর মান সমানুপাতে কমে যাবে **10^{-9} M**-এ (কারণ $H^+ \times OH^- = 10^{-14}$

থাকতে হবে)।

এটি দেখায় যে অম্ল বা অ্যাসিড H^+ বাড়ানোর পাশাপাশি OH^- কমায়, কারণ H^+ ও OH^- একত্র হয়ে পানি তৈরি করে। অন্যদিকে, বেস বা ক্ষার OH^- বাড়ায় এবং H^+ কমায় একই কারণে। যদি বেস যুক্ত করে OH^- এর ঘনমাত্রা **10^{-4} M** করা হয়, তাহলে H^+ কমে **10^{-10} M** হবে। এভাবে, কোনো দ্রবণে H^+ বা OH^- যেকোনো একটির ঘনমাত্রা জানা থাকলে, অপরটির মান সহজেই নির্ণয় করা যায়।

pH স্কেল হলো H^+ আয়নের ঘনমাত্রা প্রকাশের একটি সহজ সংখ্যাত্মক পদ্ধতি **(চিত্র ৪.৪.১)**। H^+ এর ঘনমাত্রা অত্যন্ত ছোট বা বড় হতে পারে—১০০ ট্রিলিয়ন গুণ পর্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। এই বিশাল পরিসরকে ছোট করে প্রকাশ করতে লগারিদম ব্যবহার করা হয়।

$pH = -\log [H^+]$

উদাহরণ: নিরপেক্ষ দ্রবণে **$[H^+] = 10^{-7}$ M**

তাহলে: $pH = -\log(10^{-7}) = 7$, অর্থাৎ নিরপেক্ষ দ্রবণের pH = **7**।

- **গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ**
- যখন H^+ ঘনমাত্রা **বাড়ে**, তখন pH **কমে**।
- pH স্কেল H^+ এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হলেও, এটি OH^- এর সম্পর্কে পরোক্ষভাবে তথ্য দেয়।
    - যেমন: pH = 10 হলে
        - $[H^+] = 10^{-10}$ M
        - $[OH^-] = 10^{-4}$ M
- **pH স্কেলের মানঃ**
- **pH 7 → নিরপেক্ষ**
- **pH < 7 → অ্যাসিডিক (অম্লীয়)**
- **pH > 7 → বেসিক (ক্ষারীয়)**

জীবনের বেশিরভাগ তরল (যেমন রক্ত, লালা) pH **6–8** এর ভেতরে থাকে। কিছু ব্যতিক্রম আছে, যেমন পেটের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের pH প্রায় **2**।

- **pH এর পরিবর্তনের গুরুত্বঃ** প্রতিটি pH ইউনিট **১০ গুণ** পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।

  এর অর্থ— pH 3 কোনোভাবেই pH 6-এর দ্বিগুণ অ্যাসিডিক নয়; বরং **১০³** বা **১,০০০ গুণ** বেশি অ্যাসিডিক ($10 \times 10 \times 10 = 1000$)। অর্থাৎ pH সামান্য পরিবর্তন হলেও দ্রবণে H^+ এবং OH^- এর ঘনমাত্রায় বিশাল পরিবর্তন ঘটে।

বাফার (Buffer)।

বেশিরভাগ জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরীণ pH প্রায় ৭–এর কাছাকাছি থাকে। pH–এর সামান্য পরিবর্তনও কোষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নের (OH^-) পরিমাণ বা ঘনমাত্রার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। মানুষের রক্তের pH প্রায় ৭.৪, যা সামান্য ক্ষারীয়। রক্তের pH যদি ৭–এ নেমে যায় বা ৭.৮–এ উঠে যায়, তবে মানুষ কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না। তাই রক্তে এমন একটি রাসায়নিক ব্যবস্থা রয়েছে যা pH–কে স্থির রাখে।

যদি ০.০১ মোল শক্তিশালী অ্যাসিড ১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে যোগ করা হয়, তবে pH ৭.০ থেকে কমে ২.০ হয়ে যায়। কিন্তু একই পরিমাণ অ্যাসিড ১ লিটার রক্তে যোগ করলে pH মাত্র ৭.৪ থেকে ৭.৩–এ নামে। রক্তে অ্যাসিড যোগ করলে pH এতো কম পরিবর্তিত হয় কেন?

এর কারণ হলো বাফার (Buffer) নামের বিশেষ পদার্থের উপস্থিতি, যা জৈবিক তরলগুলোকে অ্যাসিড বা বেস যোগ হলেও তুলনামূলক স্থির pH বজায় রাখতে

চিত্র ৪.৪.১: pH স্কেল এবং বিভিন্ন জলীয় দ্রবণের pH মান।

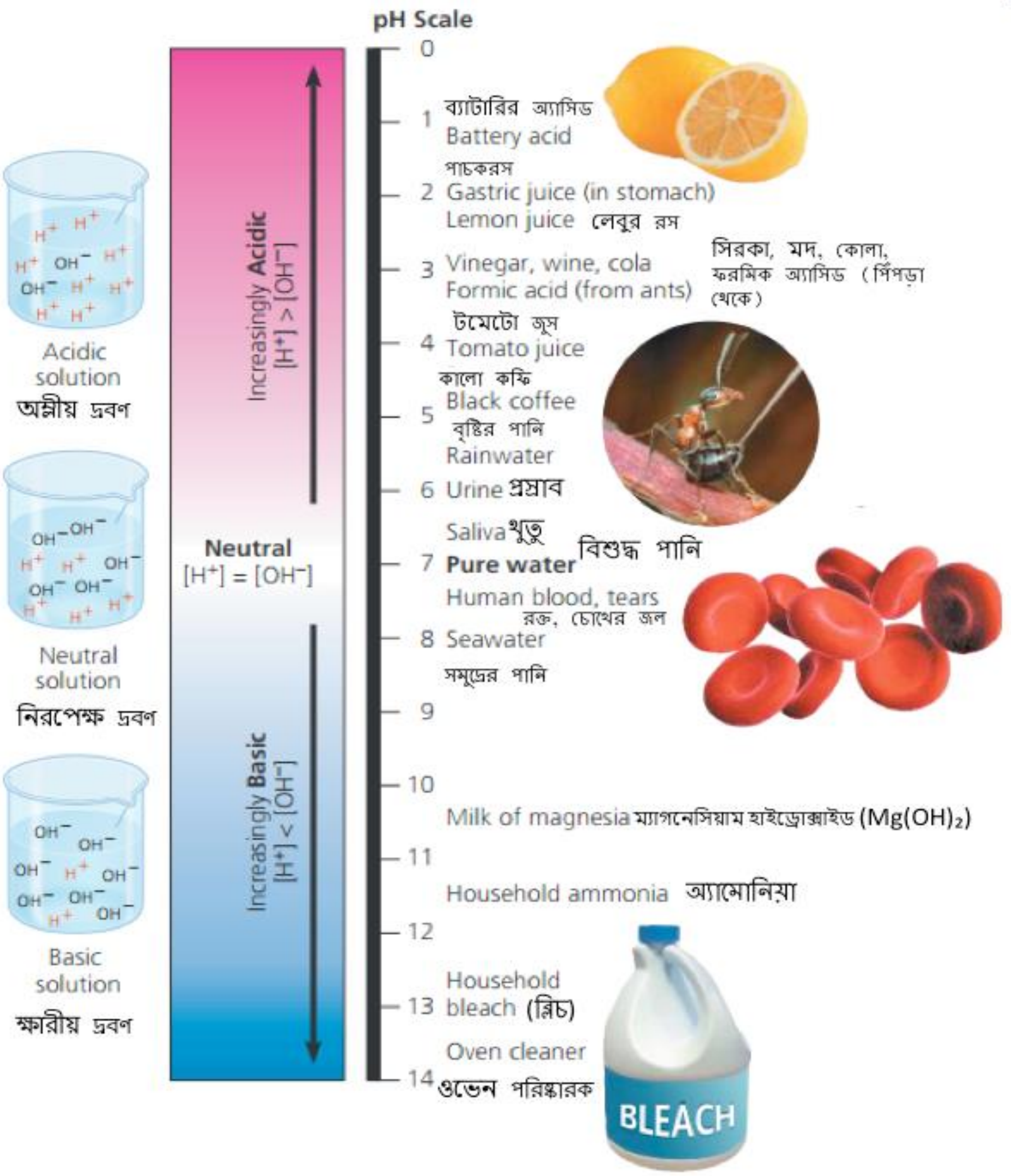

সাহায্য করে। বাফার হলো এমন পদার্থ যা দ্রবণে H^+ এবং OH^--এর ঘনমাত্রার পরিবর্তন কমিয়ে আনে। এটি দুইভাবে কাজ করে—

- H^+ বেশি হলে, বাফার অতিরিক্ত H^+ গ্রহণ করে
- H^+ কম হলে, বাফার H^+ দান করে

বেশিরভাগ বাফার-এ একটি দুর্বল অ্যাসিড (অম্ল) ও তার সংশ্লিষ্ট বেস (ক্ষার) থাকে, যা হাইড্রোজেন আয়নের সাথে উভমুখী (Reversible) বিক্রিয়া করে।

যে দ্রবণে অ্যাসিড ও ক্ষার যুক্ত করার পরেও দ্রবণের pH মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, সেসকল দ্রবণকে

বাফার দ্রবণ বলা হয়। মানব রক্ত এবং অন্যান্য জৈবিক দ্রবণ হচ্ছে বাফার দ্রবণের উদাহরণ, যাতে pH স্থিতিশীল রাখতে একাধিক বাফার কাজ করে। এর মধ্যে একটি হলো **কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)**, যেটি রক্তের প্লাজমায় CO_2 এবং পানির বিক্রিয়ায় তৈরি হয়। কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে **বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-)** এবং **হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)** তৈরি হয়:

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO3^- + H^+$$

এই কার্বনিক অ্যাসিড-বাইকার্বনেট সিস্টেম pH নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দ্রবণে অন্য প্রক্রিয়ায় H^+ যোগ বা কমালে, সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়াম (Equilibrium) ডান বা বাম দিকে সরে যায়।

- **যদি রক্তে H^+ কমে যায় (pH বাড়ে):** বিক্রিয়া ডানদিকে এগোয় → আরও H_2CO_3 (অ্যাসিড) ভেঙে H^+ সরবরাহ করে।
- **যদি রক্তে H^+ বাড়ে (pH কমে):** বিক্রিয়া বামদিকে যায় → HCO_3^- (বেস) অতিরিক্ত H^+ গ্রহণ করে H_2CO_3 তৈরি করে।

অর্থাৎ, এই বাফারিং (Buffering) সিস্টেমে বা ব্যবস্থায় একটি অ্যাসিড ও একটি বেস থাকে, যেগুলো একে অপরের সাথে সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়াম (Equilibrium) অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ বাফারই এমন অ্যাসিড-বেস জোড়া দিয়ে গঠিত।

অম্লীকরণ: আমাদের মহাসাগরের জন্য এক হুমকি। (Acidification: A Threat to Our Oceans)

মানব কর্মকাণ্ডের কারণে পানির গুণগত মানের ওপর তৈরি হওয়া বহু হুমকির মধ্যে অন্যতম হলো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, যার ফলে বিপুল পরিমাণ CO_2 বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হয়। বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর এই বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ (Global warming) জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য দিক সৃষ্টি করেছে। মানুষের উৎপাদিত CO_2-এর প্রায় ২৫% সমুদ্র শোষণ করে। সমুদ্রজলে বিপুল পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও, এত CO_2 শোষিত হওয়া সামুদ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন রয়েছেন।

সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে, CO_2 যখন সমুদ্রজলে দ্রবীভূত হয়, এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে, যা সমুদ্রের pH কমিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে **সমুদ্রের অম্লীকরণ (Ocean acidification)** বলা হয় **(চিত্র ৪.৪.২)**। এটি সমুদ্রজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম রাসায়নিক ভারসাম্যকে বদলে দেয়। বরফের স্তরে আটকানো হাজার বছরের পুরোনো বায়ুর বুদবুদের CO_2 মাত্রা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা গণনা করেছেন যে সমুদ্রের pH এখন অতীতের ৪,২০,০০০ বছরের যেকোনো সময়ের তুলনায় ০.১ pH ইউনিট কম (অর্থাৎ বেশি অম্লীয়)। গবেষণায় আরও অনুমান করা হয়েছে যে চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমুদ্রের pH আরও ০.৩-০.৫ ইউনিট কমতে পারে।

সমুদ্রের পানি ক্রমাগত অম্লীয় হলে অতিরিক্ত H^+ আয়ন কার্বনেট আয়নের (CO_3^{2-}) সাথে যুক্ত হয়ে বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) তৈরি করে। ফলে দ্রবণে কার্বনেট আয়নের ঘনমাত্রা কমে যায়। গবেষকরা অনুমান করছেন যে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রজলে কার্বনেট আয়নের পরিমাণ ৪০% হ্রাস পাবে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, কারণ কার্বনেট আয়ন **প্রস্তরীভবন (Calcification)**-এর জন্য অপরিহার্য। প্রস্তরীভবন হচ্ছে একটি জমাটকরণ প্রক্রিয়া যাতে সামুদ্রিক জীব যেমন প্রবাল (Corals) এবং খোলস-যুক্ত প্রাণীরা ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) তৈরি করে।

২০১৮ সালে গবেষকেরা প্রথমবারের মতো একটি উন্মুক্ত প্রাকৃতিক প্রবালপ্রাচীরে (Coral reefs) CO_2 বৃদ্ধি-সংক্রান্ত গবেষণা করেন। তারা দেখতে পান, CO_2 বৃদ্ধির ফলে প্রস্তরীভবন (Calcification) কমে যায়। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, সমুদ্রের অম্লীকরণ (Ocean acidification)-এর কারণে প্রবালপ্রাচীরে "গভীর, পরিবেশ-বিস্তৃত পরিবর্তন" ঘটতে পারে। প্রবালপ্রাচীর হলো সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র, যা অসংখ্য সামুদ্রিক

জীবের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাই প্রবালপ্রাচীরের বিলুপ্তি সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য এক বড় করুণ ক্ষতি হবে।

তবুও কিছু আশা আছে। কারণ আমরা ইতিমধ্যে সমুদ্র, হ্রদ এবং নদীর সূক্ষ্ম রাসায়নিক ভারসাম্য সম্পর্কে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে আরও অগ্রগতি সম্ভব শুধুমাত্র তখনই, যখন আপনাদের মতো সচেতন ও পরিবেশ-বান্ধব মানুষরা এই বিষয়গুলো বুঝে পদক্ষেপ নেবেন। আর এর জন্য প্রয়োজন পানি কীভাবে পৃথিবীতে জীবনের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে—তা গভীরভাবে বোঝা।

চিত্র ৪.৪.২: মানুষের কর্মকাণ্ড থেকে উৎপন্ন বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 এবং সমুদ্রের মধ্যে এর পরিণতি।

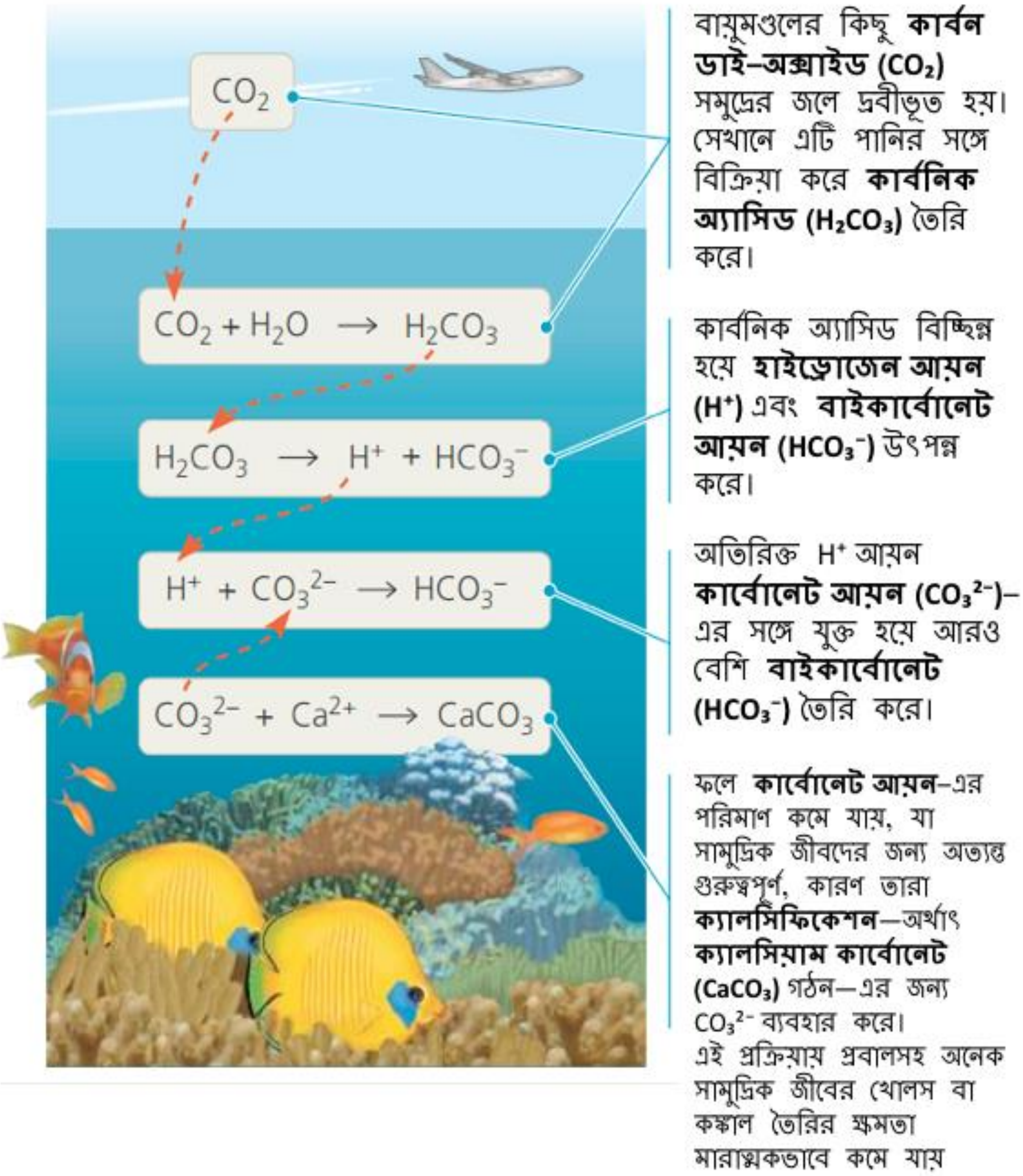

অনুশীলনী ৪

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি (Electronegativity) কী, এবং এটি পানির অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

২। চিত্র ৪.২.১ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করো কেন কেন্দ্রীয় পানি অণুটি অন্যান্য পানি অণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম।

৩। যদি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সমান হতো, তবে পানির অণুর বৈশিষ্ট্যের ওপর কী প্রভাব পড়ত?

৪। গাছের ভেতরে পানি উপরের দিকে ওঠার ক্ষেত্রে পানির বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা করো।

৫। "গরমটা আসল সমস্যা নয়, সমস্যা হলো আর্দ্রতা"—এই কথাটির ব্যাখ্যা দাও। (ইঙ্গিত (Hint): গরমের তীব্রতা যা অনুভূত হয় তার পেছনে আর্দ্রতার বড় ভূমিকা রয়েছে)

৬। পানি জমে বরফ হওয়ার ফলে কীভাবে বড় বড় শিলা ফেটে যেতে পারে?

৭। ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ঘ্রেলিন (Ghrelin)-এর ঘনত্ব একজন উপবাসরত মানুষের রক্তে প্রায় 1.3×10^{-10} M। ১ লিটার রক্তে কতটি ঘ্রেলিন অণু থাকবে?

৮। pH 9-এর একটি ক্ষারীয় দ্রবণের তুলনায়, একই আয়তনের pH 4-এর একটি অম্লীয় দ্রবণে কত গুণ বেশি হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) থাকবে?

৯। HCl একটি শক্তিশালী অ্যাসিড, যা পানিতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়:

$$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$$

0.01 M HCl দ্রবণের pH কত হবে?

১০। অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) কার্বনিক অ্যাসিডের মতো একটি বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে। এর বিচ্ছিন্নতার (Dissociation) বিক্রিয়াটি লেখো এবং চিহ্নিত করো—

কোনটি অ্যাসিড, কোনটি বেস, কোনটি H^+ গ্রহণকারী (Acceptor) এবং কোনটি H^+ দাতা (Donor)।

১১। এক লিটার বিশুদ্ধ পানি এবং এক লিটার অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্রবণে যদি 0.01 মোল শক্তিশালী অ্যাসিড যোগ করা হয়, তবে সাধারণভাবে pH-এর কী পরিবর্তন হবে?

প্রশ্ন ১০-এর বিক্রিয়াটি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করো।

১২। কিছু হাইড্রোফোবিক (Hydrophobic) পদার্থের উদাহরণ দাও।

১৩। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এক মোল টেবিল সুগার এবং এক মোল ভিটামিন C—দুটির মধ্যে সমান থাকবে তাদের ________।

১৪। পরিমাপে দেখা গেছে যে একটি নির্দিষ্ট হ্রদের pH = 4.0। এই হ্রদের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঘনত্ব কত? হ্রদের হাইড্রোক্সাইড আয়নের (OH^-) ঘনমাত্রা (Concentration) কত?

১৫। এক টুকরা পিজ্জায় ৫০০ কিলোক্যালরি (kcal) শক্তি রয়েছে। যদি আমরা পিজ্জাটি পুড়িয়ে উৎপন্ন সব তাপ ৫০-লিটার ঠান্ডা পানিভর্তি একটি পাত্রকে গরম করতে ব্যবহার করি, তবে পানির তাপমাত্রা আনুমানিক কত ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে? *(দ্রষ্টব্য: ১ লিটার ঠান্ডা পানির ভর প্রায় ১ কিলোগ্রাম।)*

১৬। পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) পানিতে দ্রবীভূত হলে, পটাসিয়াম আয়ন (K^+) এবং ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-)-এর চারপাশে যে হাইড্রেশন শেল (Hydration Shell) তৈরি হয় তা অঙ্কন করো। ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও আংশিক চার্জ (Partial Charges) গুলো চিহ্নিত করো।

১৭। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মহাসাগরীয় অম্লীকরণ (Ocean acidification)-এর মধ্যে কী মিল রয়েছে?

১৮। এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে পানির উদ্ভূত (Emergent) বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে জীবনের জন্য পরিবেশকে উপযোগী করে তোলে। অল্পদিন আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে জীবনের জন্য প্রয়োজনঃ মাঝারি তাপমাত্রা, উপযুক্ত pH, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও লবণাক্ততা এবং বিষাক্ত রাসায়নিকের স্বল্প উপস্থিতি। কিন্তু এই ধারণা বদলে গেছে *এক্সট্রিমোফাইল* (Extremophiles) নামের জীব আবিষ্কারের পর, যারা উষ্ণ ও অম্লীয় সালফার ঝরনায়, গভীর সমুদ্রের হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের আশেপাশে এবং বিষাক্ত ধাতুসমৃদ্ধ মাটিতে ভালোভাবে বেঁচে থাকে। অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টরা (Astrobiologists) কেন এক্সট্রিমোফাইলদের নিয়ে গবেষণা করেন? এত চরম পরিবেশে জীবনের অস্তিত্ব অন্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দেয়?

১৯। পানির একাধিক উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য পরিবেশকে জীবনের জন্য উপযোগী করে তোলে। ১০০-১৫০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করোঃ কীভাবে পানির অণুর গঠনের (Molecular Structure) কারণে পানি একটি বহুমুখী দ্রাবক (Versatile Solvent) হিসেবে কাজ করতে পারে।

২০। বিড়াল কীভাবে পানি পান করে? উচ্চগতির ভিডিও ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে বিড়াল পানি ও দুধের মতো তরল পান করার সময় একটি অভিনব কৌশল ব্যবহার করে। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় চারবার, বিড়াল তার জিহ্বার ডগা পানির উপর স্পর্শ করায় এবং একটি পানিকে মুখের দিকে টেনে তোলে। এরপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পানিকে নিচে নামানোর আগেই মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পানির বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে বিড়ালকে এই পদ্ধতিতে পানি পান করতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করো। ব্যাখ্যায় দেখাও কীভাবে পানির অণুগঠন এবং পারস্পরিক আকর্ষণ এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

২১। দুটি পার্শ্ববর্তী (Neighboring) পানির অণু এভাবে সাজানো থাকার সম্ভাবনা কম, কারণ?

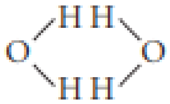

অধ্যায় ৫

কার্বন এবং জীবনের আণবিক বৈচিত্র্য।

(Carbon and the Molecular Diversity of Life)

এই অধ্যায়ের মূল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

৫.১ জীবনের উৎপত্তিতে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ কার্বন (Carbon) পরমাণু চারটি অন্যান্য পরমাণুর সাথে বন্ধন (Bond) গঠন করে বৈচিত্র্যময় (Diverse) অণু তৈরি করতে পারে।

৫.৩ অণুর কার্যকারিতার জন্য কয়েকটি রাসায়নিক কার্যকরী মূলক (Chemical Functional Groups) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৫.১: চট্টগ্রাম বিভাগ (Chattogram Division) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি বৃহত্তম বিভাগ, যা তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং প্রধান বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ; দেশের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ও একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন'স দ্বীপের অবস্থানও এই বিভাগে। চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচুর পাহাড় রয়েছে, বিশেষত পার্বত্য জেলাগুলোতে, যা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, এবং এখানে বিভিন্ন প্রজাতির বানর দেখা যায়, যদিও পাহাড় কাটা ও বন উজাড়ের কারণে এদের বাসস্থান ও সংখ্যা কমছে। এই বিভাগের বান্দরবান জেলার নামকরণ মূলত 'বানর' এবং 'বান্দ' শব্দ থেকে এসেছে। এককালে সেখানে একটি ছড়া বা বাঁধ ছিল, যেখানে অনেক বানরের আনাগোনা ছিল। স্থানীয় মারমা ভাষায় 'ম্যাঅক' (বানর, বান্দর) ও 'ছি' (বাঁধ, বান্দ) মিলে 'ম্যাঅকছি' (বানরের বাঁধ), যা কালক্রমে 'বান্দরবান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য অরণ্যে বসবাসকারী বানরসহ অন্যান্য সকল জীব মূলত কার্বন (Carbon) মৌলভিত্তিক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। সকল রাসায়নিক মৌলের মধ্যে কার্বন তার বিশেষ ক্ষমতার জন্য অনন্য কারণ এটি বড়, জটিল এবং বৈচিত্র্যময় অণু গঠন করতে পারে। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

কার্বন (Carbon) কেন সব জৈব অণুর ভিত্তি?

কার্বন **চারটি বন্ধন** গঠন করতে পারে, ফলে এটি সর্বোচ্চ চারটি অন্যান্য পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হতে সক্ষম।

কার্বন অন্যান্য কার্বনের সাথেও বন্ধন গঠন করতে পারে, যার ফলে দীর্ঘ বা শাখাবিশিষ্ট **কার্বন কাঠামো (Carbon Skeleton)** তৈরি হয়। এছাড়াও কার্বন সাধারণত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনসহ অন্যান্য মৌলের সাথে বন্ধন গঠন করে।

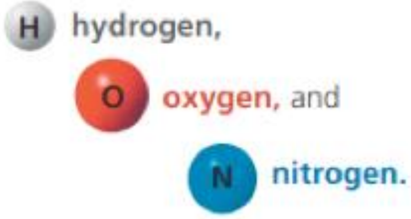

কার্বনযুক্ত কোনো অণুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার কার্বন কাঠামো এবং তাতে যুক্ত বিভিন্ন **রাসায়নিক কার্যকরী মূলক বা গোষ্ঠী (Chemical Functional Groups)**-এর উপর। কার্বনের গঠন ও রাসায়নিক মূলকের বিভিন্ন পার্থক্যের কারণেই বিভিন্ন জৈব অণুর গঠন ও কার্যকারিতা ভিন্ন হয়।

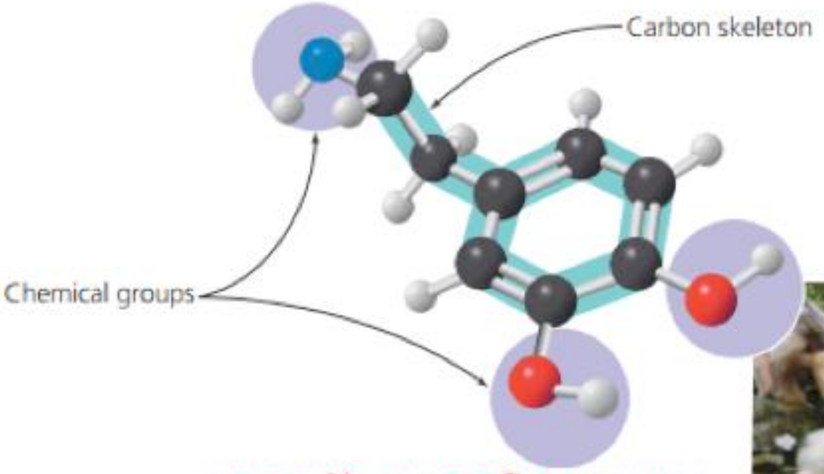

এখানে প্রদর্শিত অণু **ডোপামিন (dopamine) অণুটি** একটি সংকেতবাহী অণু (Signaling Molecule), যার বহু ধরনের কাজ রয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মা ও শিশুর মধ্যে আবেগগত বন্ধন (Mother-Infant Bonding) গঠনে সহায়তা করা।

৫.১ জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) জীবনের উৎপত্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক কারণে, যেসব যৌগে কার্বন থাকে সেগুলোকে **জৈব যৌগ (Organic Compounds)** বলা হয়, এবং এসব যৌগের অধ্যয়নকে বলা হয় **জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)**। জৈব যৌগের পরিসর খুবই বিস্তৃত: মিথেন (CH_4)-এর মতো সহজ অণু থেকে শুরু করে হাজার হাজার পরমাণু নিয়ে গঠিত প্রোটিনের মতো অত্যন্ত জটিল অণু পর্যন্ত।

১৯৫৩ সালে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারল্ড ইউরির (Harold Urey) তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller) জীবনের উৎপত্তি অনুসন্ধানের জন্য অজৈব (জীবহীন) পরিবেশে জৈব যৌগের সংশ্লেষণ নিয়ে একটি পরীক্ষা নকশা করেন। এই পরীক্ষাটি সম্পর্কে বিস্তারিত **চিত্র ৫.১.১**-এ বর্ণনা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে মিলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, আদি পৃথিবীতে বিদ্যমান বৈরী পরিবেশে, যখন কোনো জীব ছিল না, সেই অবস্থায়ও জটিল জৈব অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার নিয়ম মেনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা মঙ্গল গ্রহে পানির অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জেনেছি। আরও দারুণ বিষয় হলো, ২০১৮ সালে নাসা জানায় যে, তাদের পাঠানো কিউরিওসিটি রোভার (Curiosity Rover, মঙ্গলগ্রহ বিচরণ যান), মঙ্গলের একটি গহ্বরে, যেখানে একসময় হ্রদ (বৃহৎ জলাশয়) ছিল, সেখানে কার্বনভিত্তিক যৌগ আবিষ্কার করেছে। যদিও এই যৌগগুলো উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতে পারে অথবা ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে পারে, তবুও একটি সম্ভাবনা হলো এগুলো একসময় মঙ্গলে বসবাসকারী জীবের অবশিষ্টাংশও হতে পারে।

জীবনের প্রধান মৌলগুলোঃ কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), সালফার (S) এবং ফসফরাস (P)—এর সামগ্রিক অনুপাত এক জীব থেকে অন্য জীবের মধ্যে প্রায় একই রকম। এটি সকল জীবের উৎপত্তির একটি সাধারণ এবং একক উৎসকে প্রতিফলিত করে। কার্বনের চারটি বন্ধন গঠনের ক্ষমতার কারণে, উপরে উল্লেখিত সীমিত সংখ্যক কয়েকটি মৌল ব্যবহার করেই অসীম বৈচিত্র্যের জৈব অণু তৈরি করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রজাতির জীব, এমনকি একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন সদস্যদের মধ্যেও, তারা যে ধরনের জৈব অণু তৈরি করে সেগুলো বিশ্লেষণ করে, ঐ প্রজাতি বা সদস্যগুলোর মধ্যকার ভিন্নতা বা পার্থক্য বের করা যায়। বলা যায় যে পৃথিবীতে (এবং জীবাশ্মে) আমরা যে বিপুল জীববৈচিত্র্য দেখি, তা মূলত কার্বন পরমাণুর অনন্য রাসায়নিক বহুমুখীতার (Chemical Versatility) ফল।

৫.২ কার্বন পরমাণু চারটি অন্য পরমাণুর সাথে বন্ধন গঠন করে বিভিন্ন ধরনের অণু তৈরি করতে পারে।

কোনো পরমাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মূল চাবিকাঠি হলো তার ইলেকট্রন বিন্যাস। অর্থাৎ, কোনো পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে তার ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর। এই বিন্যাস নির্ধারণ করে একটি পরমাণু কতটি এবং কী ধরনের বন্ধন অন্য পরমাণুর সাথে গঠন করবে। পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের খোলসে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে, সেগুলোকে ভ্যালেন্স(Valence) ইলেকট্রন বলা হয়। এই ইলেকট্রনগুলিই বন্ধন তৈরিতে অংশ নেয়।

কার্বনের সাথে বন্ধন গঠন।

কার্বন পরমাণুতে মোট ৬টি ইলেকট্রন থাকে। এর মধ্যে ২টি প্রথম খোলসে এবং ৪টি দ্বিতীয় খোলসে থাকে। তাই কার্বনের বাইরের খোলসে ৪টি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে। এই খোলসে সর্বোচ্চ ৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে।

কার্বন সাধারণত তার ৪টি ইলেকট্রন অন্য পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে তার বাইরের খোলস পূর্ণ করে। ফলে সেখানে মোট ৮টি ইলেকট্রন থাকে। দুই পরমাণুর মধ্যে একটি ইলেকট্রন জোড়া ভাগাভাগি হলে তাকে

চিত্র ৫.১.১: প্রাচীন পৃথিবীর মতো বৈরী পরিবেশে কি জৈব অণু তৈরি হতে পারে?

পরীক্ষা (Experiment): ১৯৫৩ সালে স্ট্যানলি মিলার এমন একটি বন্ধ (Closed) ব্যবস্থা তৈরি করেন, যা সে সময় প্রাচীন পৃথিবীতে বিদ্যমান বলে ধারণা করা পরিবেশের অনুকরণ করে। একটি ফ্লাস্কে পানি রাখা হয়, যা আদিম সমুদ্রের প্রতিরূপ ছিল। পানি উত্তপ্ত করা হলে এর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে উপরের আরেকটি ফ্লাস্কে চলে যায়, যেখানে একটি কৃত্রিম বায়ুমণ্ডল (বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ) রাখা ছিল। সেই কৃত্রিম বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ছাড়া হয়, যা বজ্রপাতের অনুকরণ করে।

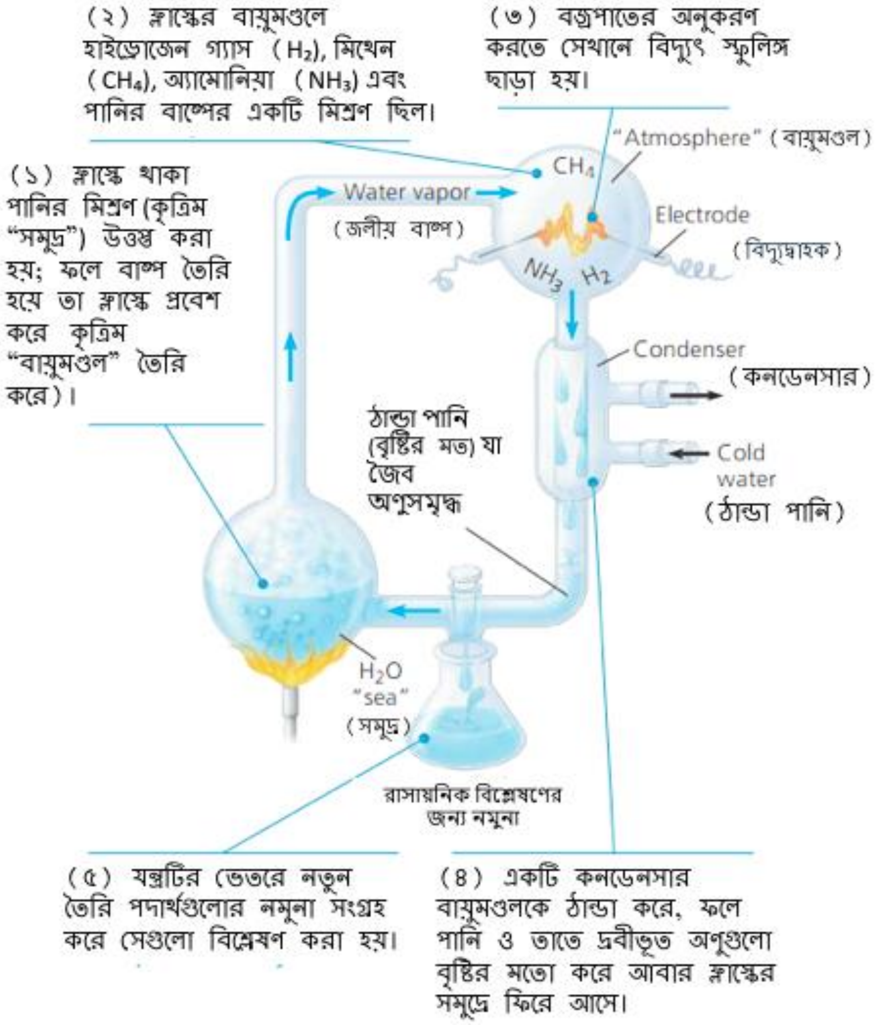

ফলাফল (Results): মিলার পরীক্ষায় এমন অনেক জৈব অণু শনাক্ত করেন, যা জীবের দেহে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল সহজ যৌগ, যেমন ফর্মালডিহাইড (CH_2O) ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN), এবং আরও জটিল অণু, যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড ও কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত অণু, যেগুলোকে **হাইড্রোকার্বন** (Hydrocarbon) বলা হয়। এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন পৃথিবীর মতো পরিবেশে কোনো জীবের উপস্থিতি ছাড়াই জৈব অণু তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল।

উপসংহার (Conclusion): জীবনের উৎপত্তির প্রথম ধাপ হিসেবে জৈব অণু প্রাচীন পৃথিবীতে অজৈবভাবে (Abiotically) সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। যদিও পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাচীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মিলারের পরীক্ষায় ব্যবহৃত "বায়ুমণ্ডল"-এর থেকে ভিন্ন ছিল, তবুও সংশোধিত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে করা সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলোতেও জৈব অণু তৈরি হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: S. L. Miller, "A production of amino acids under possible primitive Earth conditions," Science 117:528–529, 1953)

৩.৩.১)।

জৈব অণুতে কার্বন সাধারণত একক (Single) বা দ্বৈত (Double) সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। প্রতিটি কার্বন পরমাণু এমনভাবে কাজ করে যেন এটি একটি সংযোগস্থল, যেখান থেকে অণু চারদিকে পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বন বড় ও জটিল জৈবঅণু তৈরি করতে সক্ষম।

যখন একটি কার্বন পরমাণু চারটি একক সমযোজী বন্ধন তৈরি করে, তখন তার চারটি হাইব্রিড অরবিটালের বিন্যাস এমন হয় যে বন্ধনগুলো একটি কাল্পনিক চতুর্মুখী (টেট্রাহেড্রোন, Tetrahedron) গঠনের চার কোণের দিকে নির্দেশ করে। মিথেন (CH_4)-এ বন্ধনের কোণ ১০৯.৫° **(চিত্র ৫.১.১ক)**। কার্বন যদি চারটি একক বন্ধন তৈরি করে, তাহলে সাধারণত এই কোণ প্রায় একই থাকে। যেমন, ইথেন (C_2H_6) দেখতে দুইটি আংশিকভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত টেট্রাহেড্রনের মতো **(চিত্র ৫.১.১খ)**। আরও বেশি কার্বনযুক্ত অণুতে, যেসব কার্বন চারটি অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে, সেসব অংশ টেট্রাহেড্রোন আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু যখন দুটি কার্বন একটি দ্বৈত বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়, যেমন ইথিন (C_2H_4)-এ, তখন উভয় কার্বনের বন্ধন একই সমতলে অবস্থান করে। ফলে ঐ কার্বনগুলোর সাথে যুক্ত অন্য পরমাণুগুলোও একই সমতলে থাকে **(চিত্র ৫.১.১গ)**। আমরা সাধারণত অণুকে দ্বিমাত্রিক গাঠনিক সংকেত (Structural Formula) আকারে লিখি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অণু আসলে ত্রিমাত্রিক এবং তার আকৃতি তার কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৫.২.১: তিনটি সরল জৈব অণুর আকৃতি।

অণু ও অণুর আকৃতি Molecule and Molecular Shape	আণবিক সংকেত Molecular Formula	গাঠনিক সংকেত Structural Formula	বল-এন্ড-স্টিক মডেল (গোলাপি রঙে অণুর আকৃতি) Ball-and-Stick Model (molecular shape in pink)	স্পেস-ফিলিং মডেল Space-Filling Model
(ক) মিথেন (Methane): যখন একটি কার্বন পরমাণু চারটি একক বন্ধনের মাধ্যমে চারটি অন্যান্য পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকে, তখন অণুটি টেট্রাহেড্রোল (চতুর্মুখী) আকৃতি ধারণ করে। আণবিক সংকেত: CH_4	CH_4	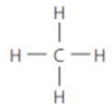	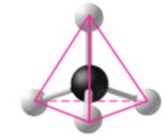	
(খ) ইথেন (Ethane): একটি অণুতে একাধিক টেট্রাহেড্রোল কার্বন গোষ্ঠী থাকতে পারে। ইথেন অণু দুটি এমন টেট্রাহেড্রোল গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। আণবিক সংকেত: C_2H_6	C_2H_6	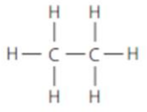	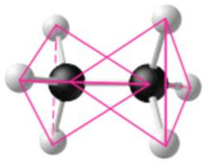	
(গ) ইথিন বা ইথিলিন (Ethene or Ethylene): যখন দুটি কার্বন পরমাণু একটি দ্বৈত বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়, তখন ঐ কার্বনদ্বয়ের সাথে সংযুক্ত সকল পরমাণু একই সমতলে অবস্থান করে; ফলে অণুটি সমতল (planar) হয়। আণবিক সংকেত: C_2H_4	C_2H_4	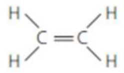	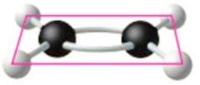	

কোনো পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে যত ইলেকট্রন দরকার, সেটিই সাধারণত তার **যোজ্যতা (Valency/Valence)**, অর্থাৎ সে কতটি সমযোজী বন্ধন তৈরি করতে পারে। কার্বন এবং তার সাধারণ বন্ধন-সঙ্গী: হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—এর যোজ্যতা জৈব অণুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটি পরমাণুই জৈব অণুর প্রধান উপাদান।

চিত্র ৫.২.২: জৈব অণুর প্রধান মৌলগুলোর যোজ্যতা। যোজ্যতা হলো একটি পরমাণু কতটি সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে তার সংখ্যা। সাধারণত কোনো পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ করতে যতটি ইলেকট্রন প্রয়োজন, তার যোজ্যতা সেই সংখ্যার সমান হয়। তবে সোডিয়াম, ফসফরাস এবং ক্লোরিন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কার্বন, যাকে জৈব অণুর মূল ভিত্তি বলা হয়, তার যোজ্যতা (Valency) হলো সাধারণত চার (চতুর্যোজী)।

জৈব যৌগগুলোতে কার্বন পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে বা অন্য মৌলের (যেমন- হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার) সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করে। কার্বন একক, দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তৈরি করতে পারে, তবে সব ক্ষেত্রে এর মোট যোজ্যতা বজায় থাকে।

Criteria (নির্ণায়ক বা মানদণ্ড)	হাইড্রোজেন Hydrogen	অক্সিজেন Oxygen	নাইট্রোজেন Nitrogen	কার্বন Carbon
লুইস ডট গঠন (বিদ্যমান ভ্যালেন্স ইলেকট্রন প্রদর্শিত)	H·	·Ö:	·N̈·	·Ċ·
ইলেকট্রন বন্টন চিত্র (লাল বৃত্ত দ্বারা ভ্যালেন্স শেল পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন নির্দেশিত)		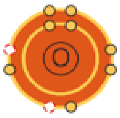	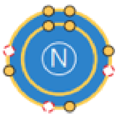	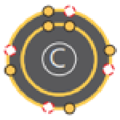
ভ্যালেন্স শেল পূরণে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের সংখ্যা	1	2	3	4
যোজ্যতা (Valence/Valency): একটি মৌল যে সংখ্যক সমযোজী বন্ধন গঠন করতে সক্ষম	1	2	3	4

কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস তাকে বিভিন্ন মৌলের সাথে সমযোজী বন্ধন গঠনে সক্ষম করে। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য পরমাণুর সাথে কার্বনের যোজ্যতা কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার জন্য আমরা দুটি সহজ অণুর উদাহরণ দেখি: কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ইউরিয়া।

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) অণুতে একটি কার্বন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দ্বৈত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এর গাঠনিক সংকেত হলো:

$$O = C = O$$

গাঠনিক সংকেতে প্রতিটি দাগ একটি ভাগাভাগি করা ইলেকট্রন জোড়াকে বোঝায়। তাই CO_2-এ দুটি দ্বৈত বন্ধনে মোট চারটি একক বন্ধনের সমান সংখ্যক ভাগ করা ইলেকট্রন থাকে। এই বিন্যাসে অণুর সব পরমাণুর ভ্যালেন্স শেল পূর্ণ হয়।

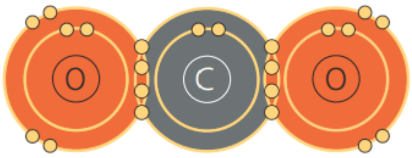

CO_2 খুবই সরল অণু এবং এতে হাইড্রোজেন নেই, তাই এতে কার্বন থাকলেও একে প্রায়ই অজৈব (Inorganic) ধরা হয়। তবে জৈব বা অজৈব যাই বলা হোক না কেন, জীবজগতে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

সালোকসংশ্লেষণকারী জীবের মাধ্যমে CO_2 সমস্ত জৈব অণুর জন্য কার্বনের উৎস হিসেবে কাজ করে (চিত্র ৩.৪.২)।

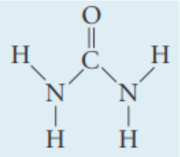

Urea

ইউরিয়া (Urea, $CO(NH_2)_2$) একটি জৈব যৌগ, যা প্রস্রাবে পাওয়া যায়। এখানে প্রতিটি পরমাণু তার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমযোজী বন্ধন গঠন করে। এই অণুতে একটি কার্বন একই সাথে একক ও দ্বৈত বন্ধনে অংশগ্রহণ করে।

ইউরিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, উভয় অণুতেই মাত্র একটি কার্বন পরমাণু আছে। কিন্তু কার্বন তার এক বা একাধিক ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ব্যবহার করে অন্য কার্বন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে। এর ফলে কার্বন পরমাণুগুলো শৃঙ্খল (Chain) আকারে যুক্ত হয়, যেমন C_3H_8 (প্রোপেন)-এ দেখা যায়ঃ

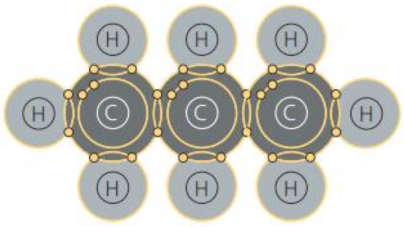

কার্বনের কাঠামোর ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন অণুর আণবিক বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয়। (Molecular Diversity Arising from Variation in Carbon Skeletons)

কার্বনের শৃঙ্খল (Chain, চেইন) অধিকাংশ জৈব অণুর মূল ভিত্তি তৈরি করে। এই কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্যে ভিন্ন হতে পারে, আবার সোজা, শাখাযুক্ত বা বদ্ধ বলয় (Ring, রিং) আকারেও থাকতে পারে **(চিত্র ৫.২.৩)**। কিছু কার্বন শৃঙ্খলে দ্বি-বন্ধন বা ডাবল বন্ড (Double Bond) থাকে, যা সংখ্যা ও অবস্থানে ভিন্ন হতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতা জীবিত পদার্থের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং প্রধান উৎস। এছাড়া জৈব অণুর কার্বন কঙ্কাল বা কাঠামোর (Skeleton) সাথে অক্সিজেন ও ফসফরাসের মতো অন্যান্য মৌলের পরমাণুও যুক্ত থাকতে পারে।

চিত্র ৫.২.৩: কার্বন কঙ্কাল বা কাঠামো চারভাবে ভিন্ন হতে পারে।

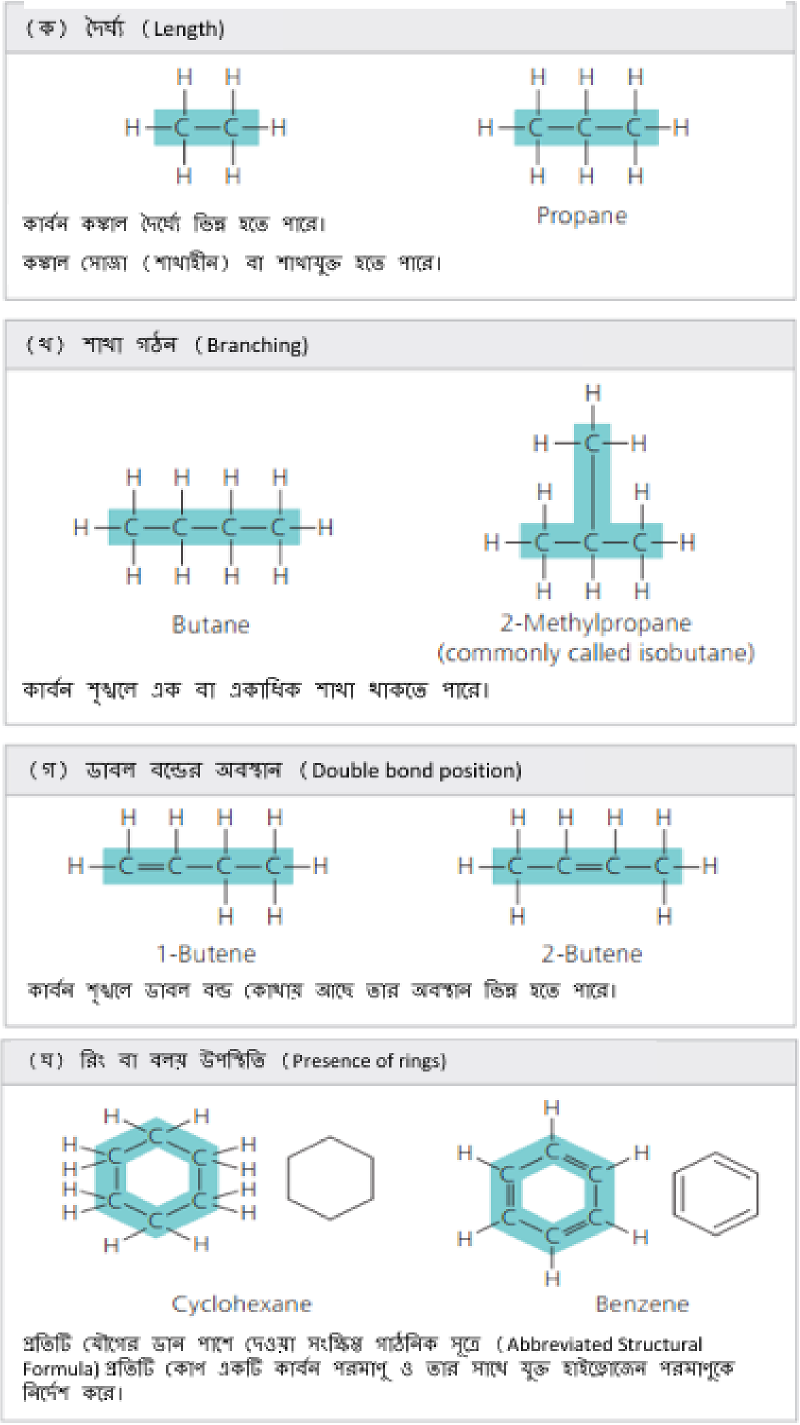

হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbons:): চিত্র ৫.২.১-এ দেখানো সব অণুই হাইড্রোকার্বন, অর্থাৎ যেসব জৈব অণু শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত। কার্বনের সাথে যেখানে কোভ্যালেন্ট বন্ধনের জন্য ইলেকট্রন খালি থাকে, সেখানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়। হাইড্রোকার্বন হলো পেট্রোলিয়ামের (Petroleum) প্রধান উপাদান। পেট্রোলিয়ামকে **জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel)** বলা হয়, কারণ এটি লক্ষ লক্ষ বছর আগে বেঁচে থাকা জীবের পচন থেকে তৈরি হয়েছে।

যদিও অধিকাংশ জীবের দেহে হাইড্রোকার্বন খুব বেশি পরিমাণে থাকে না, কোষের কিছু জৈব অণুর অংশ কেবল কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, কোষের স্নেহজাতীয় পদার্থ বা চর্বির (লিপিড বা ফ্যাট, Lipid or Fat) অণুতে হাইড্রোকার্বনগুলো লেজের মত করে লাগানো থাকে **(চিত্র ৫.২.৪)**। পেট্রোলিয়াম ও চর্বি কোনোটিই পানিতে দ্রবীভূত হয় না; এরা **জলবিমুখ (হাইড্রোফোবিক, Hydrophobic)**, কারণ এদের অধিকাংশ বন্ধনই

অমেরু কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন (Nonpolar carbon-to-hydrogen linkages)।

হাইড্রোকার্বনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি নির্গত করতে সক্ষম। গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসোলিন (Gasoline) হাইড্রোকার্বনসমৃদ্ধ, এবং উদ্ভিদের ভ্রূণ (বীজ) ও প্রাণীর শরীরে বিদ্যমান স্নেহজাতীয় পদার্থের হাইড্রোকার্বনগুলো তাদের সঞ্চিত শক্তির (Stored Fuel) উৎস হিসেবে কাজ করে।

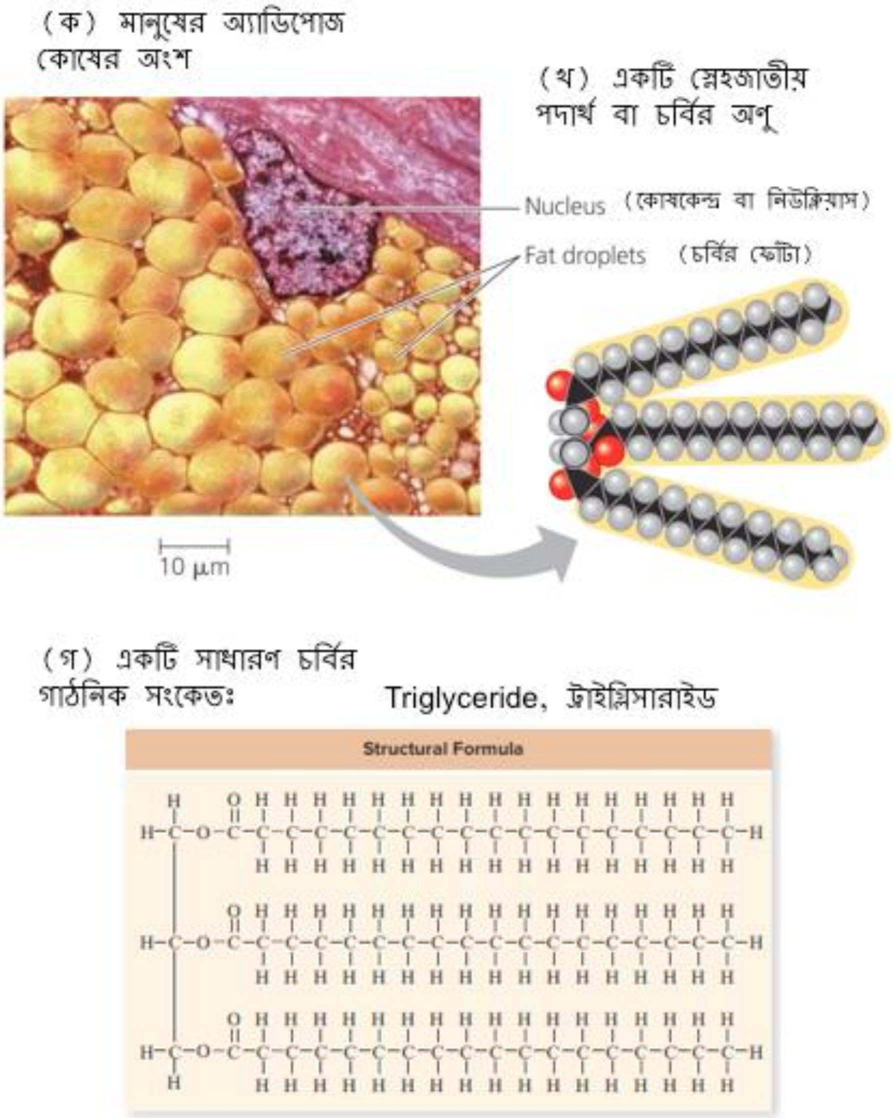

চিত্র ৫.২.৪: চর্বিতে (ফ্যাটে) হাইড্রোকার্বনের ভূমিকা। (ক) স্তন্যপায়ী প্রাণীর অ্যাডিপোজ (Adipose) কোষগুলো শক্তিকে চর্বির (Fat, ফ্যাট) অণু হিসেবে জমা করে রাখে। নিচের রঙিন মাইক্রোগ্রাফে (Micrograph) মানুষের একটি অ্যাডিপোজ কোষের অংশ দেখা যাচ্ছে, যেখানে অনেক চর্বির ফোঁটা (Droplet) রয়েছে। মাইক্রোগ্রাফ (Micrograph) হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্যে কোনো অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণকৃত বা তোলা ছবি বা আলোকচিত্র। এটি আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে, যা খালি চোখে অদৃশ্য বস্তু যেমন কোষ, জীবাণু বা ভাইরাসের গঠন দেখাতে সক্ষম। নিচের মাইক্রোগ্রাফটিতে প্রতিটি চর্বির ফোঁটার মধ্যে অসংখ্য স্নেহজাতীয় পদার্থ বা চর্বির অণু থাকে। (খ) একটি চর্বির অণু সাধারণত তিনটি হাইড্রোকার্বন লেজ নিয়ে গঠিত। এই লেজগুলোর কারণেই চর্বি জলবিমুখ (পানিতে অদ্রবণীয় বা মিশে না, Hydrophobic) আচরণ করে। কোষ পরবর্তীতে শক্তি পাওয়ার জন্য এই লেজগুলো ভেঙে ফেলে। চর্বিই কোষের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। [কালো(Black) = কার্বন; ধূসর(Gray) = হাইড্রোজেন; লাল (Red)= অক্সিজেন] (গ) একটি সাধারণ চর্বির গাঠনিক সংকেত (Structural Formula): সাধারণ চর্বি বা ফ্যাট (এখানে ট্রাইগ্লিসারাইড, Triglyceride) মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত, যা পানিতে অদ্রবণীয় এবং শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

জৈব যৌগের সমাবয়বতা (Isomerism)।

জৈব যৌগের **সমাবয়বতা (Isomerism)** হলো এমন একটি বিষয় যেখানে একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট

যৌগগুলোর গাঠনিক বিন্যাস ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে ভিন্নতা দেখা দেয়। এই ভিন্ন ভিন্ন যৌগগুলোকে একে অপরের **সমাণু বা আইসোমার (Isomer)** বলা হয়। জৈব অণুর গঠন বা স্থাপত্যগত (Architecture) ভিন্নতা আইসোমার (Isomers)-এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আবারো সহজ ভাষায়, সমাণু বা আইসোমার হলো এমন যৌগ, যাদের একই আণবিক সূত্র (Molecular Formula) এবং একই প্রকার ও সমসংখ্যক পরমাণু থাকে, কিন্তু গাঠনিক বিন্যাস (Structure) ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন হয়। এখানে তিন প্রকার আইসোমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে: গাঠনিক আইসোমার (Structural Isomers), সিস-ট্রান্স আইসোমার (Cis-trans isomers / Geometric isomers), এবং এনানশিওমার (Enantiomers)।

গাঠনিক আইসোমার (Structural isomers): গাঠনিক আইসোমার পরমাণুর সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বিন্যাসে (Covalent Arrangement) ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, C_5H_{12} আণবিক সূত্রবিশিষ্ট দুটি যৌগের কার্বন কঙ্কাল (Carbon Skeleton) একটিতে সরল (Straight) এবং অন্যটিতে শাখাবিশিষ্ট (Branched) **(চিত্র ৫.২.৫ক)**। কার্বন কঙ্কালের আকার বড় হলে সম্ভাব্য আইসোমারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন C_5H_{12}-এর মাত্র তিনটি রূপ রয়েছে, কিন্তু C_8H_{18}-এর ১৮টি এবং $C_{20}H_{42}$-এর ৩৬৬,৩১৯টি সম্ভাব্য গাঠনিক আইসোমার

চিত্র ৫.২.৫: তিন ধরনের আইসোমার। আইসোমার হলো এমন যৌগ যাদের একই আণবিক সূত্র (Molecular Formula) থাকে কিন্তু গঠন ভিন্ন হয়।

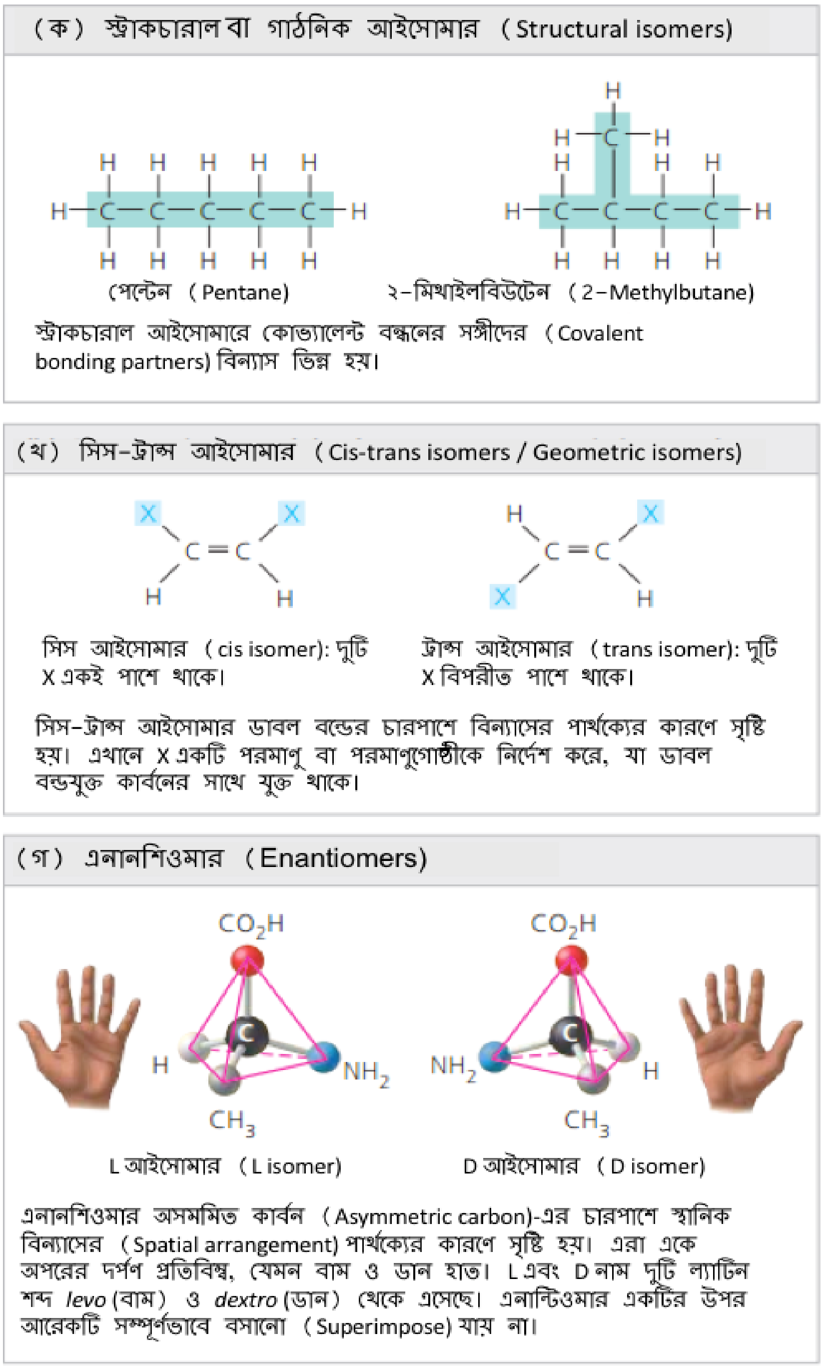

থাকতে পারে। দ্বি-বন্ধন বা ডাবল বন্ডের (Double Bond) অবস্থান ভিন্ন হলেও গাঠনিক আইসোমার সৃষ্টি হতে পারে।

সিস-ট্রান্স বা জ্যামিতিক আইসোমার (Cis-trans isomers / Geometric isomers): সিস-ট্রান্স বা জ্যামিতিক (Geometric) আইসোমারে কার্বন একই পরমাণুর সাথে কোভ্যালেন্ট বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ডাবল বন্ডের অনমনীয়তা (Inflexibility of double bonds)-এর কারণে তাদের স্থানিক বিন্যাস (Spatial Arrangement) ভিন্ন হয়। সিঙ্গেল বন্ড (Single Bond) বা একক বন্ধন পরমাণুগুলোকে অক্ষের চারদিকে অবাধ ঘূর্ণন (Free Rotation) অনুমোদন করে, কিন্তু ডাবল বন্ড এ ধরনের ঘূর্ণনকে বাধা দেয়।

যদি দুটি কার্বন পরমাণু ডাবল বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে এবং প্রতিটি কার্বনের সাথে দুটি ভিন্ন পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠী যুক্ত থাকে, তবে দুটি স্বতন্ত্র রূপ সম্ভব। একই পাশে থাকলে সেটি সিস আইসোমার (Cis isomer) এবং বিপরীত পাশে থাকলে সেটি ট্রান্স আইসোমার (Trans isomer)। **চিত্র ৫.২.৫খ-এ** প্রতিটি কার্বনের সাথে একটি করে হাইড্রোজেন (H) এবং একটি করে কাল্পনিক X পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠী যুক্ত রয়েছে। ডাবল বন্ডের একই পাশে যদি উভয় X অবস্থান করে, তবে তাকে সিস আইসোমার (Cis isomer) বলা হয়; আর ডাবল বন্ডের বিপরীত পাশে যদি X দুটি অবস্থান করে, তবে তাকে ট্রান্স আইসোমার (Trans isomer) বলা হয়।

সিস-ট্রান্স আইসোমারগুলোর মধ্যকার এই সূক্ষ্ম আকারগত পার্থক্য জৈব অণুর জৈবিক কার্যকলাপে (Biological Activity) গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টিশক্তির জৈবরসায়নে (Biochemistry of Vision) রেটিনাল (Retinal) নামের চোখের রাসায়নিক যৌগটি আলো-প্রণোদিত (Light-induced) পরিবর্তনের মাধ্যমে সিস রূপ থেকে ট্রান্স রূপে রূপান্তরিত হয়। আবার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় যে ট্রান্স ফ্যাট বা চর্বি (Trans fats) উৎপন্ন হয়, তা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এনানশিওমার (Enantiomers): এনানশিওমার হলো এমন আইসোমার, যারা একে অপরের দর্পণ-প্রতিবিম্ব (Mirror Images) এবং একটি অসমমিত বা অপ্রতিসম কার্বন (Asymmetric carbon বা Chiral carbon)-এর উপস্থিতির কারণে গঠনে ভিন্নতা প্রদর্শন করে। অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন বলতে এমন কার্বনকে বোঝায়, যা চারটি ভিন্ন পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত থাকে। এই চারটি গোষ্ঠী স্থানিকভাবে (In space), অর্থাৎ যেকোনো জায়গায় দুটি ভিন্ন উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারে, যা একে অপরের দর্পণ-প্রতিবিম্ব **(চিত্র ৫.২.৫গ)**। অর্থাৎ, এনানশিওমার (Enantiomers) হলো এমন এক জোড়া আইসোমার, যারা একে অপরের আয়নার ছবির মতো কিন্তু পরস্পরের ওপর সমাপতিত (Superimposable) হয় না, একটির উপর আরেকটি রাখলে পুরোপুরি মিলে যায় না (অ-সমাপতিত, Non-superimposable)।

এনানশিওমারকে আমাদের হাতের তালুর সাথে তুলনা করা যায়। ডান হাত বাম হাতের দর্পণ প্রতিবিম্ব, কিন্তু একে অপরের ওপর বসালে মিলে যায় না। তাই একটি এনানশিওমারকে ডান-হাতি (Right-handed) ও আরেকটিকে বাম-হাতি (Left-handed) বলা যায়। সাধারণত জীবদেহে কেবল একটি এনানশিওমার জৈবিকভাবে সক্রিয় (Biologically active), কারণ কোষের নির্দিষ্ট রিসেপ্টর (Receptor, গ্রাহক অণু) বা প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হওয়ার (Binding) জন্য অণুর নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক বিন্যাস (Three-dimensional configuration) প্রয়োজন।

ঔষধ শিল্পে (Pharmaceutical Industry) এনানশিওমারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, কারণ কোনো ওষুধের (Drug) দুটি এনানশিওমারের কার্যকারিতা সমান নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আইবুপ্রোফেন (Ibuprofen) এবং অ্যালবিউটেরল (Albuterol)-এর ক্ষেত্রে দুটি এনানশিওমারের কার্যকারিতায় পার্থক্য রয়েছে **(চিত্র ৫.২.৬)**। মেথঅ্যামফেটামিন

(Methamphetamine)-এরও দুটি এনানশিওমার রয়েছে, যাদের প্রভাব ভিন্ন। এর একটি অত্যন্ত আসক্তিকর মাদক, অন্যটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং নাক বন্ধের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনহেলারে (Inhaler) সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে জীবজগৎ আণবিক গঠনের বা স্থাপত্যের (Molecular Architecture) সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের প্রতিও সংবেদনশীল, এবং অণুর উদ্ভূত ধর্ম (Emergent Properties) তাদের পরমাণুর সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

৫.৩ অণুর কার্যকারিতায় (Molecular Function) কয়েকটি প্রধান রাসায়নিক গ্রুপের (Chemical groups) ভূমিকা।

কোনো জৈব অণুর (Organic Molecule) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কেবল তার কার্বন কাঠামো বা কঙ্কাল (Carbon Skeleton)-এর বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সেই কাঠামোর সাথে যুক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক গ্রুপ বা গোষ্ঠীর উপস্থিতি ও প্রকৃতিও জৈব অণুর কার্যকারিতা নির্ধারণে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এসব গ্রুপ কখনও সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, আবার কখনও অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন (Three-dimensional molecular shape) পরিবর্তনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করে। এভাবেই

চিত্র ৫.২.৬: এনানশিওমারের ঔষধগত বা ফার্মাকোলজিক্যাল (Pharmacological) গুরুত্ব। আইবুপ্রোফেন (Ibuprofen) এবং অ্যালবিউটেরল (Albuterol) এমন দুটি ওষুধ, যাদের এনানশিওমারসমূহ (Enantiomers) ভিন্ন জৈবিক প্রভাব প্রদর্শন করে। এখানে এনান্টিওমার পার্থক্য বোঝাতে D এবং L এর পরিবর্তে S এবং R সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। আইবুপ্রোফেন সাধারণত দুই এনানশিওমারের মিশ্রণ (Racemic mixture, রেসিমিক মিশ্রণ) আকারে বাজারজাত করা হয়। এর মধ্যে S এনানশিওমার R রূপের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ অধিক কার্যকর। অপরদিকে, অ্যালবিউটেরল কেবলমাত্র R এনানশিওমার রূপে সংশ্লেষিত (Synthesized) ও বিক্রি করা হয়, কারণ S এনানশিওমারটি সক্রিয় R রূপের কার্যকারিতাকে প্রতিহত (Counteract) করে।

Drug	Effects	Effective Enantiomer	Ineffective Enantiomer
ওষুধ	প্রভাব	কার্যকর এনানশিওমার	অকার্যকর এনানশিওমার
Ibuprofen আইবুপ্রোফেন	প্রদাহ (Inflammation) ও ব্যথা (Pain) কমায়।	S-Ibuprofen	R-Ibuprofen
Albuterol অ্যালবিউটেরল	ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বাসনালীর (Bronchial/airway) পেশী শিথিল (Relaxes) করে, ফলে হাঁপানি (Asthma) রোগীদের শ্বাসপ্রবাহ (Airflow) উন্নত হয়।	R-Albuterol	S-Albuterol

রাসায়নিক গ্রুপগুলো প্রতিটি অণুকে তার স্বকীয় ধর্ম অর্জন করতে সাহায্য করে।

জীবনের প্রক্রিয়ায় (Processes of Life) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গ্রুপসমূহ।

এস্ট্রাডিয়ল (Estradiol) এবং টেস্টোস্টেরন (Testosterone)-এই দুইটি জৈবযৌগের পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে জীবপ্রক্রিয়ায় (Biological Processes) রাসায়নিক গ্রুপগুলোর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। এরা মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষ যৌন হরমোন (Sex Hormones) হিসেবে কাজ করে। উভয়ই স্টেরয়েড (Steroids), অর্থাৎ চারটি সংযুক্ত বলয় (Four fused rings) বিশিষ্ট অভিন্ন কার্বন কঙ্কালযুক্ত জৈব যৌগ।

তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল বলয়সমূহের সাথে যুক্ত রাসায়নিক গ্রুপগুলোর (Chemical groups) মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, তাদের বলয়সমূহের সাথে যুক্ত রাসায়নিক গ্রুপগুলোই শুধু ভিন্ন। নিচে তাদেরকে সংক্ষিপ্ত গাঠনিক রূপে (Abbreviated form) দেখানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি কোণ একটি কার্বন (Carbon) এবং তার সাথে যুক্ত হাইড্রোজেনসমূহকে নির্দেশ করে। অণুর স্থাপত্যগত (Molecular architecture) যে পার্থক্যগুলো রয়েছে, অর্থাৎ রাসায়নিক গ্রুপগুলোর ভিন্নতা, সেগুলো নীল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।

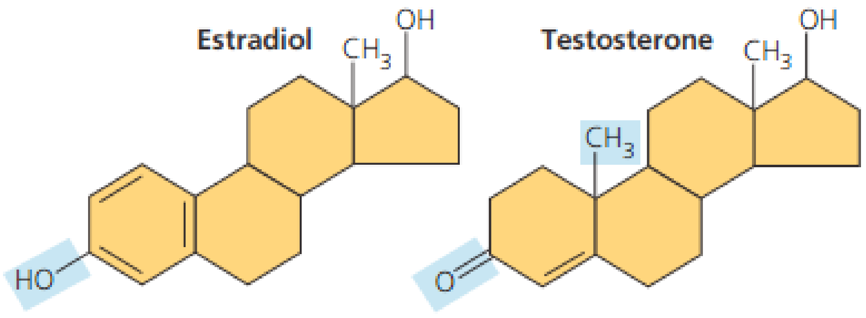

এস্ট্রাডিয়ল (Estradiol) এবং টেস্টোস্টেরন (Testosterone)-এর মধ্যকার এই ক্ষুদ্র গাঠনিক পার্থক্য শরীরের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে (Targets) ভিন্ন জৈবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পুরুষ ও নারী মেরুদণ্ডীদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের ভিত্তি গঠন করে। এখানে রাসায়নিক গ্রুপসমূহ অণুর আকার (Molecular shape) পরিবর্তনের মাধ্যমে অণুর কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, কিছু রাসায়নিক গ্রুপ আবার সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে; এদেরকে কার্যকরী মূলক (ফাংশনাল গ্রুপ, functional groups) বলা হয়। প্রতিটি কার্যকরী মূলকের নির্দিষ্ট আকৃতি (Shape) ও আধান (Charge) রয়েছে, যা তাদের বৈশিষ্ট্যগত বিক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ করে। রাসায়নিক কার্যকরী মূলকগুলোকে অনেকসময় ক্রিয়াশীল মূলক বা পরিচায়ক শ্রেণিও বলা হয়।

জীবপ্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সাতটি কার্যকরী মূলকগুলো হলো: হাইড্রক্সিল (Hydroxyl), কার্বোনিল (Carbonyl), কার্বক্সিল (Carboxyl), অ্যামিনো (Amino), সালফহাইড্রিল (Sulfhydryl), ফসফেট (Phosphate), এবং মিথাইল (Methyl) গ্রুপ।

প্রথম ছয়টি গ্রুপ রাসায়নিকভাবে সক্রিয় (Chemically reactive); এর মধ্যে সালফহাইড্রিল (Sulfhydryl) ব্যতীত বাকি সবই জল-আকর্ষী বা হাইড্রোফিলিক (Hydrophilic) এবং জৈব যৌগের পানিতে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি করে। মিথাইল গ্রুপ (Methyl group) তুলনামূলকভাবে অপ্রতিক্রিয়াশীল, তবে এটি প্রায়শই জৈব অণুর উপর একটি শনাক্তকারী চিহ্ন (Recognizable Tag) হিসেবে কাজ করে। স্বাভাবিক কোষীয় pH (Cellular pH)-এ কার্বক্সিল গ্রুপ (Carboxyl group) ও অ্যামিনো গ্রুপ (Amino group) আয়নিত (Ionized) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। চিত্র ৫.৩.১-এ জীবপ্রক্রিয়ায় (Biological Processes) রাসায়নিক গ্রুপগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

চিত্র ৫.৩.১: জীববিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাসায়নিক গ্রুপ।

রাসায়নিক গ্রুপ (Chemical Group)	**গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ও যৌগের নাম (Group Properties & Compound Name)**	**উদাহরণ (Examples)**
হাইড্রক্সিল গ্রুপ (Hydroxyl group, —OH) 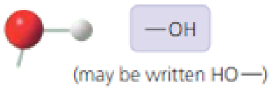	হাইড্রক্সিল গ্রুপটি মেরু বা পোলার (Polar), কারণ অক্সিজেন হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন বেশি আকর্ষণ করে। গ্রুপটি পানির সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen bonding) গঠন করে, ফলে জৈব যৌগের দ্রবণীয়তা (Solubility) বৃদ্ধি পায়। যৌগের নাম: অ্যালকোহল (Alcohol, -ol), এই গ্রুপটি যেসমস্ত যৌগে থাকে তাদের নাম সাধারণত -অল (োল) দিয়ে শেষ হয়।	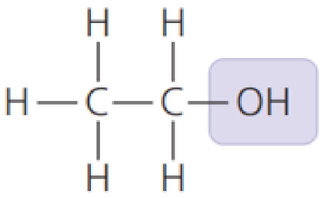 ইথানল (Ethanol), যা মদ জাতীয় পানীয়ে উপস্থিত
কার্বোনিল গ্রুপ (Carbonyl group, >C=O) 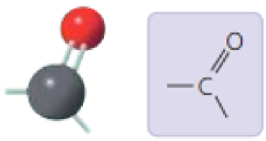	শর্করা (Sugars)-তে কার্বোনিল গ্রুপটি কিটোন (Ketone) বা অ্যালডিহাইড (Aldehyde) আকারে থাকে। যৌগের নাম: কিটোন (Ketone) — যদি কার্বোনিল গ্রুপ কার্বন কঙ্কালের (Carbon skeleton) ভিতরে থাকে;	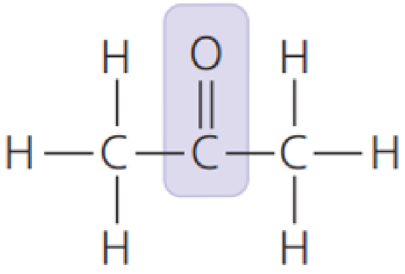 অ্যাসিটোন (Acetone), সবচেয়ে সরল কিটোন

	অ্যালডিহাইড (Aldehyde) — যদি প্রান্তে থাকে	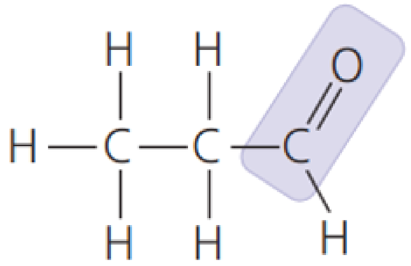 প্রোপানাল (Propanal), একটি অ্যালডিহাইড
কার্বক্সিল গ্রুপ (Carboxyl group, —COOH) 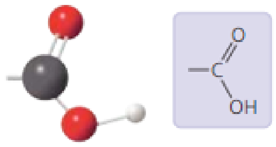	এটি অ্যাসিড (Acid) হিসেবে কাজ করে; H^+ দান করতে পারে, কারণ O–H বন্ধন মেরু। যৌগের নাম: কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (Carboxylic acid) বা জৈব অ্যাসিড (Organic acid)	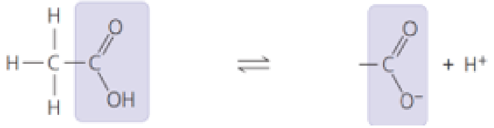 অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Acetic acid), যা ভিনেগারের টক স্বাদের জন্য দায়ী। গ্রুপটির আয়নিত রূপঃ —COO^-, যা কোষে পাওয়া যায়
অ্যামিনো গ্রুপ (Amino group, —NH_2) 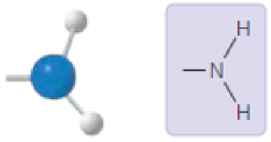	এটি ক্ষার (Base) হিসেবে কাজ করে; H^+ গ্রহণ করতে পারে। যৌগের নাম: অ্যামিন (Amine)	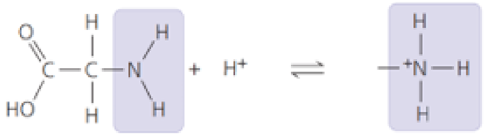 গ্লাইসিন (Glycine), একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acid)। আয়নিত রূপঃ —NH_3^+, যা কোষে পাওয়া যায়
সালফহাইড্রিল গ্রুপ (Sulfhydryl group, —SH) 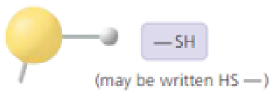	দুটি —SH গ্রুপের মধ্যে ডিসালফাইড বন্ধন (Disulfide bond) তৈরি হয়ে প্রোটিনের (Protein) গঠন স্থিতিশীল করে। যৌগের নাম: থিওল (Thiol)	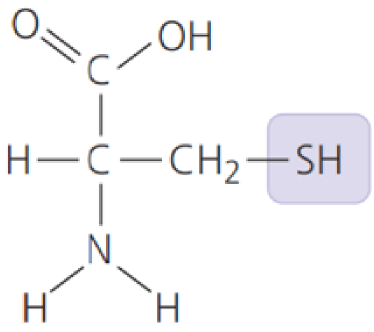 সিস্টেইন (Cysteine), সালফারযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড

ফসফেট গ্রুপ (Phosphate group, —OPO_3^{2-}) 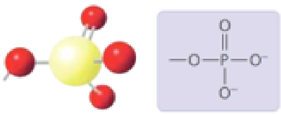	শক্তি স্থানান্তরে (Energy Transfer) জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পানির সাথে বিক্রিয়ায় শক্তি মুক্ত করতে পারে। যৌগের নাম: জৈব ফসফেট (Organic phosphate)	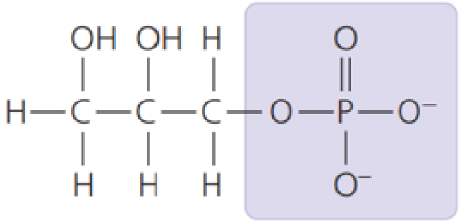 গ্লিসারল ফসফেট (Glycerol phosphate), কোষে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে
মিথাইল গ্রুপ (Methyl group, —CH_3) 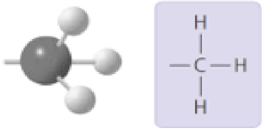	জিনের প্রকাশ (Gene expression) প্রভাবিত করতে পারে। সাধারণত বিক্রিয়াশীল নয়। যৌগের নাম: মিথাইলেটেড বা মিথাইলযুক্ত যৌগ (Methylated compound)	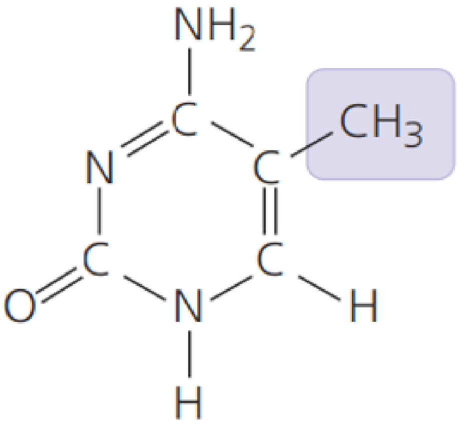 ৫-মিথাইলসাইটোসিন (5-methylcytosine), DNA-তে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হলে তৈরি হয়

কোষীয় প্রক্রিয়ার জন্য শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস: ATP (এটিপি)

চিত্র ৫.৩.১-এর "ফসফেট গ্রুপ" সারিতে একটি সহজ **জৈব ফসফেট অণুর** উদাহরণ দেখানো হয়েছে। এর তুলনায় আরও জটিল একটি জৈব ফসফেট হলো **Adenosine Triphosphate (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট,** ATP), যা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ কোষের মধ্যে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ATP একটি জৈব অণু **অ্যাডেনোসিন (Adenosine)** এবং তার সাথে যুক্ত তিনটি ফসফেট গ্রুপের একটি শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত।

যখন ATP-তে ধারাবাহিকভাবে তিনটি ফসফেট গ্রুপ থাকে, তখন পানির সাথে একটি বিক্রিয়ার ফলে একটি ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই বিচ্ছিন্ন **অজৈব ফসফেট আয়ন** ($HOPO_3^{2-}$)-কে এই বইয়ে সাধারণত P_i দ্বারা সংক্ষেপে বোঝানো হয়েছে। একইভাবে, কোনো জৈব অণুর সাথে যুক্ত ফসফেট গ্রুপকে প্রায়ই P হিসেবে লেখা হয়। একটি ফসফেট গ্রুপ হারালে ATP রূপান্তরিত হয়ে **Adenosine Diphosphate (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট,** ADP)-তে পরিণত হয়।

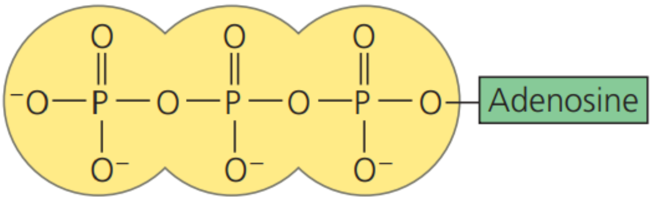

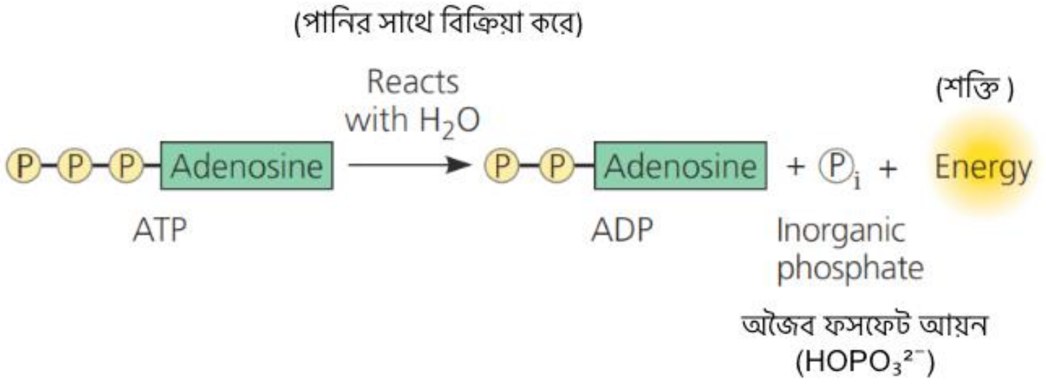

ATP-কে অনেক সময় শক্তি সঞ্চয়কারী অণু বলা হয়। তবে আরও সঠিকভাবে বলা যায়, ATP এমন একটি অণু যা পানি বা অন্য অণুর সাথে বিক্রিয়া করার **বিভব শক্তি বা স্থিতিশক্তি (Potential Energy)** ধারণ করে রাখে। এই বিক্রিয়ার ফলে শক্তি মুক্ত হয় এবং সেই শক্তি কোষ বিভিন্ন জৈবিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহার করে। অর্থাৎ, ATP হলো জীবকোষের প্রধান শক্তি সরবরাহকারী অণু, যাকে "জৈবমুদ্রা" বা "শক্তি মুদ্রা" (Biological Currency) বলা হয়। কোষে শক্তি সঞ্চয়, পরিবহন এবং পেশী সংকোচন, স্নায়ু উদ্দীপনা, ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই শক্তি ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

জীবনের রাসায়নিক উপাদানসমূহ: একটি পর্যালোচনা

জীবন্ত পদার্থ (Living Matter) বা জীব প্রধানত কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত; পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণে সালফার ও ফসফরাস উপস্থিত থাকে। এসব উপাদান শক্তিশালী সমযোজী বন্ধন গঠন করতে সক্ষম, যা জটিল জৈব অণুর গঠন তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন সমযোজী বন্ধন গঠনে বিশেষভাবে পারদর্শী। কার্বনের এই বহুমুখী বন্ধনক্ষমতার ফলেই বিপুল বৈচিত্র্যময় জৈব অণুর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি জৈব অণুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য মূলত তার কার্বন-ভিত্তিক কাঠামোর অনন্য বিন্যাস এবং সেই কাঠামোর সাথে যুক্ত বিভিন্ন কার্যকরী রাসায়নিক গ্রুপের উপর নির্ভর করে। আণবিক স্তরে জৈব অণুর এই বৈচিত্র্যই আমাদের গ্রহে বিদ্যমান সমৃদ্ধ জৈব বৈচিত্র্যের (Biological Diversity) মৌলিক ভিত্তি প্রদান করে।

অনুশীলনী ৫

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। চিত্র ৫.১.১-এ মিলার একটি নিয়ন্ত্রণিত (Control) পরীক্ষা করেছিলেন যেখানে কোনো বৈদ্যুতিক স্পার্ক (Sparks) প্রয়োগ করা হয়নি এবং তিনি কোনো জৈব যৌগ (Organic compounds) পাননি। এই ফলাফলের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

২। যদি মিলার তার পরীক্ষায় NH_3 (অ্যামোনিয়া)-এর ঘনত্ব বাড়িয়ে দিতেন, তাহলে উৎপন্ন পদার্থ HCN এবং CH_2O-এর আপেক্ষিক পরিমাণ কীভাবে ভিন্ন হতে পারত?

৩। (ক) C_2H_4-এর একটি গাঠনিক সূত্র (Structural formula) অঙ্কন কর।

(খ) $C_2H_2Cl_2$-এর ট্রান্স আইসোমার (Trans isomer) অঙ্কন কর।

৪। চিত্র ৫.২.৩-এ কোন দুটি অণুর জোড়া আইসোমার? প্রতিটি জোড়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আইসোমার (Isomer) তা নির্ধারণ কর।

৫। পেট্রোল (Gasoline) এবং চর্বি (Fat) রাসায়নিকভাবে কীভাবে পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

৬। চিত্র ৫.২.৩ (ক) এবং চিত্র ৫.২.৫ দেখ। প্রোপেন (C_3H_8) কি আইসোমার গঠন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

৭। গ্লাইসিন (Glycine), একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid)। এখানে "অ্যামিনো অ্যাসিড" শব্দটি অণুর গঠন সম্পর্কে রাসায়নিকভাবে কী নির্দেশ করে? (চিত্র ৫.৩.১ দেখ।)

৮। যখন Adenosine triphosphate (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) পানির সাথে বিক্রিয়া করে এবং শক্তি মুক্ত করে, তখন কোন ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে?

৯। ধরা যাক তোমার কাছে সিস্টেইন (Cysteine)-এর মতো একটি জৈব অণু আছে (চিত্র ৫.৩.১-এ সালফহাইড্রিল গ্রুপ (Sulfhydryl group, —SH)-এর উদাহরণ দেখ)। তুমি রাসায়নিকভাবে $-NH_2$ গ্রুপটি সরিয়ে —COOH গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপন করো,

- এবং এর নতুন অণুর গঠন অঙ্কন কর।
- এতে অণুটির রাসায়নিক ধর্ম কীভাবে পরিবর্তিত হবে?
- পরিবর্তনের আগে কি কেন্দ্রীয় কার্বন অসমমিত (Asymmetric) বা অপ্রতিসম (Chiral) ছিল?
- পরিবর্তনের পরে কি তা অপ্রতিসম (Chiral) থাকবে?

১০। জৈব রসায়নের (Organic Chemistry)-এর সংজ্ঞা দাও।

১১। নিচের অণুটিতে কোন কার্যকরী মূলক (Functional Group) উপস্থিত আছে?

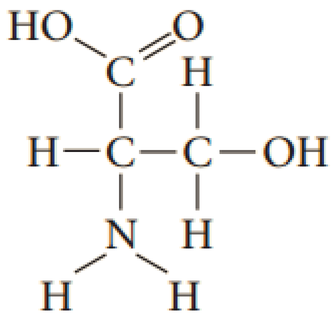

১২। নিম্নলিখিত প্রতিটি হাইড্রোকার্বনের গাঠনিক সূত্র কল্পনা কর। এদের মধ্যে কোনটির কার্বন কঙ্কালে দ্বি-বন্ধন (Double bond) রয়েছে?

(ক C_3H_8

(খ) C_2H_6

(গ) C_2H_4

(ঘ) C_2H_2

১৩। নিচের দুইটি চিনির অণুর (Sugar molecules) পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে কোনধরনের সমাবয়বতা (Isomerism) বলা যায়?

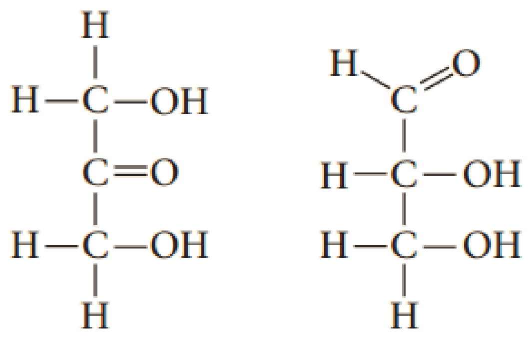

(ক) গাঠনিক আইসোমার (Structural isomers)

(খ) সিস-ট্রান্স বা জ্যামিতিক আইসোমার (Cis-trans isomers / Geometric isomers)

(গ) এনানশিওমার (Enantiomers)

(ঘ) সমস্থানিক বা আইসোটোপ (Isotopes)

১৪ । নিচের অণুটিতে অসমমিত (Asymmetric) বা অপ্রতিসম (Chiral) শনাক্ত কর।

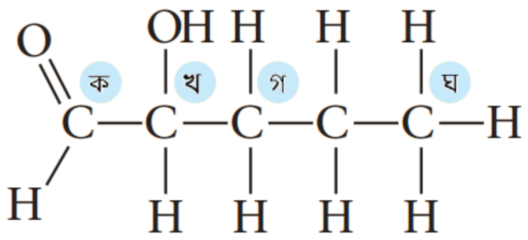

১৫। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবন কার্বনের পরিবর্তে সিলিকন-এর উপর ভিত্তি করে হতে পারে। সিলিকনের ইলেকট্রন বণ্টন চিত্র অঙ্কন কর। সিলিকনের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো কার্বনের সাথে মিল রয়েছে, যা সিলিকন-ভিত্তিক জীবনের সম্ভাবনাকে নিয়ন বা অ্যালুমিনিয়াম-ভিত্তিক জীবনের চেয়ে বেশি সম্ভাব্য করে তোলে?

১৬। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, গর্ভবতী নারীদের সকালে বমি বমিভাব (Morning sickness, সকাল বেলার অসুস্থতা) কমানোর জন্য থ্যালিডোমাইড (Thalidomide) দেওয়া হলে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়। থ্যালিডোমাইড দুইটি এনানশিওমার (Enantiomer) -এর মিশ্রণ: একটি বমিভাব কমায়, কিন্তু অন্যটি গুরুতর জন্মগত ত্রুটি সৃষ্টি করে। বর্তমানে এই ওষুধটি গর্ভবতী নন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যেমনঃ কুষ্ঠ রোগ (leprosy) বা হ্যানসেনের রোগ (Hansen's disease) অথবা নতুনভাবে নির্ণীত মাল্টিপল মায়েলোমা (Multiple Myeloma) চিকিৎসায় অনুমোদন দিয়েছে। মাল্টিপল মায়েলোমা হলো অস্থি মজ্জার (Bone marrow) প্লাজমা (Plasma) কোষে উৎপন্ন এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার। যদিও এসব রোগের ক্ষেত্রে উপকারী এনানশিওমার সংশ্লেষ বা তৈরি করে রোগীদের দেওয়া হয়, তবুও সময়ের সাথে সাথে শরীরে উপকারী এবং ক্ষতিকর উভয় এনানশিওমার-ই সনাক্ত করা যায়। শরীরে ক্ষতিকর এনানশিওমার উপস্থিত থাকার একটি সম্ভাব্য কারণ প্রস্তাব কর।

১৭। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের রোগের উদ্ভব হয়েছে। কিছু দীর্ঘস্থায়ীভাবে রয়ে গেছে, আবার কিছু সময়ের সঙ্গে কমে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০-এর দিকে COVID-19 (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেও বর্তমানে তা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে, যদিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। সব রোগ একইভাবে ক্ষীণ হয়ে যায় না; কিছু রোগ সাময়িকভাবে কমে গেলেও নতুন করে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। এ ধরনের একটি রোগ হলো এনসেফালিটিস লেথারজিয়া (Encephalitis lethargica), যা প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে গভীর নিদ্রাসদৃশ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৯১৬ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে এই ঘুম রোগের (Sleeping sickness) বিস্তার লক্ষ করা যায়। যদিও এর প্রাদুর্ভাব ১৯১৬ সালে শুরু হয়ে ১৯২৮ সালে প্রধানত শেষ হয়, তবুও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে রোগটি দেখা গেছে।। এই রোগটি মূলত মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এমন একটি স্নায়বিক ব্যাধি। এই ঘুম রোগ বা Sleeping sickness-এর মহামারিতে কিছু বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির মধ্যে অস্বাভাবিক অসাড়তা (Paralysis, প্যারালাইসিস) দেখা যায়, যা উন্নত পর্যায়ের পারকিনসন রোগ (Parkinson's

disease)-এর লক্ষণের মতো ছিল। বহু বছর পরে, এল-ডোপা (L-Dopa) নামক একটি রাসায়নিক (পারকিনসন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত) এই রোগীদের কয়েকজনকে দেওয়া হয় এবং এটি সাময়িকভাবে প্যারালাইসিস দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু এর এনানশিওমার, ডি-ডোপা (D-Dopa), কোনো প্রভাব দেখায়নি। ১০০-১৫০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আলোচনা কর যে কেন একটি এনানশিওমার কার্যকর হলেও অন্যটি কার্যকর নয়। এটি জীববিজ্ঞানের কোন মৌলিক ধারনা (Core Concept) বা একীকরণকারী মূলনীতি (Unifying theme)-কে সমর্থন করে, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

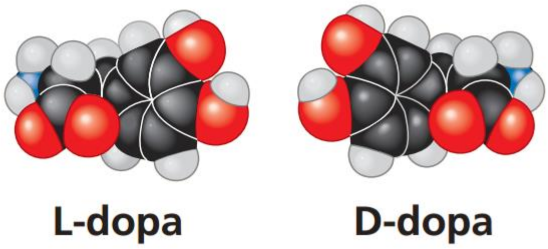

১৮। নিচের ছবিতে দেখানো পুরুষ ও স্ত্রী সিংহের মধ্যে পার্থক্যগুলো কীভাবে কার্বন পরমাণুর রাসায়নিক গঠন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তা বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৬

বৃহৎ জৈব অণুর গঠন ও কার্যাবলি।

(The Structure and Function of Large Biological Molecules)

এই অধ্যায়ের মুল ধারণা (Key Concepts) সমূহঃ

৬.১ ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) বা বৃহৎ জৈব অণুগুলি পলিমার (Polymer), যা মনোমার (Monomer) দিয়ে গঠিত।

৬.২ কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং গঠনমূলক উপাদান হিসেবেও ভূমিকা রাখে।

৬.৩ লিপিড (Lipid) বা চর্বি জাতীয় পদার্থ হলো জলবিমূখ বা হাইড্রোফোবিক অণুর একটি বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী।

৬.৪ প্রোটিন (Protein) বা আমিষ জাতীয় পদার্থ বিভিন্ন ধরনের গঠন ধারণ করে, যার ফলে এদের কার্যাবলিও অত্যন্ত বহুবিধ। অর্থাৎ, প্রোটিন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে।

৬.৫ নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid) বংশগত তথ্য সংরক্ষণ, পরিবহন এবং প্রকাশে সহায়তা করে।

৬.৬ জিনোমিক্স (Genomics) ও প্রোটিওমিক্স (Proteomics) জৈববৈজ্ঞানিক গবেষণা ও এর প্রয়োগকে আমূল পরিবর্তন করেছে।

চিত্র ৬.১: ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ (Lactate dehydrogenase, LDH) হলো শরীরের প্রায় সমস্ত টিস্যুতে, বিশেষ করে পেশি, যকৃৎ (Liver), বৃক্ক (Kidney) এবং রক্তকণিকায় বিদ্যমান একটি অপরিহার্য এনজাইম বা প্রোটিন। এখানে এই প্রোটিনটিকে একটি আণবিক মডেল (Molecular model) হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। একজন ব্যক্তির শরীরে উপস্থিত এই প্রোটিনের নির্দিষ্ট রূপ (Form) কোষের চিনি বা শর্করাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। রক্তে এই প্রোটিন বা এনজাইমের নিম্ন মাত্রা স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করা হলেও, LDH-এর উচ্চ মাত্রা শরীরে কোষের ক্ষতি বা টিস্যুর মৃত্যু নির্দেশ করে। এটি সাধারণত হার্ট অ্যাটাক, লিভারের রোগ, ক্যান্সার বা সংক্রমণের মতো গুরুতর সমস্যার সংকেত হতে পারে। প্রোটিন হলো বৃহৎ জৈব অণু বা ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule)-এর একটি

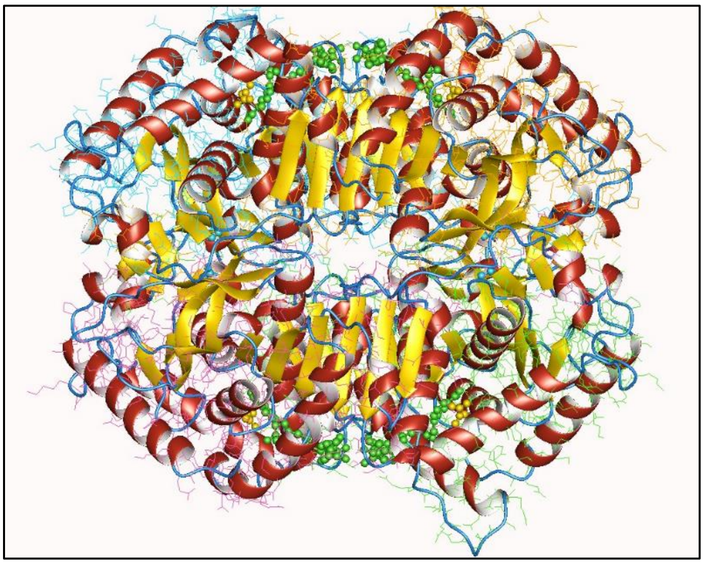

শ্রেণি (Class)।

জৈব অণুর চারটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর গঠন (Structure) ও কার্যাবলি (Function) কী কী?

ম্যাক্রোমলিকিউলগুলোর তিনটি শ্রেণী হচ্ছে পলিমার পদার্থ; অর্থাৎ এগুলো মনোমার-এর দীর্ঘ শৃঙ্খল (Long chains) দ্বারা গঠিত। মনোমার হচ্ছে পলিমারের উপএকক (Subunits)।

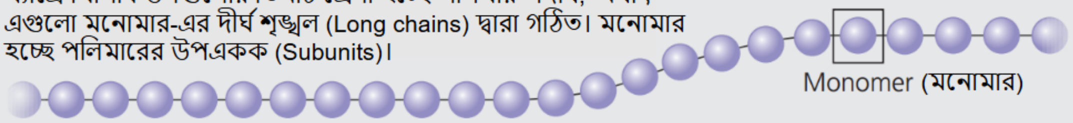

কার্বোহাইড্রেট শরীরকে শক্তি দেয় এবং দেহের গঠন তৈরি ও বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রোটিন নানা ধরনের কাজ করে, যেমন রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত ঘটাতে (catalyzing) সাহায্য করা এবং কোষের ভেতরে ও বাইরে পদার্থ পরিবহন করা।

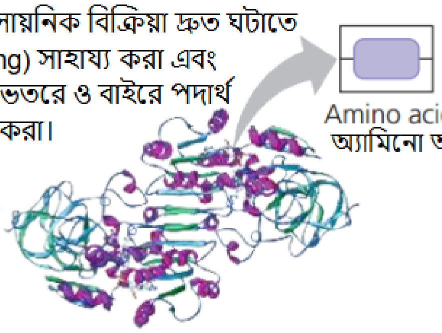

প্রোটিন: অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ (Alcohol dehydrogenase) আরেক ধরনের ডিহাইড্রোজিনেজ প্রোটিন বা এনজাইম, যা দেহে অ্যালকোহল (Alcohol) ভাঙতে সহায়তা করে।

নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acids) জেনেটিক তথ্য (genetic information) সংরক্ষণ করে এবং জিনের প্রকাশ (gene expression)-এ কাজ করে।

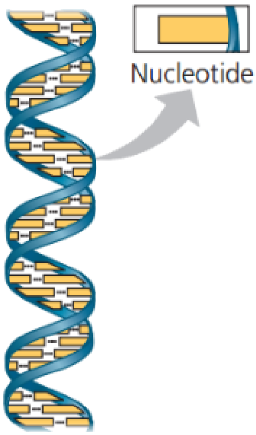

চতুর্থ শ্রেণি লিপিড (Lipid) পলিমার বা ম্যাক্রোমলিকিউল নয়।

লিপিড হলো বিভিন্ন ধরনের অণুর একটি গোষ্ঠী, যা পানির সাথে সহজে মিশে না। এদের প্রধান কাজ হলো শক্তি সরবরাহ করা, কোষঝিল্লি (cell membrane) গঠন করা এবং হরমোন (hormones) হিসেবে কাজ করা।

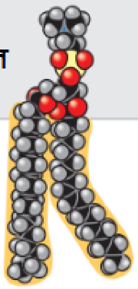

৬.১ ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) হলো পলিমার (Polymer), যা মনোমার (Monomer) দিয়ে তৈরি।

বড় অণু যেমন কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate), প্রোটিন (Protein) এবং নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)—এগুলোকে তাদের বিশাল আকারের কারণে বৃহৎ অণু বা ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) বলা হয়। এগুলো শিকলের মত বা শৃঙ্খলাকৃতির (Chain-like) অণু, যার আরেক নাম হচ্ছে পলিমার (Polymer, গ্রিক *polys* = অনেক, *meros* = অংশ)। সহজভাবে, একটি পলিমার হলো দীর্ঘ অণু, যা অনেকগুলো একই বা সাদৃশ্যপূর্ণ গঠন একক (Building block) দ্বারা গঠিত এবং এরা কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Covalent bond) দ্বারা যুক্ত থাকে; অনেকটা ট্রেনের বগির মতো একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত থাকে। যে পুনরাবৃত্ত ক্ষুদ্র এককগুলো (Repeating units) পলিমারের গঠন একক হিসেবে কাজ করে, সেগুলোকে মনোমার (Monomer) বলা হয় (গ্রিক *monos* = একক)। পলিমার গঠনের পাশাপাশি, কিছু মনোমার, স্বতন্ত্রভাবেও নির্দিষ্ট জৈবিক কার্য সম্পাদন করতে পারে।

পলিমারের সংশ্লেষণ (Synthesis) ও ভাঙ্গন (Breakdown)।

যদিও একেকটি পলিমার ভিন্ন ধরনের মনোমার দিয়ে গঠিত, তবুও কোষে পলিমার তৈরির প্রক্রিয়া (Polymerization) এবং সেগুলো ভাঙার রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো প্রায় সব বড় জৈব অণুর ক্ষেত্রে একই রকম। কোষে এই প্রক্রিয়াগুলো এনজাইম (Enzyme) দ্বারা সম্পন্ন হয়। এনজাইম হচ্ছে বিশেষ ধরনের ম্যাক্রোমলিকিউল বা বৃহৎ অণু যা সাধারণত প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে।

একটি মনোমারকে আরেকটি মনোমার বা পলিমারের সাথে যুক্ত করার বিক্রিয়াকে ঘনীভবন বা কনডেনসেশন বিক্রিয়া (Condensation reaction) বলা হয়। এই বিক্রিয়ায় দুটি অণু সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Covalent bond) দ্বারা যুক্ত হয় এবং অণু দুটির কিছু পরমাণু একটি ছোট অণু বের হয়ে যায়। যদি এই ছোট অণুটি পানি হয়, তাহলে এটিকে নির্জলীকরণ, নিরুদন বা ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া (Dehydration reaction) বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন পলিমার ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। এখানে প্রতিটি বিক্রিয়ক (Reactant) থেকে পানির একটি অংশ বের হয়—একটি দেয় হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (—OH) এবং অন্যটি দেয় হাইড্রোজেন (—H)। এই প্রক্রিয়াটি বারবার ঘটে, ফলে একটির পর একটি মনোমার যুক্ত হয়ে পলিমারের শৃঙ্খল বড় হয় **(চিত্র ৬.১.১ক)**।

পলিমারগুলো ভেঙে মনোমারে পরিণত হয় আর্দ্রবিশ্লেষণ বা হাইড্রোলাইসিস (Hydrolysis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নির্জলীকরণ বা ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার বিপরীত। "Hydrolysis" শব্দের অর্থ পানি দ্বারা ভাঙ্গন (গ্রিক *hydro* = water বা পানি; *lysis* = break বা ভাঙ্গন)। এখানে পানির একটি অণু যুক্ত হয়ে মনোমারগুলোর মধ্যে বন্ধন ভেঙে দেয়। পানির হাইড্রোজেন (H) একটি মনোমারের সাথে এবং হাইড্রোক্সিল (OH) অন্যটির সাথে যুক্ত হয় **(চিত্র ৬.১.১খ)**।

আমাদের দেহে হাইড্রোলাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো পরিপাক (Digestion)। খাদ্যের বেশিরভাগ জৈব পদার্থ পলিমার আকারে থাকে, যা সরাসরি কোষে প্রবেশ করতে পারে না। পরিপাকতন্ত্রে (Digestive tract) বিভিন্ন এনজাইমএই পলিমারগুলোকে ভেঙে দেয়। ফলে মুক্ত মনোমারগুলো রক্তপ্রবাহে (Bloodstream) শোষিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে যায়। এরপর কোষগুলো এই মনোমার ব্যবহার করে ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন পলিমার তৈরি করে, যা দেহে নির্দিষ্ট জৈবিক কাজ সম্পাদন করে। (উল্লেখ্য, ডিহাইড্রেশন ও হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়া শুধুমাত্র পলিমারের ক্ষেত্রেই

নয়, কিছু লিপিডের মতো অ-পলিমার বা পলিমার নয় এমন অণুর গঠন ও ভাঙনেও অংশ নিতে পারে।)

চিত্র ৬.১.১: কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন পলিমারের সংশ্লেষণ এবং ভাঙ্গন।

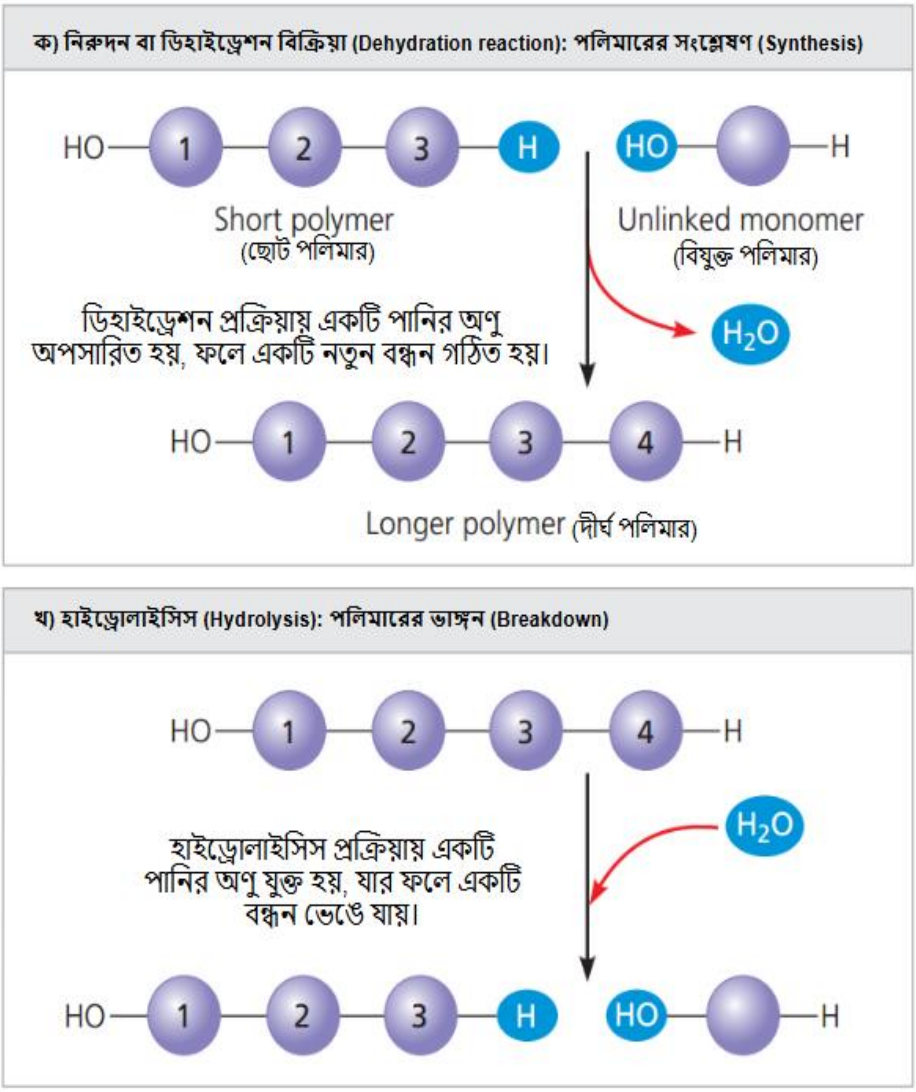

পলিমারের বৈচিত্র্য (The Diversity of Polymers)।

একটি কোষে হাজার হাজার ধরনের বৃহৎ অণু বা ম্যাক্রোমলিকিউল থাকে, এবং এই সংখ্যা ও ধরন এক কোষ থেকে অন্য কোষে ভিন্ন হতে পারে। কাছাকাছি আত্মীয়দের (যেমন, ভাইবোন) মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মূলত ডিএনএ ও প্রোটিন পলিমার-এর ছোট ছোট পরিবর্তনের কারণে তৈরি হয়। সম্পর্কহীন মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য আরও বেশি, আর ভিন্ন প্রজাতির (Species) ক্ষেত্রে তা আরও বেশি হয়। জীবজগতে ম্যাক্রোমলিকিউলের বৈচিত্র্য অনেক বড় এবং প্রায় সীমাহীন।

এই বৈচিত্র্যের কারণ কী? জীবের পলিমারগুলো মাত্র ৪০–৫০ ধরনের সাধারণ মনোমার এবং কিছু বিরল মনোমার দিয়ে তৈরি। এত কম ধরনের উপাদান থেকে এত বেশি বৈচিত্র্য তৈরি হওয়া অনেকটা ইংরেজি ২৬টি বা বাংলা ৫০টি বর্ণ দিয়ে অসংখ্য শব্দ তৈরি করার মতো। মূল বিষয় হলো বিন্যাস (Arrangement)— অর্থাৎ বর্ণ বা মনোমার এককগুলো কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে (sequence) সাজানো হয়।

তবে এই তুলনা পুরোপুরি যথেষ্ট নয়, কারণ জৈব পলিমারগুলো সাধারণত খুব শিকলের মত দীর্ঘ বা লম্বা হয়। যেমন, প্রোটিন ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid) দিয়ে তৈরি এবং এগুলো সাধারণত শত শত অ্যামিনো অ্যাসিড যোগ করে গঠিত। জীবনের আণবিক গঠন খুব সাধারণ হলেও তা খুব সুন্দরভাবে সাজানো, সুচারু এবং মার্জিত। সব জীবেই ছোট ছোট অণু (Small molecules) একত্রিত হয়ে বড় ও ভিন্ন ধরনের ম্যাক্রোমলিকিউল তৈরি করে।

ম্যাক্রোমলিকিউলগুলোর মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, গঠন (Structure) ও কাজ (Function) অনুযায়ী তাদেরকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এখন আমরা জৈব অণুর চারটি প্রধান শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিটি শ্রেণির বড় জৈব অণুগুলোর এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তাদের ছোট অংশগুলোর মধ্যে থাকে না। অর্থাৎ, প্রতিটি শ্রেণির ক্ষেত্রে, ম্যাক্রোমলিকিউল বা বৃহৎ অণুগুলোতে এমন উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent properties) থাকে, যা তাদের গাঠনিক একক বা মনোমার উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান নয়।

৬.২ কার্বোহাইড্রেট শক্তির উৎস এবং গঠনগত উপাদান হিসেবে কাজ করে।

কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে শর্করা এবং শর্করার পলিমার অন্তর্ভুক্ত। কার্বোহাইড্রেট হলো এক ধরনের বিস্তৃত, অর্থাৎ আলগাভাবে সংজ্ঞায়িত (Loosely defined) অণুগোষ্ঠী, যেগুলোর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে। এদের অনুপাত সাধারণত ১:২:১ এবং সাধারণ সূত্র হলো $(CH_2O)_n$, যেখানে n হলো কার্বনের সংখ্যা। কার্বোহাইড্রেটে অনেক C–H বন্ধন থাকে, যা ভাঙা বা পরিবর্তনের সময় শক্তি ছেড়ে দেয় এবং কোষে জ্বালানি (Fuel) হিসেবে কাজ করে । তাই কার্বোহাইড্রেটগুলো শক্তি সঞ্চয়ের (Energy Storage) জন্য খুবই উপযোগী। অর্থাৎ, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা হলো শক্তি জমা রাখার গুরুত্বপূর্ণ অণু এবং এগুলো বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সবচেয়ে সরল কার্বোহাইড্রেট হলো মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) বা সরল শর্করা; এগুলোই সেই মনোমার, যেগুলো থেকে অধিক জটিল কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) হলো দ্বৈত শর্করা, যা দুটি মনোস্যাকারাইড একটি কোভ্যালেন্ট বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেটের বৃহৎ অণুগুলোকে পলিস্যাকারাইড বলা হয়; এগুলো বহু একক মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা দিয়ে গঠিত পলিমার। মনোস্যাকারাইড হচ্ছে পলিমার গঠনের মৌলিক উপাদান (Building Block)।

মনোস্যাকারাইড সবচেয়ে সরল শর্করা (Simple Sugar)।

মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) (গ্রিক *monos* = এক, *saccharum* = শর্করা) সাধারণত (CH_2O) এককের গুণিতক আকারে গঠিত অণু। গ্লুকোজ (Glucose) $(C_6H_{12}O_6)$ ছয়-কার্বন বিশিষ্ট সবচেয়ে সাধারণ মনোস্যাকারাইড এবং প্রাণরসায়নে (Biochemistry) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। “গ্লুকোজ় ” গ্রিক শব্দ গ্লুকুস্ (glykys, γλυκύς) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ “মিষ্টি” এবং "-ose" প্রত্যয়টি শর্করা বা চিনি নির্দেশ করে।

গ্লুকোজের গঠনে মনোস্যাকারাইডের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়: এতে একটি কার্বোনিল গ্রুপ (Carbonyl group, >C=O) এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (Hydroxyl group, –OH) থাকে **(চিত্র ৬.২.১)**।

কার্বোনিল গ্রুপের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মনোস্যাকারাইড দুই প্রকার হতে পারে:

- অ্যালডোজ (Aldose): যদি অ্যালডিহাইড গ্রুপ (Aldehyde group) থাকে (যেমন: গ্লুকোজ)
- কিটোজ (Ketose): যদি কিটোন গ্রুপ (Ketone group) থাকে (যেমন: ফ্রুক্টোজ (Fructose), যা গ্লুকোজের একটি আইসোমার (Isomer))

(সাধারণত শর্করার নাম “-ose” দিয়ে শেষ হয়।)

আরেকটি শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হলো কার্বন কাঠামর দৈর্ঘ্য (Carbon skeleton length), যা ৩ থেকে ৭ কার্বন পর্যন্ত হতে পারে।

- ৬-কার্বনযুক্ত শর্করা: হেক্সোজ (hexose) (যেমন: গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ)
- ৩-কার্বনযুক্ত শর্করা: ট্রাইওজ (triose)

চিত্র ৬.২.১: কিছু মনোস্যাকারাইডের গঠন ও শ্রেণিবিন্যাস। শর্করাগুলো তাদের কার্বোনিল গ্রুপের অবস্থান (কমলা রঙে চিহ্নিত), কার্বন কাঠামোর দৈর্ঘ্য, এবং অসমমিত (Asymmetric) কার্বনের চারপাশে তাদের বিভিন্ন পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠীর স্থানিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ভিন্নতা প্রদর্শন করে (উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজের বেগুনি অংশগুলোর তুলনা করা যেতে পারে, এরা হচ্ছে স্টেরিওআইসোমার)।

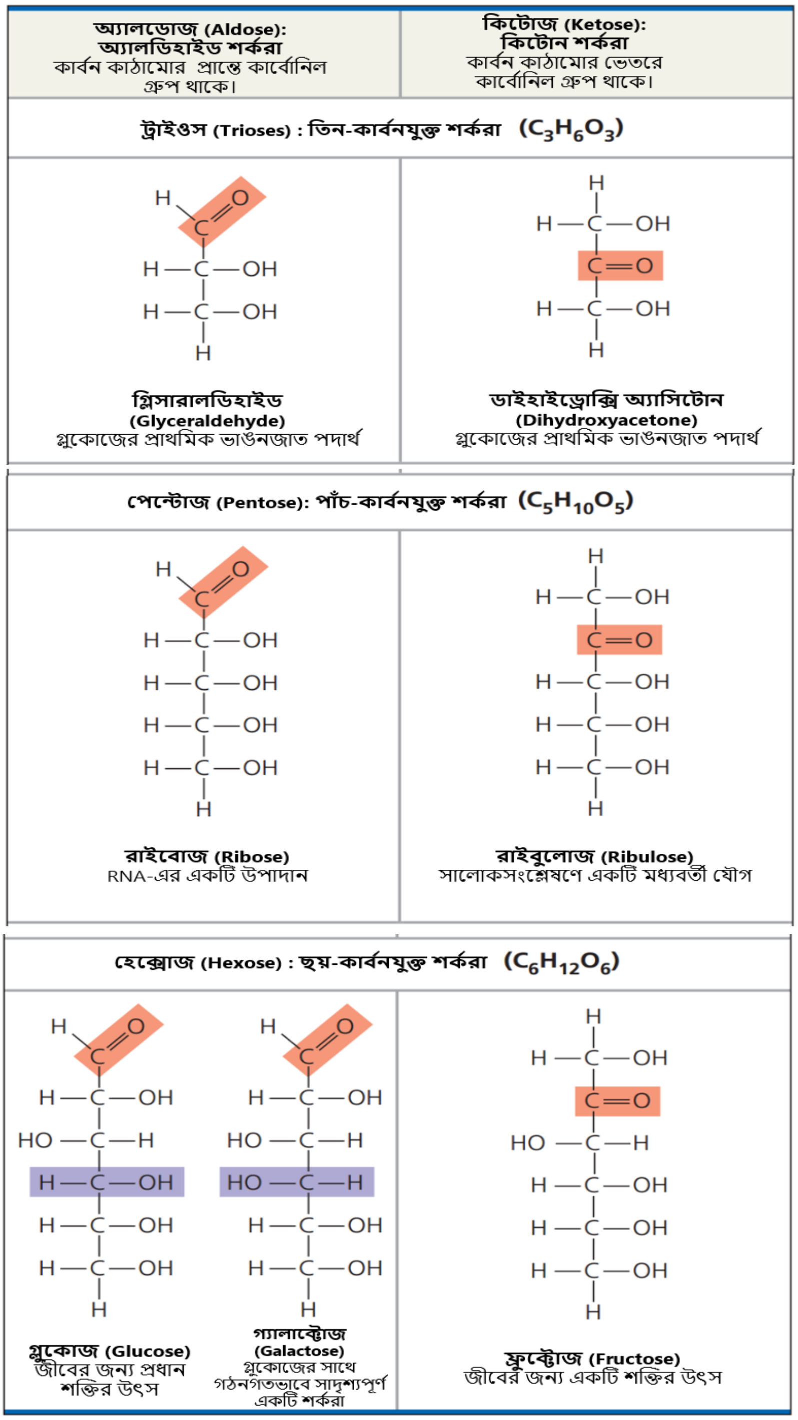

সরল শর্করার বৈচিত্র্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অসমমিত কার্বনের (Asymmetric carbon) চারপাশে পরমাণুগুলোর স্থানিক বিন্যাস (Spatial arrangement)। অসমমিত কার্বন বলতে সেই কার্বনকে বোঝায়, যা চারটি ভিন্ন পরমাণু বা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত থাকে।

গ্লুকোজই একমাত্র সরল শর্করা নয় যার রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এই সাধারণ ছয়-কার্বনযুক্ত যৌগের উভয় ধরনের আইসোমার—গাঠনিক (Structural isomers) এবং স্টেরিওআইসোমার (Stereoisomers)—প্রকৃতিতে বিদ্যমান। ফ্রুক্টোজ একটি গাঠনিক আইসোমার, যেখানে কার্বোনিল কার্বনের (C=O) অবস্থান ভিন্ন। অন্যদিকে, গ্যালাক্টোজ একটি স্টেরিওআইসোমার, যেখানে —OH এবং —H গ্রুপের অবস্থান রিং কাঠামোর তুলনায় ভিন্ন।

গ্লুকোজ (Glucose) এবং গ্যালাক্টোজ (Galactose) এর মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য, মাত্র একটি অসমমিত কার্বনের চারপাশে গোষ্ঠীর অবস্থান ভিন্ন। কিন্তু এই ছোট পার্থক্যই তাদের গঠন, বন্ধন ক্ষমতা (Binding activity) এবং কার্যগত (Functional) আচরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। আবার গঠন একই হলেও ফ্রুক্টোজের স্বাদ গ্লুকোজের তুলনায় অনেক বেশি মিষ্টি, যা আমাদের জিহ্বায় থাকা স্বাদগ্রাহী প্রোটিন (এরা রিসেপ্টর/Receptor: জৈব অণু যা সংকেত গ্রহণ করে) দ্বারা সহজেই পার্থক্য করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন শর্করার উপর ক্রিয়াশীল এনজাইমগুলো এই গাঠনিক

ও স্টেরিও আইসোমার উভয়কেই আলাদা করে শনাক্ত করতে সক্ষম। গ্লুকোজের বিভিন্ন স্টেরিওআইসোমারও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোর মাধ্যমে গ্লুকোজ মনোমার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পলিমার গঠিত হতে পারে, যা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।

যদিও গ্লুকোজকে প্রায়ই সরল শৃঙ্খল বা রেখার (Linear form) আকারে দেখানো হয়, বাস্তবে এটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। পানিতে বা জলীয় দ্রবণে (Aqueous solution) গ্লুকোজসহ অধিকাংশ ৫- এবং ৬-কার্বনযুক্ত শর্করা, স্থিতিশীলতার কারণে, বদ্ধ বলয় বা রিং (Ring form) আকারে থাকে **(চিত্র ৬.২.২)**।

চিত্র ৬.২.২: গ্লুকোজের সরলরেখীয় (Linear) ও রিং (Ring) গঠন বা আকৃতি।

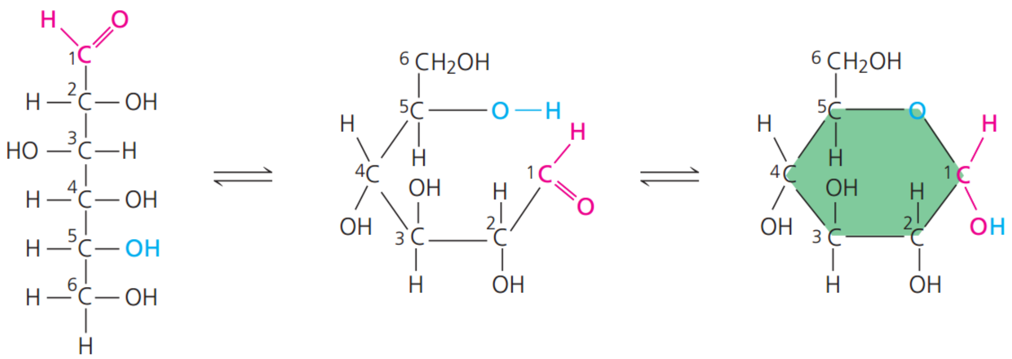

(ক) সরলরেখীয় (Linear) ও রিং (Ring) গঠনঃ গ্লুকোজের সরলরেখীয় এবং রিং আকৃতির মধ্যে একটি রাসায়নিক সাম্যাবস্থা (chemical equilibrium) বিদ্যমান, যেখানে রিং আকৃতির দিকটি অধিক অনুকূল। এখানে শর্করার কার্বনগুলোকে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে। গ্লুকোজের রিং গঠন তৈরির সময়, কার্বন-১ (ম্যাজেন্টা রঙে চিহ্নিত) কার্বন-৫-এর সাথে যুক্ত অক্সিজেনের (নীল রঙে চিহ্নিত) সাথে বন্ধন গঠন করে।

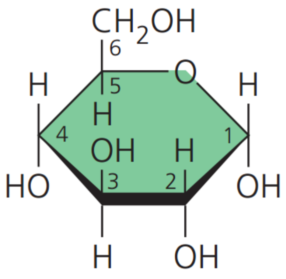

(খ) সংক্ষিপ্ত (Abbreviated) বলয় বা রিং গঠনঃ এখানে বলয়ের প্রতিটি কোণ (Corner) একটি কার্বন পরমাণুকে নির্দেশ করে। রিংয়ের যে প্রান্তটি অপেক্ষাকৃত মোটা রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে, তা নির্দেশ করে যে রিংটিকে প্রান্তিক (Edge-on) দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ এটিকে পাশ থেকে দেখা হচ্ছে। রিংয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন পরমাণু বা পরমাণু গোষ্ঠী (Substituents) রিংয়ের সমতলের (Plane) উপরে বা নিচে অবস্থান করে।

মনোস্যাকারাইড, বিশেষ করে গ্লুকোজ, কোষের জন্য প্রধান পুষ্টি উপাদান (Nutrient)। কোষীয় শ্বসন (Cellular respiration) প্রক্রিয়ায় কোষ গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি (Energy) উৎপন্ন করে। এছাড়াও,

মনোস্যাকারাইডের কার্বন কাঠামো (Carbon skeleton) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জৈব অণু (Organic molecules) যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acids) এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acids) তৈরির কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। যেসব মনোস্যাকারাইড তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো সাধারণত মনোমার (Monomer) হিসেবে যুক্ত হয়ে ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) বা পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide) তৈরি করে।

ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) উদ্ভিদে শর্করা পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাণীতে পুষ্টি সরবরাহে ভূমিকা রাখে।

অধিকাংশ জীবদেহে শর্করা (Sugar) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে রক্তে গ্লুকোজ সরাসরি মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) আকারে পরিবাহিত হয়। তবে উদ্ভিদ (Plant) এবং অনেক অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে, গ্লুকোজ পরিবহনের আগে একটি বিশেষ রূপে (Transport form) রূপান্তরিত হয়, যাতে পরিবহনের সময় এটি সহজে বিপাক বা রাসায়নিকভাবে রূপান্তরিত (Metabolism) না হয়।

এই পরিবহন রূপ সাধারণত দুটি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে একটি ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) গঠন করার মাধ্যমে তৈরি হয় (গ্রিক *di* = "দুই")। এই যুক্ত হওয়ার বন্ধনকে গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজ (Glycosidic linkage) বলা হয়, যা একটি সমযোজী বা কোভ্যালেন্ট বন্ধন (Covalent bond) এবং এটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া (Dehydration reaction)-এর মাধ্যমে তৈরি হয় (এখানে G*lyco* শব্দটি কার্বোহাইড্রেট নির্দেশ করে)। ডাইস্যাকারাইড গ্লুকোজের একটি কার্যকর সরবরাহ (Reservoir) রুপ হিসেবে কাজ করে, কারণ সাধারণত যেসব এনজাইম (Enzyme) গ্লুকোজ ব্যবহার করে, তারা এই দুটি মনোস্যাকারাইডের মধ্যে থাকা বন্ধন ভাঙতে পারে না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোষ কলা বা টিস্যুতে (Tissue) উপস্থিত বিশেষ এনজাইম এই বন্ধন ভাঙতে সক্ষম।

কোন কোন মনোস্যাকারাইড একসাথে যুক্ত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ডাইস্যাকারাইড তৈরি হয় **(চিত্র ৬.২.৩)**। গ্লুকোজ (Glucose) নিজের সাথে অথবা ফ্রুক্টোজ (Fructose) ও গ্যালাক্টোজ (Galactose)-এর মতো অন্যান্য মনোস্যাকারাইডের সাথে যুক্ত হতে পারে।

যখন গ্লুকোজ (Glucose) এবং ফ্রুক্টোজ (Fructose) যুক্ত হয়, তখন সুক্রোজ (Sucrose) বা সাধারণ চিনি (Sugar) তৈরি হয়। এটিকে সাধারণভাবে টেবিল সুগারও (Table Sugar) বলা হয়, যা হলো দৈনন্দিন জীবনে রান্নায় বা চা-কফিতে ব্যবহৃত সাদা চিনি। সুক্রোজ উদ্ভিদে গ্লুকোজ পরিবহনের প্রধান রূপ এবং মানুষসহ অধিকাংশ প্রাণী এই শর্করা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আখ (Sugarcane) এবং চিনির বিট (Sugar beet) সুক্রোজে সমৃদ্ধ।

অন্যদিকে, ল্যাক্টোজ (Lactose), যা দুধে (Milk) পাওয়া যায়, আরেকটি ডাইস্যাকারাইড। এটি একটি গ্লুকোজ (Glucose) এবং একটি গ্যালাক্টোজ (Galactose) অণু দিয়ে গঠিত। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী (Mammals) তাদের বাচ্চাদের শক্তি সরবরাহের জন্য ল্যাক্টোজ ব্যবহার করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায়ই ল্যাক্টেজ (Lactase) নামক এনজাইমের পরিমাণ কমে যায়, যা ল্যাক্টোজ ভেঙে দুইটি মনোস্যাকারাইডে রূপান্তর করে। ফলে অনেক মানুষের ল্যাক্টোজ বিপাক (Metabolize) করার ক্ষমতা কম থাকে। যখন ল্যাক্টেজ অনুপস্থিত থাকে, তখন ল্যাক্টোজ অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া (Intestinal bacteria) দ্বারা ভেঙে যায়, ফলে বায়ু বা গ্যাস (Gas) তৈরি হয় এবং পেটে ব্যথা বা ক্র্যাম্পিং (Cramping) হতে পারে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য দুগ্ধজাত খাবার (Dairy products) গ্রহণের সময় ল্যাক্টেজ (Lactase) এনজাইম গ্রহণ করা যেতে পারে, অথবা আগে থেকেই ল্যাক্টেজ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা (Treated) দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বড়দের ল্যাক্টোজ অসহিষ্ণুতার (Lactose intolerance) কারণে, ল্যাক্টোজ থেকে প্রাপ্ত শক্তি মূলত বাচ্চাদের (Offspring) জন্য সংরক্ষিত থাকে

এবং স্তন্যপায়ীদের, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রধানত শিশুদের শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৬.২.৩: ডাইস্যাকারাইড সংশ্লেষণের (Synthesis) উদাহরণ।

(ক) মাল্টোজ (Maltose) গঠনে ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া:
দুটি গ্লুকোজ অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মাল্টোজ গঠন করে। এখানে ১–৪ গ্লাইকোসিডিক বন্ধন (Glycosidic linkage) গঠিত হয়, যেখানে একটি গ্লুকোজের ১ নম্বর কার্বন অন্য গ্লুকোজের ৪ নম্বর কার্বনের সাথে যুক্ত হয়। গ্লুকোজ মনোমারগুলো ভিন্নভাবে যুক্ত হলে ভিন্ন ধরনের ডাইস্যাকারাইড তৈরি হতে পারে।

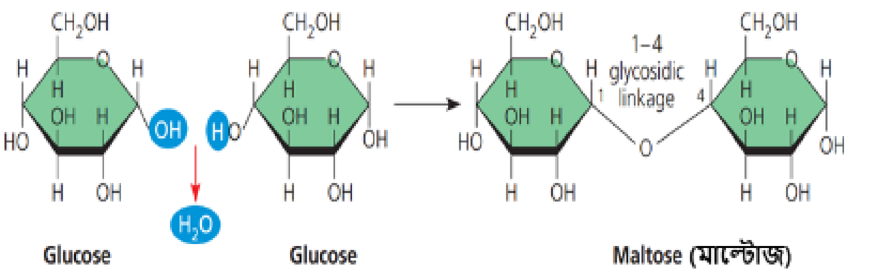

(খ) সুক্রোজ (Sucrose) গঠনে ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া:
সুক্রোজ একটি ডাইস্যাকারাইড, যা গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ দ্বারা গঠিত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফ্রুক্টোজ একটি পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট (five-sided) রিং গঠন করে, যদিও এটি গ্লুকোজের মতোই একটি হেক্সোজ (ছয়-কার্বনযুক্ত শর্করা)।

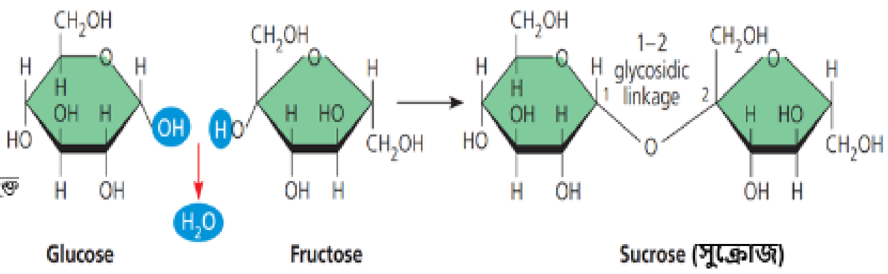

পলিস্যাকারাইড শক্তি জমা রাখে এবং জীবের গঠন বা আকৃতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

পলিস্যাকারাইড হলো বৃহৎ জৈব অণু (Macromolecule), যা পলিমার প্রকৃতির এবং এতে কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। পলিস্যাকারাইডগুলো মূলত ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। কিছু পলিস্যাকারাইড শক্তির আধার (Energy Storage) হিসেবে কাজ করে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে ভেঙে কোষের জন্য শক্তি ও মনোস্যাকারাইড সরবরাহ করে। অন্যদিকে, কিছু পলিস্যাকারাইড গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যা কোষ বা সমগ্র জীবের সুরক্ষামূলক কাঠামো তৈরি করে। একটি পলিস্যাকারাইডের গঠন ও কার্যকারিতা নির্ভর করে এর গঠনে উপস্থিত মনোস্যাকারাইডের প্রকৃতি এবং গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজের অবস্থানের উপর। উদাহরণস্বরূপ, স্টার্চ (Starch) একটি সঞ্চয়ধর্মী পলিস্যাকারাইড, সম্পূর্ণভাবে α-গ্লুকোজ (আলফা-গ্লুকোজ) অণু দ্বারা গঠিত, যা দীর্ঘ শৃঙ্খলে সংযুক্ত থাকে। অন্যদিকে, সেলুলোজ (Cellulose), একটি গাঠনিক পলিস্যাকারাইড, এটিও গ্লুকোজ অণু দ্বারা গঠিত হলেও এখানে গ্লুকোজগুলো β-গ্লুকোজ (বেটা-গ্লুকোজ) আকারে যুক্ত থাকে। যেহেতু স্টার্চ α-গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত, তাই এর সংযোগকে α-লিঙ্কেজ বলা হয়; বিপরীতে, সেলুলোজে β-গ্লুকোজ থাকার কারণে এর সংযোগকে β-লিঙ্কেজ বলা হয়।

সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড (Stored Polysaccharides): উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় করে পলিস্যাকারাইড আকারে **(চিত্র ৬.২.৪)**। উদ্ভিদ স্টার্চ (Starch) সঞ্চয় করে, যা গ্লুকোজ মনোমারের একটি পলিমার। স্টার্চ কোষের ভেতরে প্লাস্টিড (Plastid) নামে পরিচিত গাঠনিক অংশে দানা (Granule) হিসেবে জমা থাকে; প্লাস্টিডের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টও (Chloroplast)। স্টার্চ সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ অতিরিক্ত গ্লুকোজ সঞ্চয় করতে পারে। যেহেতু গ্লুকোজ কোষের প্রধান শক্তির উৎস, তাই স্টার্চ মূলত সঞ্চিত শক্তি হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে গ্লুকোজ মনোমারগুলোর মধ্যকার বন্ধন ভেঙে এই “কার্বোহাইড্রেট আধার (Storage/Bank)” থেকে শর্করা মুক্ত করা হয়।

মানুষসহ অধিকাংশ প্রাণীর দেহে এমন এনজাইম থাকে যা উদ্ভিজ্জ স্টার্চকে হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে ভেঙে গ্লুকোজ উৎপন্ন করতে পারে, ফলে তা কোষের জন্য পুষ্টি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হয়। আলুর কন্দ (Potato tuber) এবং শস্যদানা, যেমন গম, ভুট্টা, ধান ও অন্যান্য উদ্ভিদের ফল, মানুষের খাদ্যতালিকায় স্টার্চের প্রধান উৎস।

স্টার্চে অধিকাংশ গ্লুকোজ মনোমার ১–৪ গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজের মাধ্যমে যুক্ত থাকে (অর্থাৎ একটি গ্লুকোজের ১ নম্বর কার্বন অন্যটির ৪ নম্বর কার্বনের সঙ্গে যুক্ত), যা মাল্টোজে গ্লুকোজ সংযোজনের ধরনটির অনুরূপ **(৬.২.৩ক)**। স্টার্চের সবচেয়ে সরল রূপ হলো অ্যামাইলোজ (Amylose), যা শাখাবিহীন। অপরদিকে, অ্যামাইলোপেকটিন (Amylopectin) একটি শাখাযুক্ত পলিমার এবং তুলনামূলকভাবে জটিল স্টার্চ, যেখানে শাখা সৃষ্টির স্থানে ১–৬ লিঙ্কেজ উপস্থিত থাকে। এই দুই ধরনের স্টার্চই **চিত্র ৬.২.৪ক**-তে দেখানো হয়েছে।

প্রাণীরা গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামে একটি পলিস্যাকারাইড সঞ্চয় করে, যা গ্লুকোজের পলিমার এবং গঠনগতভাবে অ্যামাইলোপেকটিনের অনুরূপ হলেও আরও বেশি শাখাবিশিষ্ট **(চিত্র ৬.২.৪খ)**। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে গ্লাইকোজেন প্রধানত যকৃত (Liver) ও পেশি (Muscle) কোষে সঞ্চিত থাকে। শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কোষে গ্লাইকোজেন ভেঙে

চিত্র ৬.২.৪: উদ্ভিদ ও প্রাণিজ পলিস্যাকারাইড। (ক) উদ্ভিদ কোষে সঞ্চিত স্টার্চ, (খ) পেশী কোষে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন, এবং (গ) উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের গঠনমূলক সেলুলোজ তন্তু (Fiber)—উল্লিখিত সবগুলোই গ্লুকোজ মনোমার (সবুজ ষড়ভুজাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত) দ্বারা গঠিত পলিস্যাকারাইড। স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনে গ্লুকোজ অণুগুলোর মধ্যে ১–৪ গ্লাইকোসিডিক বন্ধনের কোণের কারণে শাখাবিহীন অংশগুলোতে শৃঙ্খলগুলো সাধারণত সর্পিল (হেলিক্স) আকার ধারণ করে। স্টার্চের দুটি প্রধান রূপ হলো অ্যামাইলোজ (Amylose) এবং অ্যামাইলোপেক্টিন (Amylopectin)। অপরদিকে, সেলুলোজে সর্বদা শাখাবিহীন এবং এতে অন্য ধরনের গ্লুকোজ সংযোগ (Linkage) থাকে।

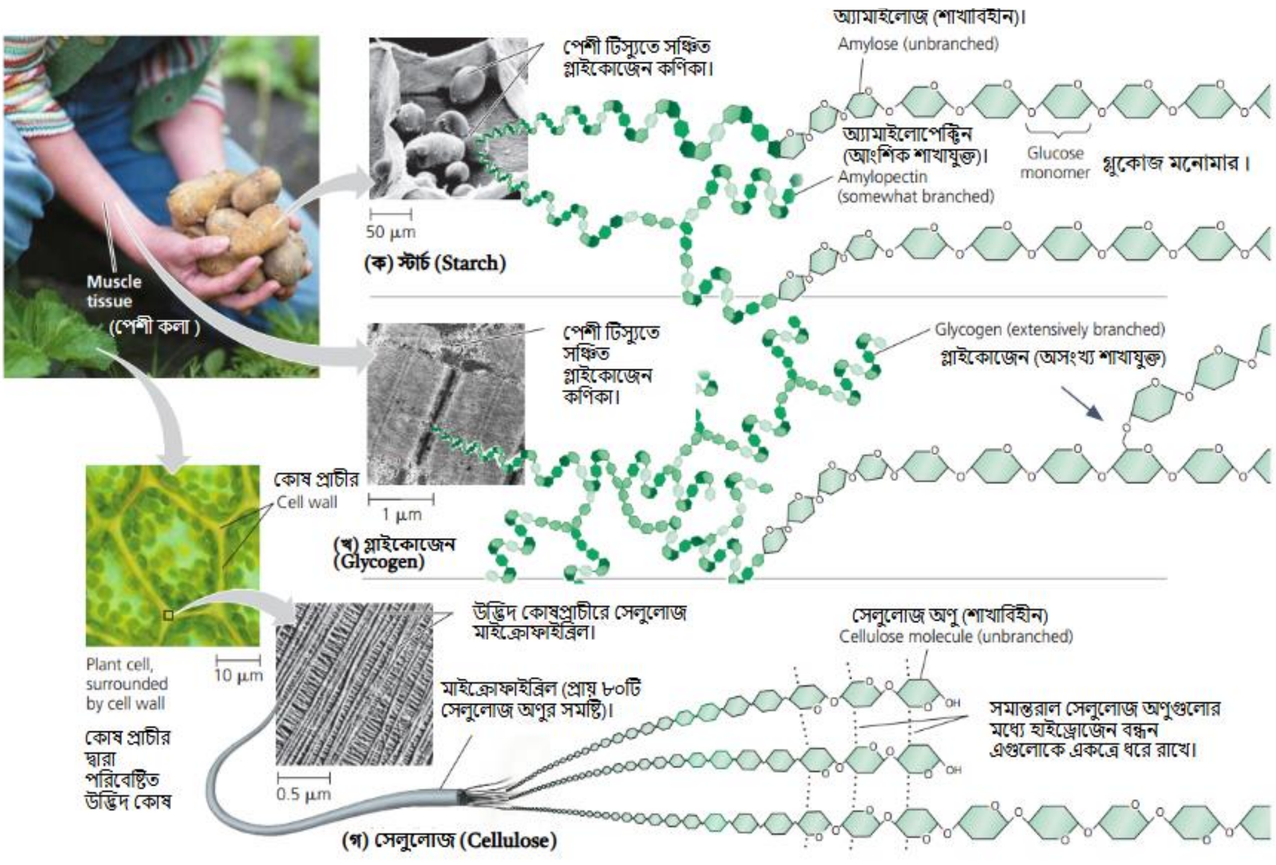

গ্লুকোজ মুক্ত হয়। গ্লাইকোজেনের অত্যধিক শাখাবিশিষ্ট গঠন এর কার্যকারিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এতে ভাঙনের জন্য অধিক সংখ্যক মুক্ত প্রান্ত (Free ends) বিদ্যমান থাকে।

তবে এই সঞ্চিত জ্বালানি দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রাণীর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্যের মাধ্যমে পুনরায় সরবরাহ না হলে প্রায় এক দিনের মধ্যেই গ্লাইকোজেনের মজুত শেষ হয়ে যায়। এই বিষয়টি কম-কার্বোহাইড্রেট বা কিটো খাদ্যাভ্যাসে (Keto Diet) অভ্যস্তদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দুর্বলতা ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

গাঠনিক পলিস্যাকারাইড (Structural Polysaccharides): জীবেরা তার শারীরিক কাঠামো নির্মাণের জন্য গাঠনিক পলিস্যাকারাইড ব্যবহার করে। পলিস্যাকারাইডগুলো শরীরে শক্ত ও দৃঢ় উপাদান তৈরিতে প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, সেলুলোজ (Cellulose) নামক পলিস্যাকারাইড উদ্ভিদ কোষকে পরিবেষ্টনকারী দৃঢ় কোষপ্রাচীরের একটি প্রধান উপাদান **(চিত্র ৬.২.৪গ)**। বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদ প্রতিবছর প্রায় $১০^{১৪}$ কেজি (প্রায় ১০০ বিলিয়ন টন) সেলুলোজ উৎপাদন করে; এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বিদ্যমান জৈব যৌগ।

স্টার্চের মতো সেলুলোজও গ্লুকোজের একটি পলিমার এবং এতে ১–৪ গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজ থাকে, তবে এই দুই পলিমারের লিঙ্কেজের প্রকৃতি ভিন্ন। এই পার্থক্যের মূল কারণ হলো গ্লুকোজের দুটি সামান্য ভিন্ন রিং গঠন বিদ্যমান **(চিত্র ৬.২.৫ক)**। গ্লুকোজ রিং গঠন করলে ১ নম্বর কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রক্সিল (-OH) গ্রুপটি রিং-এর সমতলের নিচে অথবা উপরে অবস্থান করতে পারে। এই দুই রূপকে যথাক্রমে আলফা (α) ও বেটা (β) রূপ বলা হয়। স্টার্চে সকল গ্লুকোজ মনোমার α-সংগঠনে থাকে **(চিত্র ৬.২.৫খ)**, পক্ষান্তরে সেলুলোজে সকল গ্লুকোজ β-সংগঠনে থাকে, ফলে প্রতিটি গ্লুকোজ মনোমার তার প্রতিবেশী মনোমারের তুলনায় উল্টানো অবস্থায় থাকে **(চিত্র ৬.২.৫গ; চিত্র ৬.২.৪গ)**।

স্টার্চ ও সেলুলোজে ভিন্ন ধরনের গ্লাইকোসিডিক লিঙ্কেজ থাকার কারণে এদের ত্রিমাত্রিক গঠনও ভিন্ন হয়। কিছু স্টার্চ অণু প্রধানত পেঁচাল বা হেলিকাল (Helical) আকৃতির, যা গ্লুকোজ সঞ্চয়ের জন্য উপযোগী। বিপরীতে, সেলুলোজ অণু সরলরৈখিক (Straight) এবং কখনও শাখাবিশিষ্ট নয়। সেলুলোজের গ্লুকোজ মনোমারগুলোর কিছু হাইড্রক্সিল গ্রুপ পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল সেলুলোজ অণুর হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে। উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরে এভাবে সমান্তরাল সেলুলোজ অণুগুলো একত্রিত হয়ে মাইক্রোফাইব্রিল (Microfibril) নামে একক গঠন তৈরি করে **(চিত্র ৬.২.৫গ)**। এই তন্তু বা দড়ির মতো মাইক্রোফাইব্রিল উদ্ভিদের জন্য শক্তিশালী গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেলুলোজ কাগজের প্রধান উপাদান এবং তুলার একমাত্র গাঠনিক উপাদান। সেলুলোজের শাখাবিহীন গঠন তার কাজ বা কার্যকারিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে দৃঢ়তা প্রদান করে।

যেসব এনজাইম স্টার্চের α-লিঙ্কেজ ভেঙে তা হজম করতে পারে, তারা সেলুলোজের β-লিঙ্কেজ ভাঙতে সক্ষম নয়, কারণ এই দুই অণুর গঠন ভিন্ন। বাস্তবে খুব অল্পসংখ্যক জীবের মধ্যেই সেলুলোজ হজম করার এনজাইম বিদ্যমান। অধিকাংশ প্রাণী, মানুষসহ, সেলুলোজ হজম করতে পারে না; খাদ্যের সেলুলোজ পরিপাকতন্ত্র অতিক্রম করে মলের সাথে বের হয়ে যায়। এই পথ অতিক্রমের সময় সেলুলোজ পরিপাকতন্ত্রের প্রাচীরকে ঘষে এবং মিউকাস নিঃসরণে উদ্দীপিত করে, যা খাদ্যকে সহজ গতিতে শরীর থেকে বের হতে সহায়তা করে। ফলে সেলুলোজ পুষ্টি হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও এটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অধিকাংশ ফল, সবজি ও সম্পূর্ণ শস্যে সেলুলোজ সমৃদ্ধ থাকে, এবং খাদ্যপণ্যে “অদ্রবণীয় আঁশ (Insoluble fiber)” বলতে মূলত সেলুলোজকেই বোঝায়।

চিত্র ৬.২.৫: স্টার্চ ও সেলুলোজের গঠন।

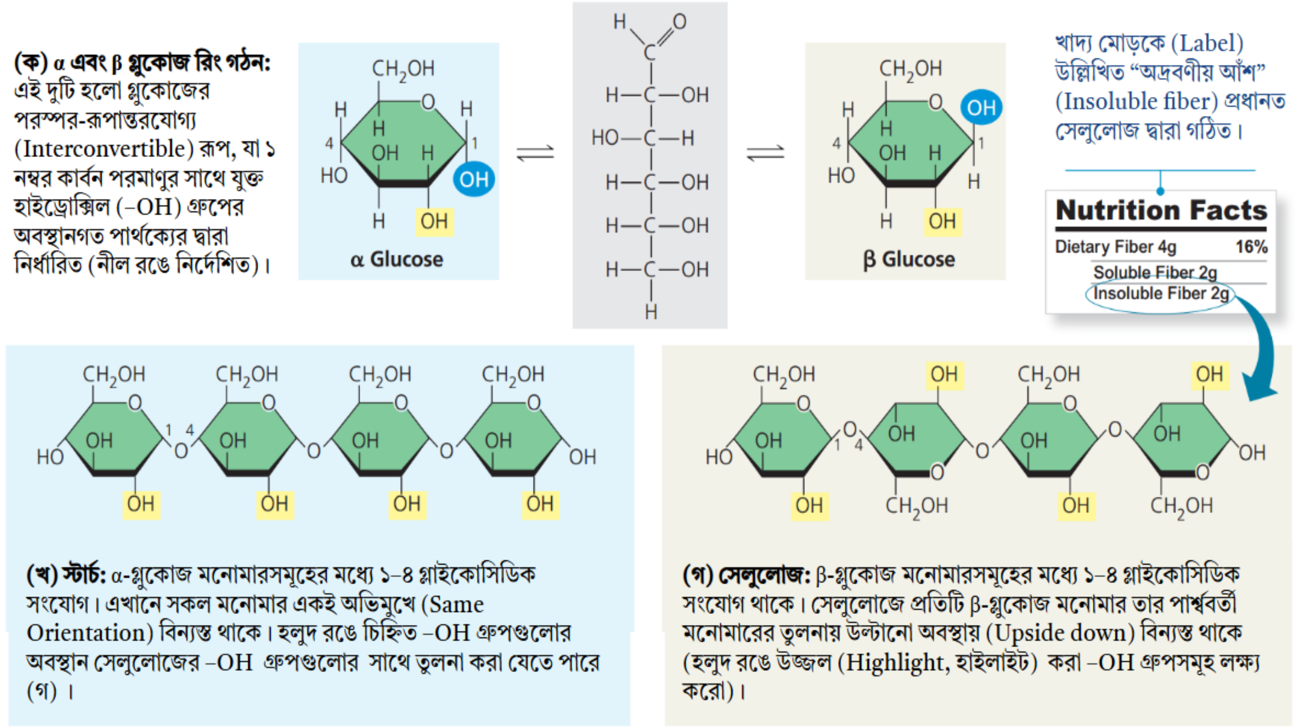

(ক) α এবং β গ্লুকোজ রিং গঠন: এই দুটি হলো গ্লুকোজের পরস্পর-রূপান্তরযোগ্য (Interconvertible) রূপ, যা ১ নম্বর কার্বন পরমাণুর সাথে যুক্ত হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপের অবস্থানগত পার্থক্যের দ্বারা নির্ধারিত (নীল রঙে নির্দেশিত)।

(খ) স্টার্চ: α-গ্লুকোজ মনোমারসমূহের মধ্যে ১–৪ গ্লাইকোসিডিক সংযোগ। এখানে সকল মনোমার একই অভিমুখে (Same Orientation) বিন্যস্ত থাকে। হলুদ রঙে চিহ্নিত –OH গ্রুপগুলোর অবস্থান সেলুলোজের –OH গ্রুপগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে (গ)।

(গ) সেলুলোজ: β-গ্লুকোজ মনোমারসমূহের মধ্যে ১–৪ গ্লাইকোসিডিক সংযোগ থাকে। সেলুলোজে প্রতিটি β-গ্লুকোজ মনোমার তার পার্শ্ববর্তী মনোমারের তুলনায় উল্টানো অবস্থায় (Upside down) বিন্যস্ত থাকে (হলুদ রঙে উজ্জ্বল (Highlight, হাইলাইট) করা –OH গ্রুপসমূহ লক্ষ্য করো)।

কিছু অণুজীব সেলুলোজ ভেঙে গ্লুকোজ মনোমারে পরিণত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, গরুর অন্ত্রে সেলুলোজ-হজমকারী প্রোক্যারিওট ও প্রোটিস্ট বাস করে; তারা ঘাস ও খড়ের সেলুলোজ ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং তা গরুর পুষ্টির জন্য উপযোগী যৌগে রূপান্তর করে। একইভাবে, উইপোকা নিজে সেলুলোজ হজম করতে না পারলেও এর অন্ত্রে বসবাসকারী অণুজীব কাঠ ভেঙে পুষ্টি সরবরাহ করে। কিছু ছত্রাকও মাটিতে ও অন্যান্য পরিবেশে সেলুলোজ ভেঙে রাসায়নিক উপাদান **পুনঃচক্রায়নে** (Recycling) ভূমিকা রাখে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক পলিস্যাকারাইড হলো কাইটিন (Chitin), যা আর্থ্রোপোডদের (Arthropods, যেমন কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, ক্রাস্টাসিয়ান ইত্যাদি) বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) গঠনে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রাণীর নরম অংশকে ঘিরে রাখা কঠিন আবরণ **(চিত্র ৬.২.৬)**। শরীরে প্রোটিন আবরণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কাইটিন সংযুক্ত হয়ে প্রথমে নমনীয় ও চামড়ার মতো থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রোটিনগুলোর রাসায়নিক সংযোজন (যেমন কীটপতঙ্গে) বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্বারা আবৃত হওয়ার (যেমন কাঁকড়ায়) ফলে এটি কঠিন হয়ে যায়।

কাইটিন ছত্রাকেও পাওয়া যায়, যেখানে এটি সেলুলোজের পরিবর্তে কোষপ্রাচীরের গঠন উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গঠনগতভাবে কাইটিন সেলুলোজের অনুরূপ এবং এতে β-লিঙ্কেজ থাকে; তবে পার্থক্য হলো কাইটিনের গ্লুকোজ মনোমারে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ একটি গ্রুপ সংযুক্ত থাকে **(চিত্র ৬.২.৬)**।

৬.৩ লিপিড হলো জলবিমুখ বা হাইড্রোফোবিক (Hydrophobic) অণুর একটি বৈচিত্র্যময় শ্রেণী।

জৈব অণুগুলোর মধ্যে **লিপিড** (Lipid) একমাত্র শ্রেণী, যা প্রকৃত পলিমারের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাধারণত ম্যাক্রোমলিকিউল বা বৃহৎ অণু হিসেবেও গণ্য হয় না। লিপিড একটি শিথিলভাবে সংজ্ঞায়িত অণুগোষ্ঠী এবং আর এই বিস্তৃত অণুগুলোকে লিপিড বলা হয় তাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে — সেটি হলো তারা

চিত্র ৬.২.৬: কাইটিন একটি গাঠনিক পলিস্যাকারাইড, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ প্রাচীর বা বহিঃকঙ্কাল তৈরি করে কাঠামোগত দৃঢ়তা ও শক্তি প্রদান করে।।

কাইটিন একটি প্রধান গাঠনিক পলিস্যাকারাইড পদার্থ, যা কাঁকড়াসহ বহু আর্থ্রোপোডের বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton)-এর মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

কাইটিন মনোমারের আণবিক গঠন

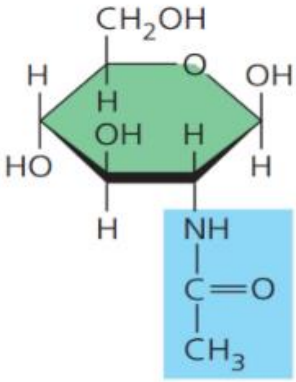

এখানে প্রদর্শিত ফড়িং বা ড্রাগনফ্লাই (Dragonfly, *Anax imperator*) নির্মোচন বা মোল্টিং (Molting) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাইটিন তার কাইটিন দিয়ে তৈরি পুরনো খোলস বা বহিঃকঙ্কাল (বাদামি বর্ণের) ঝরিয়ে ফেলছে এবং পূর্ণবয়স্ক রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

জলবিমুখ বা হাইড্রোফোবিক (Hydrophobic), অর্থাৎ লিপিড পানির সাথে খুব সীমিত বা একেবারেই মিশ্রিত হয় না (পানিতে অদ্রবণীয়)। সঞ্চয়ী চর্বি (যেমন প্রাণীর ফ্যাট), উদ্ভিজ্জ তেল (যেমন জলপাই, ভুট্টা, নারকেল তেল), এবং মোম (যেমন মৌমাছির মোম)—সবই লিপিডের অন্তর্গত। এমনকি কিছু ভিটামিনও লিপিড প্রকৃতির।

লিপিডের জলবিমুখ ধর্ম তাদের আণবিক গঠনের ফল। যদিও কিছু লিপিড অণুতে অক্সিজেন সংশ্লিষ্ট মেরু বন্ধন উপস্থিত থাকতে পারে, তবুও এগুলোর অধিকাংশ অংশ হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত, যেখানে অপেক্ষাকৃত অমেরু C—H বন্ধন প্রাধান্য পায়। অমেরু কার্বন-হাইড্রোজেন (C—H) বন্ধনের আধিক্য থাকায়, দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট লিপিড প্রোটিনের মতো ভাঁজ হয়ে অমেরু অংশকে জলীয় পরিবেশ থেকে আড়াল করতে পারে না। এর পরিবর্তে, জলীয় মাধ্যমে বা পানীতে স্থাপন করলে বহু লিপিড অণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হয়ে গুচ্ছ বা ক্লাস্টার (Cluster) আকার গঠন করে। এই লিপিড গুচ্ছে বা ক্লাস্টারে মেরু (হাইড্রোফিলিক) অংশগুলি বহির্ভাগে জলীয় পরিবেশের দিকে মুখ করে থাকে এবং অমেরু (হাইড্রোফোবিক) অংশগুলি অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ প্রক্রিয়া কোষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কোষঝিল্লির গঠনগত ভিত্তি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, পানির উপর তেল দিলে তা ছোট ছোট ফোঁটার মতো হয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্য কোষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই কোষঝিল্লির গঠন তৈরি হয়।

লিপিডের গঠন ও কার্যকারিতা বৈচিত্র্যময়; এর মধ্যে মোম, নির্দিষ্ট রঞ্জক পদার্থ (Pigment) অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত তিনটি শ্রেণির লিপিড গুরুত্বপূর্ণ— ফ্যাট বা চর্বি (Fat), ফসফোলিপিড (Phospholipid) এবং স্টেরয়েড (Steroid)।

চর্বি (Fat)।

চর্বি বা ফ্যাট প্রকৃত অর্থে পলিমার না হলেও, এটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুসমূহ থেকে ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত বৃহৎ অণু। একটি চর্বি অণু **গ্লিসারল (Glycerol)** এবং তিনটি **ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid)** দ্বারা গঠিত **(চিত্র ৬.৩.১)**। গ্লিসারল একটি অ্যালকোহল, যার প্রতিটি কার্বন পরমাণুর সাথে একটি করে হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপ যুক্ত থাকে। অন্যদিকে, একটি ফ্যাটি অ্যাসিড সাধারণত ১৬ বা ১৮ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট দীর্ঘ কার্বন শৃঙ্খল ধারণ করে। এই শৃঙ্খলের এক প্রান্তে একটি কার্বক্সিল (–COOH) গ্রুপ থাকে, যা এদের "ফ্যাটি অ্যাসিড" নামকরণের জন্য দায়ী; অবশিষ্ট অংশটি একটি হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত।

ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলে বিদ্যমান অপেক্ষাকৃত অমেরু C—H বন্ধনসমূহই চর্বির জলবিমুখ (Hydrophobic) প্রকৃতির জন্য দায়ী। পানির অণুগুলো পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে এবং চর্বিকে পৃথক করে রাখে; ফলে চর্বি পানির সাথে মিশে না। এজন্যই তেল পানির উপর আলাদা স্তর তৈরি করে।

চর্বি গঠনের সময় প্রতিটি ফ্যাটি অ্যাসিড অণু গ্লিসারলের সাথে একটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়, যার ফলে একটি ইস্টার বন্ধন (Ester linkage) গঠিত হয়—এটি একটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এবং একটি কার্বক্সিল গ্রুপের মধ্যে সৃষ্ট বন্ধন। সম্পূর্ণ চর্বি অণুতে একটি গ্লিসারলের সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত থাকে। চর্বিকে ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল (Triacylglycerol) বা ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride) নামেও অভিহিত করা হয়; রক্তে

চিত্র ৬.৩.১: চর্বি বা ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল (Triacylglycerol)-এর গঠন ও সংশ্লেষণ। একটি ফ্যাট (Fat) বা ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল অণুর গাঠনিক একক (Molecular building blocks) হলো একটি গ্লিসারল (Glycerol) অণু এবং তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acids) অণু। ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন পরমাণুগুলো জিগজ্যাগ (Zigzag) আকারে সাজানো দেখানো হয়, যাতে প্রতিটি কার্বন থেকে চারটি একক বন্ধন বা সিঙ্গেল বন্ড (Single bonds)-এর আসল বিন্যাস বা প্রকৃত জ্যামিতিক অভিমুখ (Actual orientations) বোঝানো যায়।

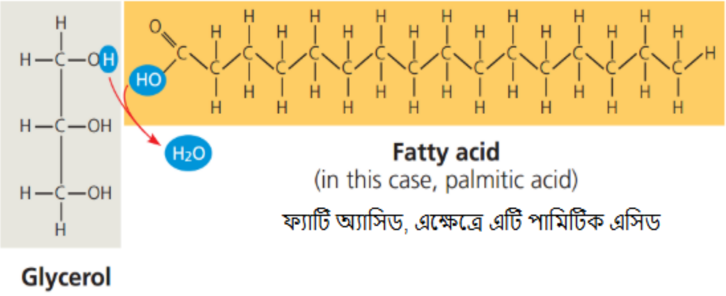

(ক) চর্বি (Fat) তৈরির সময় তিনটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া (Dehydration reactions)-এর একটি এখানে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) যখন গ্লিসারল (Glycerol)-এর সাথে যুক্ত হয়, তখন একটি করে পানির অণু (Water molecule) বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় একটি এস্টার বন্ধন (ester linkage) তৈরি হয়।

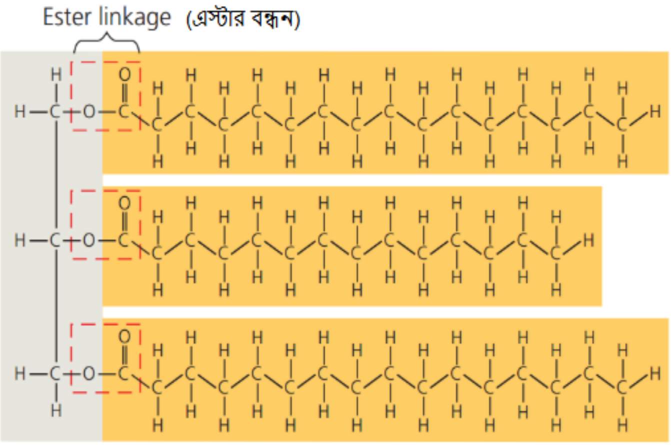

(খ)) একটি ফ্যাট অণু বা ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল (Triacylglycerol), যেখানে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত থাকে। এই উদাহরণে, তিনটির মধ্যে দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড একই রকম।

লিপিড পরীক্ষার সময় ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। একটি চর্বি অণুর তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড একই ধরনেরও হতে পারে, অথবা দুই বা তিন প্রকারের ভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডও থাকতে পারে।

পানিতে স্থাপিত হলে ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglycerides) অণুগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে (spontaneously) একত্রিত হয়ে বৃহৎ আকারের চর্বির বল বা গ্লোবিউল (Fat Globules) গঠন করে, যার একটির আকার আরেকটি থেক অনেক বড় ছোট হতে পারে। যেহেতু চর্বি পানিতে অদ্রবণীয়, তাই এগুলো জীবদেহে নির্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হতে পারে; যেমন অ্যাডিপোজ টিস্যুর (Adipose tissue) ভিতরে।

পুষ্টিবিজ্ঞানে **সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট (Saturated fat) এবং অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (Unsaturated fat)** পরিভাষা দুটি বহুল ব্যবহৃত। এই প্রচলিত পরিভাষাগুলি ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। যদি কার্বন পরমাণুগুলির মধ্যে কোনো দ্বৈত বন্ধন না থাকে, তবে সর্বাধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু কার্বন শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত থাকতে পারে; এই অবস্থাকে হাইড্রোজেন দ্বারা সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড (Saturated) বলা হয়, এবং সংশ্লিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয় **(চিত্র ৬.৩.২ক)**।

অন্যদিকে, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে এক বা একাধিক দ্বৈত বন্ধন থাকে, ফলে প্রতিটি দ্বৈত-বন্ধনযুক্ত কার্বনের সাথে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু কম থাকে **(চিত্র ৬.৩.২খ)**। প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান অধিকাংশ ফ্যাটি অ্যাসিডে এই দ্বৈত বন্ধনগুলো সিস (Cis) রূপে থাকে, যা হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলে একটি বাঁক (Kink) সৃষ্টি করে।

স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত চর্বিকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বলা হয় **(চিত্র ৬.৩.২ক)**। অধিকাংশ প্রাণিজ চর্বি স্যাচুরেটেড প্রকৃতির; এদের ফ্যাটি অ্যাসিড শৃঙ্খলে কোনো দ্বৈত বন্ধন থাকে না, ফলে অণুগুলো ঘনভাবে সজ্জিত হতে পারে। এই কারণে প্রাণিজ চর্বি, যেমন মাখন, সাধারণ রুম বা কক্ষ তাপমাত্রায় (~২৫°C) কঠিন অবস্থায় থাকে।

অপরদিকে, উদ্ভিদ ও মাছের চর্বি সাধারণত আনস্যাচুরেটেড, অর্থাৎ এতে এক বা একাধিক ধরনের আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে**(চিত্র ৬.৩.২খ)**। এ ধরনের চর্বি সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় তরল থাকে এবং এগুলোকে তেল (Oil) বলা হয়; যেমন জলপাই তেল, ইলিশ বা রুই মাছের তেল। সিস দ্বৈত বন্ধনের কারণে সৃষ্ট বাঁক অণুগুলোকে ঘনভাবে সজ্জিত হতে বাধা দেয়, ফলে এগুলো কঠিন আকার ধারণ করতে পারে না।

খাদ্য মোড়ক বা লেবেলে উল্লিখিত “হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল অয়েল” বলতে বোঝায় যে, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটে কৃত্রিমভাবে হাইড্রোজেন সংযোজন করে তাকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে তা কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে। মার্জারিন (উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরি মাখনের একটি কৃত্রিম বিকল্প) এবং অন্যান্য অনেক খাদ্যপণ্য এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়, যাতে লিপিডগুলো তরল (তেল) আকারে পৃথক হয়ে না যায়।

চর্বি সমৃদ্ধ খাদ্য হৃদ্‌রোগের একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস শরীরে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) নামের হৃদ্‌রোগ (Heart disease) বিকাশে অবদান রাখতে পারে। এই রোগে রক্তনালীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমা হয় যাকে প্ল্যাক (Plaque) বলা হয়। প্ল্যাক রক্তনালীর ভেতরের দিকে বিস্ফোট বা স্ফীতি (Bulge) তৈরি করে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত এবং রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা (Resilience) হ্রাস করতে পারে। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack) এবং হার্ট ফেইলিওর (Heart Failure)-এর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack) এবং হার্ট ফেইলিওর (Heart Failure) হৃদরোগের দুটি ভিন্ন অবস্থা। হার্ট অ্যাটাক হলো হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, যার প্রধান লক্ষণ বুকে তীব্র ব্যথা। হার্ট

চিত্র ৬.৩.২: স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (Saturated and Unsaturated Fats and Fatty Acids)।

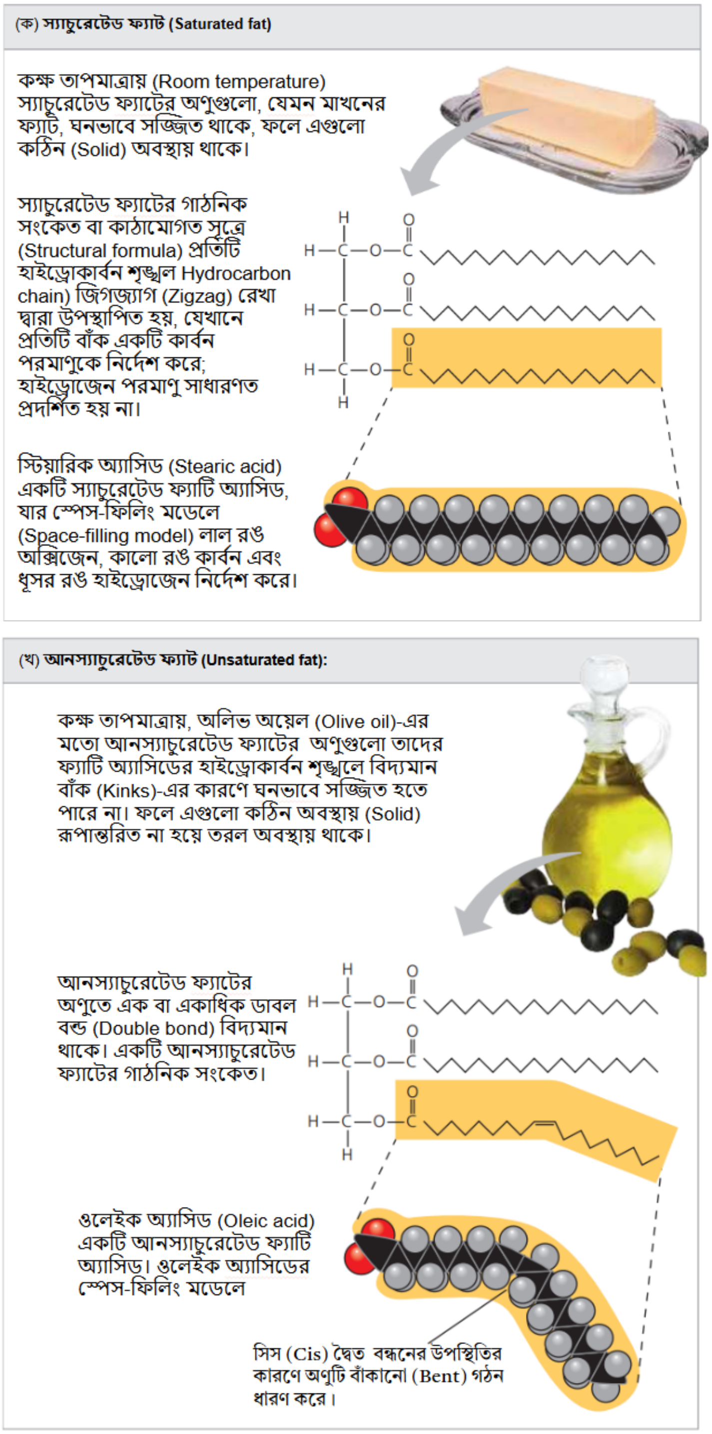

ফেইলিওর হলো হার্টের রক্ত সঞ্চালন বা পাম্প (Pump) করার ক্ষমতা কমে যাওয়া, যা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী এবং শ্বাসকষ্ট বা দুর্বলতার কারণ। অনেক ক্ষেত্রে রক্তনালীতে চর্বি-সমৃদ্ধ পদার্থ বা প্ল্যাকের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্কের ধমনীতে পৌঁছালে স্ট্রোক (Stroke) ঘটতে পারে। স্ট্রোক (Stroke) হলো মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে বাধা বা রক্তনালী ফেটে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট একটি জরুরি অবস্থা, যা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে দ্রুত নষ্ট করে দেয়। স্ট্রোকের লক্ষণগুলোর মধ্যে মুখের একপাশ বেঁকে যাওয়া, হাত-পা দুর্বলতা, কথা জড়িয়ে যাওয়া এবং তীব্র মাথাব্যথা অন্যতম। এটি একটি পক্ষাঘাত বা স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে, তাই স্ট্রোক হলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নেয়া প্রয়োজন।

অনেক বছর ধরে মনে করা হতো যে প্রাণীজ স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি খাওয়া হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এমন কিছু খাবার (যেমন উদ্ভিজ্জ তেল থেকে মার্জারিন) তৈরি করতে শুরু করে, যেখানে আনস্যাচুরেটেড তেলে হাইড্রোজেন যোগ করে সেটিকে আংশিকভাবে স্যাচুরেটেড করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **আংশিক হাইড্রোজেনেশন (Partial hydrogenation)**। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা। কিন্তু সমস্যা হলো, এই প্রক্রিয়ায় *"cis"* ডাবল বন্ড *"trans"* ডাবল বন্ডে পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে তৈরি হয় "ট্রান্স ফ্যাট"। ট্রান্স ফ্যাটের গঠনে বাঁক কম থাকায় এগুলো কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন থাকে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো নিম্ন-ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (Low-density lipoprotein, LDL) বা তথাকথিত "খারাপ কোলেস্টেরল"-এর মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং উচ্চ-ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (High-density lipoprotein, HDL) বা "ভাল কোলেস্টেরল"-এর মাত্রা হ্রাস করে। ফলে ট্রান্স ফ্যাট থেকে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি স্যাচুরেটেড ফ্যাটের চেয়েও বেশি হতে পারে।

অর্থাৎ, যেটিকে বেশি স্বাস্থ্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটিই শেষ পর্যন্ত কম স্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু ট্রান্স ফ্যাট প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যাপকভাবে উপস্থিত, তাই যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA), যারা খাদ্য পণ্যের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও গুণমান নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কাজ করে, তারা খাদ্য মোড়কে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করেছে এবং "সাধারণত নিরাপদ বলে বিবেচিত" (Generally Regarded as Safe, GRAS) যৌগসমূহের তালিকা থেকে ট্রান্স ফ্যাটকে বাদ দিয়েছে। ডেনমার্ক ও সুইজারল্যান্ডের মতো কিছু দেশ ইতোমধ্যে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ট্রান্স ফ্যাট খাদ্যে নিষিদ্ধ করেছে।

চর্বির প্রধান কাজ হলো শক্তি সঞ্চয়। চর্বির হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খল জ্বালানি তেলের (যেমন পেট্রোল) অণুর অনুরূপ এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন। প্রতি গ্রাম চর্বিতে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ একটি পলিস্যাকারাইড (যেমন স্টার্চ)-এর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। অধিকাংশ চর্বি অণুতে ৪০টিরও বেশি কার্বন পরমাণু থাকে। চর্বিতে বিদ্যমান C—H বন্ধনের অনুপাত কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। এই বৈশিষ্ট্য চর্বিকে রাসায়নিক শক্তি সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী অণু হিসেবে পরিণত করে। গড়ে, প্রতি গ্রাম চর্বি প্রায় ৯ কিলোক্যালরি (kcal) রাসায়নিক শক্তি সরবরাহ করে, যেখানে কার্বোহাইড্রেট প্রায় ৪ kcal/গ্রাম শক্তি সরবরাহ করে।

উদ্ভিদ সাধারণত স্থির প্রকৃতির হওয়ায় তারা স্টার্চের মতো বৃহৎ আকারের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। (উদ্ভিজ্জ তেল সাধারণত বীজে সঞ্চিত থাকে, যেখানে অপেক্ষাকৃত ঘন শক্তি সঞ্চয় উদ্ভিদের জন্য সুবিধাজনক।) অন্যদিকে, প্রাণীদের তাদের শক্তির ভাণ্ডার বহন করতে হয়; ফলে অধিক ঘন শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে চর্বি বিশেষভাবে উপযোগী। অধিকাংশ প্রাণীজ উৎসের চর্বি স্যাচুরেটেড হয় (কিছু মাছের তেল ব্যতীত), যেখানে অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ চর্বি আনস্যাচুরেটেড । ব্যতিক্রম হলো ট্রপিকাল উদ্ভিজ্জ তেল, যেমন তেলপাম ও নারিকেল তেল, যা তরল হলেও কক্ষ তাপমাত্রায় স্যাচুরেটেড।

যখন একটি জীব অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে, এটি স্টার্চ, গ্লাইকোজেন বা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। উন্নত দেশগুলোর অনেক মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন বৃদ্ধি পায়, কারণ তাদের শক্তি চাহিদা হ্রাস পায়, কিন্তু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ফলে, গ্রহণকৃত কার্বোহাইড্রেটের একটি বড় অংশ চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। মানুষসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী দীর্ঘমেয়াদি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অ্যাডিপোজ কোষে (Adipose cells) চর্বি জমা করে, যা চর্বি সঞ্চয় বা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে স্ফীত বা সংকুচিত হয়। শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি অ্যাডিপোজ টিস্যু কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং ত্বকের নিচে অবস্থিত চর্বির স্তর দেহকে তাপ নিরোধ (Insulated) করে। এই সাবকিউটেনিয়াস (Subcutaneous) বা ত্বকের সবচেয়ে নিচের স্তরটি তিমি, সিল এবং অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বিশেষভাবে পুরু, যা ঠান্ডা সমুদ্রজলে তাদের দেহকে ঠাণ্ডা থেকে সুরক্ষিত রাখে।

ফসফোলিপিড (Phospholipid)।

জীবদেহের গঠন, কাজ ও বংশগতির ক্ষুদ্রতম ও মৌলিক একক যে কোষ তা একধরনের লিপিড দিয়ে তৈরি, যাকে বলা হয় **ফসফোলিপিড (Phospholipid)**। ফসফোলিপিড কোষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো কোষঝিল্লির (Cell membrane) প্রধান উপাদান। ফসফোলিপিড ছাড়া কোষঝিল্লি অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না।

চিত্র ৬.৩.৩: ফসফোলিপিডের গঠন (Structure of a phospholipid)। একটি ফসফোলিপিড অণুর একটি জলাকর্ষী (Hydrophilic/Polar) মাথা এবং দুটি জলবিমুখ (Hydrophobic/Nonpolar) লেজ বিদ্যমান। চিত্রে দেখানো ফসফোলিপিডটি ফসফাটিডাইলকোলিন (Phosphatidylcholine) নামে

পরিচিত, যেখানে একটি কোলিন (Choline) অণু ফসফেট (Phosphate) গ্রুপের সাথে সংযুক্ত থাকে। এখানে উপস্থাপিত হয়েছে—

(ক) কাঠামোগত সূত্র (Structural formula), (খ) স্পেস-ফিলিং মডেল (Space-filling model), যেখানে হলুদ রঙ ফসফরাস (Phosphorus) এবং নীল রঙ নাইট্রোজেন (Nitrogen) নির্দেশ করে, (গ) ফসফোলিপিডের প্রতীকী উপস্থাপন (Symbol), যা সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে ব্যবহৃত হবে, এবং (ঘ) জলীয় পরিবেশে (Aqueous environment) ফসফোলিপিডের স্ব-সংগঠনের (Self-assembly) মাধ্যমে গঠিত দ্বিস্তর (Bilayer) কাঠামো।

চিত্র ৬.৩.৩-এ প্রদর্শিত অনুযায়ী, একটি ফসফোলিপিড অণু চর্বি (Fat) অণুর অনুরূপ হলেও এতে গ্লিসারল (Glycerol)-এর সাথে তিনটির পরিবর্তে মাত্র দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড (Fatty acid) যুক্ত থাকে। গ্লিসারলের তৃতীয় হাইড্রক্সিল (-OH) গ্রুপটি একটি ফসফেট (Phosphate) গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকে, যা কোষের অভ্যন্তরে ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক আধান বহন করে। সাধারণত, ফসফেট গ্রুপের সাথে একটি অতিরিক্ত ছোট আধানযুক্ত বা মেরুকৃত (Polar) অণুও যুক্ত থাকে। কোলিন (Choline) এমন একটি অণুর উদাহরণ, তবে এ ধরনের আরও অনেক অণু রয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন ধরনের ফসফোলিপিড গঠিত হয় এবং তারা একে অপরের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

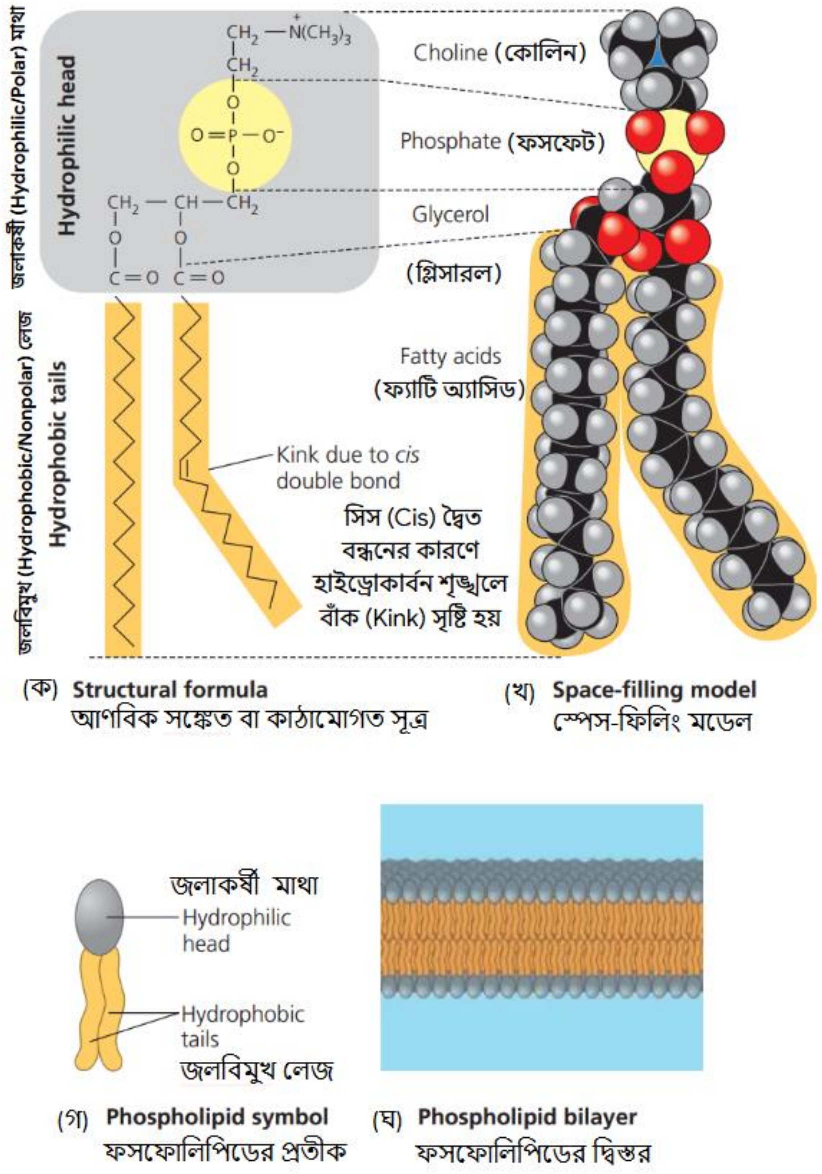

ফসফোলিপিড অণুর দুই প্রান্ত পানির প্রতি ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে। হাইড্রোকার্বন লেজ (Hydrocarbon tails) জলবিমুখ (Hydrophobic) হওয়ায় পানি থেকে দূরে থাকে। অপরদিকে, ফসফেট গ্রুপ ও এর সাথে যুক্ত অংশগুলো একটি জলাকর্ষী (Hydrophilic) "মাথা" (Head) গঠন করে, যার পানির প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। এই গঠনটি লিপিড অণুর কাজের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও প্রথমে এটি কিছুটা অদ্ভুত (আপাতবৈপরীত, paradoxical) মনে হয়। প্রশ্ন আসে, একটি অণু কেন একই সাথে পানিতে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় হবে? এর উত্তর হচ্ছে লিপিডের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই জলীয় পরিবেশে কোষের ঝিল্লি (Cell Membrane) গঠিত হতে পারে।

পানির মধ্যে, লিপিডের অমেরুকৃত লেজগুলো পানিকে এড়িয়ে একসাথে জড়ো হয় (Aggregate), এবং গোলাকার গঠন তৈরি করে যাকে **মাইসেল (Micelle)** বলা হয়। এখানে লেজগুলো ভেতরের দিকে থাকে। কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট অণুরও দুটি ভিন্ন প্রান্ত থাকে: একটি পানির প্রতি আকৃষ্ট (হাইড্রোফিলিক মাথা) এবং অন্যটি তেল বা চর্বির প্রতি আকৃষ্ট (হাইড্রোফোবিক লেজ) এবং পানিতে মেশালে একইভাবে মাইসেল তৈরি করে। ময়লা চর্বি বা গ্রিজ (Grease) মাইসেলের ভেতরের অমেরুকৃত অংশে (Nonpolar interior) ঢুকে যায়, আর বাইরের মেরুকৃত অংশ (Polar surface) পানির সাথে মিশে যায় **(চিত্র ৬.৩.৪ক)**।

কিন্তু ফসফোলিপিডের ক্ষেত্রে আরও জটিল গঠন তৈরি হয়। যখন ফসফোলিপিড পানিতে যোগ করা হয়, তখন এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি **দ্বিস্তর (Bilayer)** গঠন করে, যা তাদের জলবিমুখ ফ্যাটি অ্যাসিড লেজগুলোকে পানির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে **(চিত্র ৬.৩.৪খ)**। কোষের পৃষ্ঠে ফসফোলিপিডগুলো একই ধরনের দ্বিস্তর বিন্যাসে সাজানো থাকে। এখানে অণুগুলোর জলাকর্ষী মাথাগুলো দ্বিস্তরের বাইরের দিকে অবস্থান করে এবং কোষের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের জলীয় দ্রবণের সাথে সংস্পর্শে থাকে। অপরদিকে, জলবিমুখ লেজগুলো পানির সংস্পর্শ এড়িয়ে দ্বিস্তরের অভ্যন্তরের দিকে মুখ করে থাকে। ফসফোলিপিডের গঠন অণুস্তরে "গঠন ও কার্যকারিতার সামঞ্জস্য" (Form fits function), অর্থাৎ "কোনো কিছুর গঠন তার কাজকে নির্ধারণ করে" -এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ফসফোলিপিড 'দ্বিস্তর (Bilayer)' কোষ ও তার বহিঃপরিবেশের মধ্যে একটি সীমানা (Boundary) গঠন করে এবং ইউক্যারিওটিক কোষের ভেতরে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ (Compartments) প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতপক্ষে, কোষের অস্তিত্বই ফসফোলিপিডের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

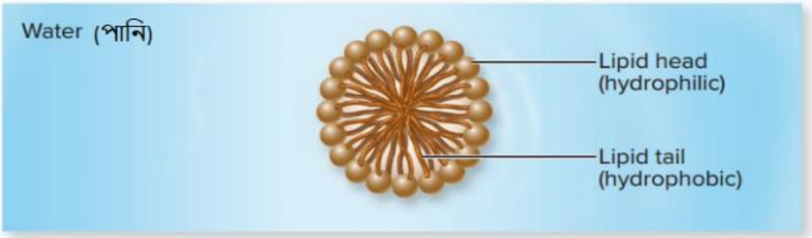

ক

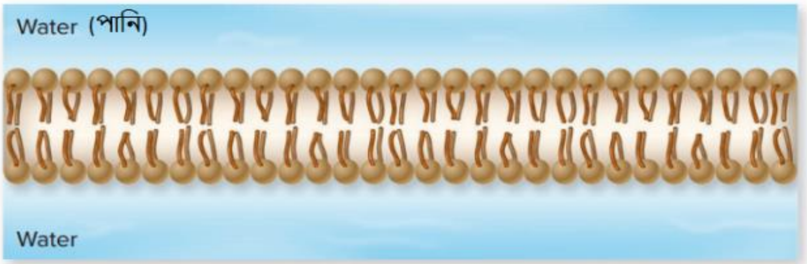

খ

চিত্র ৬.৩.৪: পানিতে লিপিডের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাইসেল ও দ্বিস্তর গঠন। জলীয় পরিবেশে (Aqueous environment) লিপিড অণুগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে, তাদের মেরুকৃত (Polar) বা জলাকর্ষী (Hydrophilic) মাথাগুলো পানির দিকে অবস্থান করে। যেহেতু পানিও মেরুকৃত, তাই এই মাথাগুলো পানির সংস্পর্শে থাকে। অপরদিকে, অমেরুকৃত (Nonpolar) বা জলবিমুখ (Hydrophobic) লেজগুলো পানির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে এবং পানির ভিতরে নিজেদের দিকে গুটিয়ে নেয়। এই অবস্থায় "মাইসেল" (Micelles) নামক ক্ষুদ্র গোলাকার ফোঁটা বা ঝিল্লির মতো গঠন তৈরি হতে পারে (ক), অথবা ফসফোলিপিড অণুগুলো নিজেদেরকে দুটি স্তরে (Two layers) সাজিয়ে ফসফোলিপিড দ্বিস্তর (Phospholipid bilayer) গঠন করতে পারে (খ)। উভয় গঠনেই জলাকর্ষী মাথাগুলো বাইরের দিকে প্রসারিত থাকে এবং জলবিমুখ লেজগুলো ভেতরের দিকে অবস্থান করে। দ্বিতীয় ধরনের এই গঠনকেই ফসফোলিপিড দ্বিস্তর (Phospholipid bilayer) বলা হয়।

লিপিডের অন্যান্য প্রকারভেদও বিদ্যমান।

চর্বি ও ফসফোলিপিড ছাড়াও জীবদেহে আরও অনেক ধরনের লিপিড থাকে **(চিত্র ৬.৩.৫)**। **টারপিন (Terpene)** দীর্ঘ-শৃঙ্খলযুক্ত (Long-chain) লিপিড, যা বিভিন্ন জৈবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জকের (Pigments) উপাদান; যেমন ক্লোরোফিল (Chlorophyll) এবং দৃষ্টিজনিত রঞ্জক রেটিনাল (Retinal)। আবার রাবারও (Rubber) একটি টারপিন শ্রেণিভুক্ত যৌগ।

স্টেরয়েড (Steroid) লিপিডের আরেকটি শ্রেণি, যাদের কার্বন কাঠামো চারটি পরস্পর সংযুক্ত (Fused) বা জোড়া লাগানো রিং দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন স্টেরয়েডের পার্থক্য নির্ধারিত হয় এই রিংসমষ্টির সাথে সংযুক্ত নির্দিষ্ট রাসায়নিক গোষ্ঠী (Chemical groups)-এর ভিন্নতার মাধ্যমে। অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন স্টেরয়েডের মধ্যে কাজের ভিন্নতা তৈরি হয় এই রিংগুলোর সাথে কোন রাসায়নিক গোষ্ঠী যুক্ত আছে তার উপর।

কোলেস্টেরল (Cholesterol), যা একটি স্টেরয়েড, প্রাণীদেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অণু। এটি প্রাণী কোষঝিল্লির একটি প্রধান উপাদান এবং অন্যান্য স্টেরয়েড, যেমন মেরুদণ্ডী প্রাণীর যৌন হরমোন (Sex hormones)—সংশ্লেষণের মূল বিক্রিয়ক বা পূর্বসূরী পদার্থ (Precursor) হিসেবে কাজ করে। কোলেস্টেরল থেকে তৈরি টেস্টোস্টেরন (Testosterone) ও ইস্ট্রোজেন (Estrogen) একজাতীয় স্টেরয়েড যা বহুকোষী প্রাণীতে যৌন হরমোন হিসেবে কাজ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল যকৃতে (Liver) সংশ্লেষিত হয় এবং খাদ্যের মাধ্যমেও গ্রহণ করা হয়। রক্তে কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis) নামক রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। যদিও কিছু বিজ্ঞানী এখন এই রোগে কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট (saturated fats)-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন (Prostaglandin) প্রায় ২০ প্রকার লিপিডের একটি গোষ্ঠী, যা পরিবর্তিত ফ্যাটি অ্যাসিড (Modified fatty acids) থেকে গঠিত; এদের একটি ৫-কার্বন রিং (5-carbon ring)-এর সাথে হাইড্রোকার্বনের অমেরুকৃত লেজ (Nonpolar tails) সংযুক্ত থাকে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনসমূহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী টিস্যুতে (Vertebrate tissues) স্থানীয় রাসায়নিক বার্তাবাহক (Local chemical messengers) হিসেবে কাজ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই জটিল ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহের বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৬.৩.৫: লিপিডের বিভিন্ন প্রকারভেদ। (ক) টারপিন (Terpene) জৈব রঞ্জক (Biological pigment)-এর মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন ক্লোরোফিল (Chlorophyll) ও রেটিনাল (Retinal)। (খ) স্টেরয়েড (Steroid) কোষঝিল্লির (Membrane) গঠন ও কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রাসায়নিক সংকেত প্রেরণে (Chemical signaling) জড়িত হরমোনের একটি শ্রেণীর মৌলিক ভিত্তি (Basis) হিসেবে কাজ করে। স্টেরয়েড-এর চারটি পরস্পর সংযুক্ত রিং (Interconnected rings)-এর সাথে যুক্ত রাসায়নিক গোষ্ঠী (Chemical groups)-এর ভিন্নতার কারণে এগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয় (চিত্রে বাদামী রঙে দেখানো হয়েছে)।

(ক) টারপিন

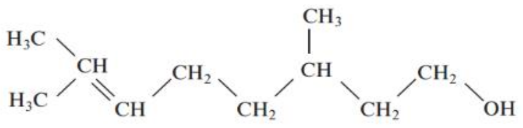

Terpene (citronellol)

(খ) কোলেস্টেরল

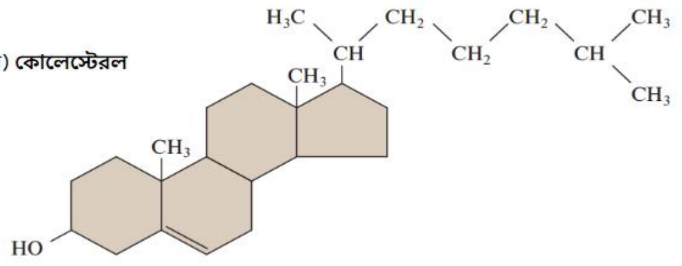

Steroid (cholesterol)

৬.৪ প্রোটিনের গঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যার ফলে এদের কার্যাবলিও অনেক ধরনের হয়।

জীবদেহের প্রায় প্রতিটি কাজই প্রোটিনের ওপর নির্ভরশীল। "Protein" শব্দটি গ্রিক শব্দ *Proteios* থেকে এসেছে, যার অর্থ "প্রথম" বা "প্রধান"—এ থেকেই প্রোটিনের গুরুত্ব বোঝা যায়। প্রোটিন (Protein) হলো বৃহৎ অণুগুলোর (Biological macromolecules) মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়—রাসায়নিক (Chemical) গঠন ও কার্যাবলি (Functional) উভয় দিক থেকেই।

মজব অধিকাংশ কোষের শুকনো ভরের (Dry mass) ৫০%-এরও বেশি অংশ প্রোটিন দ্বারা গঠিত। জীবদেহের প্রায় সব কার্যক্রমেই প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিছু প্রোটিন রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction) দ্রুততর করে, আবার কিছু প্রোটিন প্রতিরক্ষা (Defense), সঞ্চয় (Storage), পরিবহন (Transport), কোষীয় যোগাযোগ (Cellular communication), চলন (Movement) এবং কাঠামো ধারণ (Structural support)-এ কাজ করে **(চিত্র ৬.৪.১)**। কোষে প্রোটিনের এত বেশি ধরনের কাজ রয়েছে যে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে তালিকাভুক্ত করা

চিত্র ৬.৪.১: প্রোটিনের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

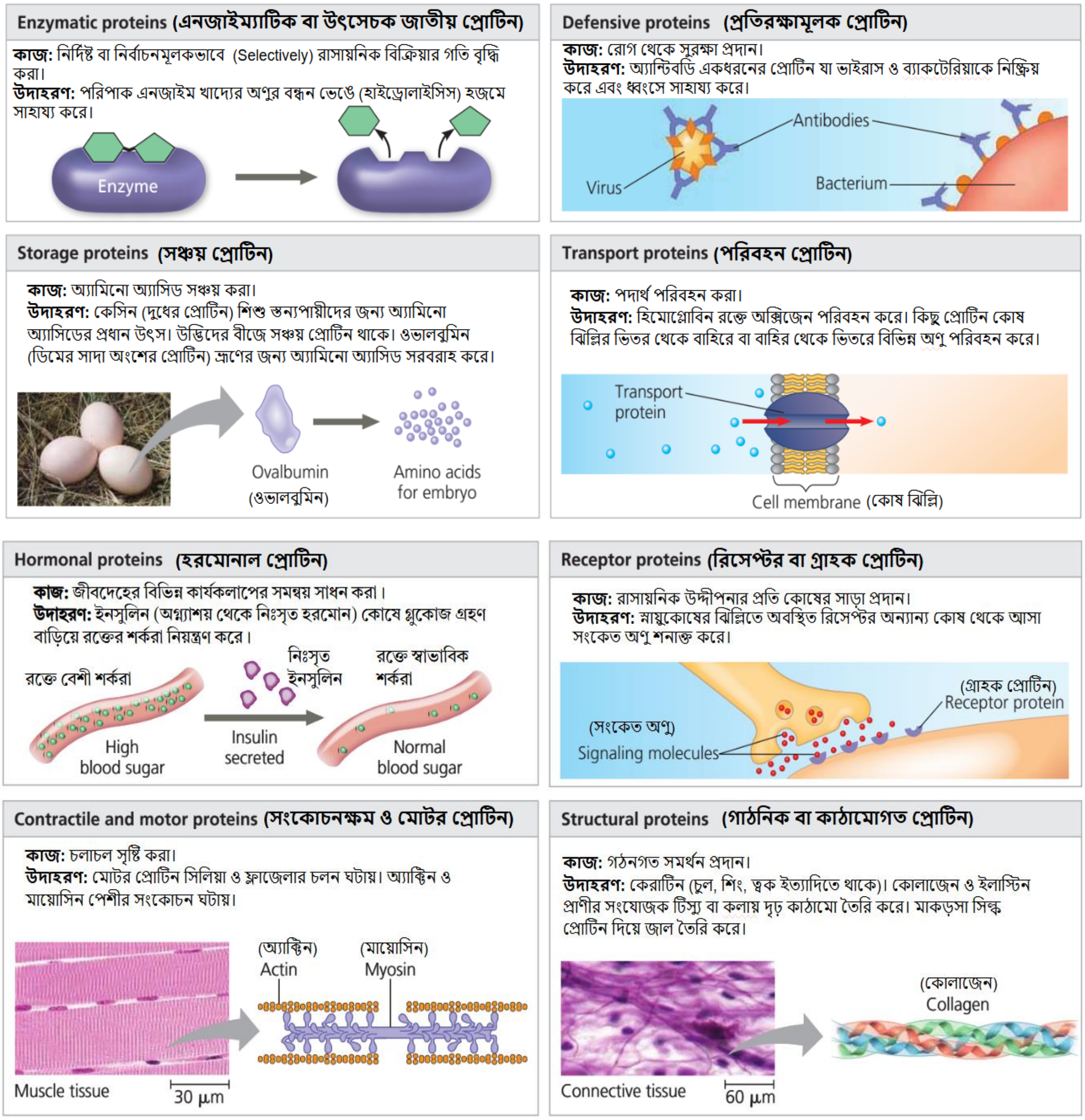

প্রায় অসম্ভব। **৬.৪.২** তালিকাটি শুধুমাত্র একটি সারসংক্ষেপ (Summary); কারণ প্রোটিনের কার্যাবলি জীববিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এনজাইম (Enzyme) ছাড়া জীবন সম্ভব নয়, এবং অধিকাংশ এনজাইমই প্রোটিন। এনজাইম বিপাকক্রিয়া (Metabolism) নিয়ন্ত্রণ করে উৎসেচক বা ক্যাটালিস্ট (Catalyst) হিসেবে কাজ করে—অর্থাৎ নিজে ক্ষয় না হয়ে নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়ায়। একটি এনজাইম বারবার একই কাজ করতে পারে, তাই এগুলোকে কোষের “কর্মঠ বা পরিশ্রমী যন্ত্র” (Workhorse) বলা যায়, যা জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালিয়ে রাখে।

মানবদেহে হাজার হাজার ভিন্ন ধরনের প্রোটিন রয়েছে, এবং প্রতিটিরই নির্দিষ্ট গঠন ও কাজ আছে। প্রোটিন আসলে একধরনের জটিল গঠনের (Structurally sophisticated) অণু। এদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গঠনেও ব্যাপক পার্থক্য থাকে, এবং প্রতিটি প্রোটিনের নিজস্ব ত্রিমাত্রিক (3D, Three-dimensional) আকৃতি থাকে।

সব প্রোটিনই ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acid) দিয়ে তৈরি, যা শাখাবিহীন (Unbranched) সরল শৃঙ্খলে যুক্ত থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে বন্ধনকে পেপটাইড বন্ধন (Peptide bond) বলা হয়, এবং এই শৃঙ্খলকে পলিপেপটাইড (Polypeptide) বলা হয়। এক বা একাধিক পলিপেপটাইড নির্দিষ্টভাবে ভাঁজ (Folded) ও প্যাঁচানো (Coiled) হয়ে জৈবিকভাবে যে কার্যকর বৃহৎ অণু তৈরি করে, তাকে প্রোটিন (Protein) বলা হয়।

প্রোটিন হলো অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার।

প্রোটিন হলো সরল শৃঙ্খলে (Linear) যুক্ত পলিমার, যা ২০ ধরনের ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড (মোনোমার) দিয়ে গঠিত।

অ্যামিনো অ্যাসিড নাম থেকেই বোঝা যায়, এতে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি অম্লীয় কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর নির্দিষ্ট ক্রম (Sequence) একটি প্রোটিনের গঠন ও কাজ নির্ধারণ করে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, অ্যামিনো অ্যাসিড পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে গঠিত প্রথম দিকের অণুগুলোর মধ্যে ছিল। ধারণা করা হয়, প্রাচীন পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড উপস্থিত ছিল।

সব অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি সাধারণ গঠন থাকে।অ্যামিনো অ্যাসিড হলো এমন একটি জৈব অণু, যাতে একই সঙ্গে একটি **অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$)** এবং একটি **কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COOH$)** থাকে (**চিত্র ৬.৪.৩**)।

চিত্র ৬.৪.৩: একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ সূত্র দেখানো হয়েছে।

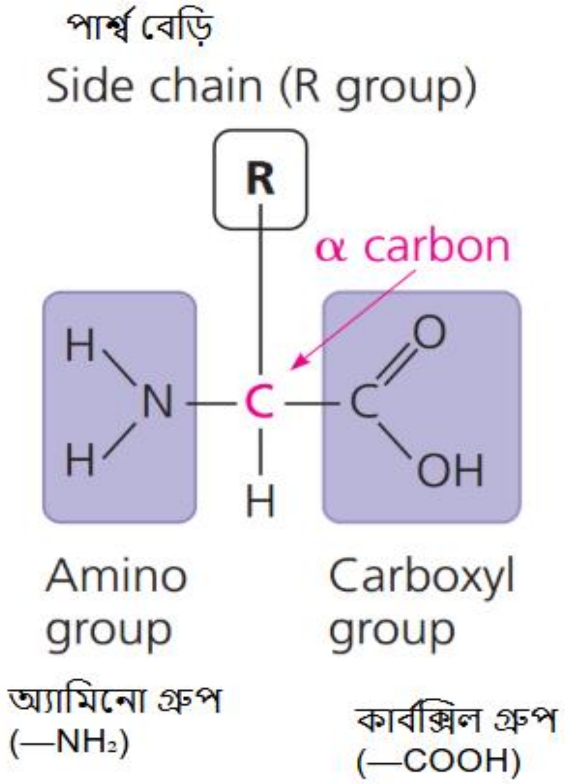

তালিকা ৬.৪.২: প্রোটিনের বিভিন্ন কাজ (The Many Functions of Protein)।

কাজ (Function)	**প্রোটিনের শ্রেণি (Class of Protein)**	**উদাহরণ (Examples)**	**ব্যবহার/কাজ (Examples of Use)**
এনজাইমীয় অনুঘটন (Enzyme catalysis)	উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme)	গ্লাইকোসিডেজ (Glycosidase)	পলিস্যাকারাইড ভাঙে
		প্রোটিয়েজ (Protease)	প্রোটিন ভেঙে ফেলে
		পলিমারেজ (Polymerase)	নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ করে
		কাইনেজ (Kinase)	শর্করা ও প্রোটিনে ফসফেট যুক্ত করে
প্রতিরক্ষা (Defense)	ইমিউনোগ্লোবুলিন (Immunoglobulin)	অ্যান্টিবডি (Antibody)	বিদেশী বা শরীরে অপরিচিত প্রোটিন ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত করে
	টক্সিন (Toxin) (জীবের শরীরে উৎপন্ন বিষ)	সাপের বিষ (Snake venom)	স্নায়ুর কার্যক্রম বাধা দেয়
	কোষ-পৃষ্ঠ অ্যান্টিজেন (Cell-surface antigen)	এমএইচসি প্রোটিন (MHC proteins)	"নিজস্ব" সনাক্তকরণ
পরিবহন (Transport)	সঞ্চালনকারী পরিবাহক (Circulating transporter)	হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin)	রক্তে O_2 ও CO_2 বহন করে
		মায়োগ্লোবিন (Myoglobin)	পেশীতে O_2 ও CO_2 বহন করে

		সাইটোক্রোম (Cytochrome)	ইলেকট্রন পরিবহন
	ঝিল্লি পরিবাহক (Membrane transporter)	সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প (Sodium-potassium pump)	ঝিল্লির ভিতরে ও বাহিরে সোডিয়াম-পটাসিয়াম আনা নেয়া করে।
		প্রোটন পাম্প (Proton pump)	কেমিওসমোসিস (Chemiosmosis), এটি হলো ঝিল্লির মধ্যে আয়নের প্রবাহ।
		গ্লুকোজ পরিবাহক (Glucose transporter)	কোষে গ্লুকোজ প্রবেশ করায়
সহায়ক (Support)	তন্তু (Fiber)	কোলাজেন (Collagen)	তরুণাস্থি তৈরি করে
		কেরাটিন (Keratin)	চুল ও নখ তৈরি করে
		ফাইব্রিন (Fibrin)	রক্ত জমাট বাঁধায়
গতি (Motion)	পেশী (Muscle)	অ্যাকটিন (Actin)	পেশীর সংকোচন
		মায়োসিন (Myosin)	পেশীর সংকোচন
নিয়ন্ত্রণ (Regulation)	অসমোটিক প্রোটিন (Osmotic proteins)	সিরাম অ্যালবুমিন (Serum albumin)	রক্তের আস্রবণশীলতা বা অসমোটিক ঘনত্ব বজায় রাখে
	জিন নিয়ন্ত্রক (Gene regulators)	ল্যাক রিপ্রেসর (lac repressor)	ট্রান্সক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করে
	হরমোন (Hormone)	ইনসুলিন (Insulin)	রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে
		ভ্যাসোপ্রেসিন (Vasopressin)	কিডনিতে পানি ধারণ বাড়ায়

		অক্সিটোসিন (Oxytocin)	জরায়ুর সংকোচন ও দুধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে
সঞ্চয় (Storage)	আয়ন-বাইন্ডিং (Ion-binding)	ফেরিটিন (Ferritin)	লৌহ সঞ্চয় করে
		কেসিন (Casein)	দুধে অ্যামিনো অ্যাসিড ও আয়ন সঞ্চয় করে
		ক্যালমোডুলিন (Calmodulin)	ক্যালসিয়াম আয়নের সাথে যুক্ত হয়

নোট:
MHC = Major Histocompatibility Complex (মেজর হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স)

অ্যামিনো অ্যাসিডের কেন্দ্রে একটি অসমমিত (Asymmetric) কার্বন পরমাণু থাকে, যাকে **আলফা (α) কার্বন** বলা হয়। এই কার্বনের সঙ্গে চারটি ভিন্ন উপাদান যুক্ত থাকে:

- একটি **কার্বক্সিল গ্রুপ (—COOH)**
- একটি **কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণু (C)**
- একটি **হাইড্রোজেন (H)**
- এবং একটি পরিবর্তনশীল পার্শ্ব অণুর গোষ্ঠী, যাকে **R গ্রুপ** (Side chain, পার্শ্ব বেড়ি বা শিকল) বলা হয়

গঠনটি সাধারণভাবে এভাবে লেখা যায়:

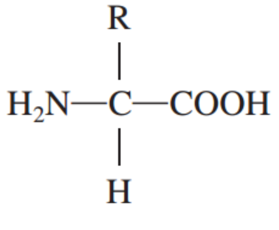

এই কেন্দ্রীয় কার্বনের সব বন্ধন পূর্ণ থাকে।

প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিশেষত্ব নির্ধারিত হয় তার **R গ্রুপ** দ্বারা। এই R গ্রুপ প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে ভিন্ন হয়; এটি কখনো খুব সরল, যেমন একটি হাইড্রোজেন, আবার কখনো জটিল কার্বন কাঠামো ও বিভিন্ন কার্যকরী গ্রুপ নিয়ে গঠিত হতে পারে। যদি R গ্রুপ শুধুমাত্র হাইড্রোজেন (যেমন গ্লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিডে) না হয়, তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড **কাইরাল (Chiral)** হয় এবং দুই ধরনের এনানশিওমার (D এবং L) আকারে থাকতে পারে। জীবন্ত কোষে শুধুমাত্র **L-অ্যামিনো অ্যাসিড** প্রোটিনে ব্যবহৃত হয়; D-অ্যামিনো অ্যাসিড খুবই বিরল। R গ্রুপের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যই একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এবং প্রোটিনের কাজকে প্রভাবিত করে।

১৯৫০-এর দশকের শুরুতে ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার (Frederick Sanger, ১৯১৮–২০১৩)-এর অগ্রগামী গবেষণা প্রমাণ করে যে প্রতিটি প্রোটিনের একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম (Amino acid sequence) থাকে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড অপসারণ ও সনাক্ত করার মাধ্যমে তিনি ইনসুলিনের (Insulin) অ্যামিনো

অ্যাসিড অনুক্রম নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে দেখান যে এই প্রোটিনের একটি নির্দিষ্ট অনুক্রম রয়েছে এবং দ্রবণে উপস্থিত সব ইনসুলিন অণুতেই সেই অনুক্রম একই থাকে।

প্রকৃতিতে অনেক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকলেও, সাধারণত মাত্র ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৮টিকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (Essential amino acids) বলা হয়, কারণ মানবদেহ এগুলো নিজে তৈরি করতে পারে না; তাই খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে হয়। **চিত্র ৬.৪.৪**-এ কোষে ব্যবহৃত ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড দেখানো হয়েছে, যা হাজার হাজার প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এখানে অ্যামিনো ও কার্বক্সিল গ্রুপগুলোকে তাদের **আয়নিত (Ionized)** অবস্থায় দেখানো হয়েছে, কারণ কোষের pH-এ তারা সাধারণত এই অবস্থায় থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে তাদের **পার্শ্ব বেড়ি বা সাইড চেইন (R গ্রুপ)**-এর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়:

ননপোলার (Nonpolar) সাইড চেইন (হাইড্রোফোবিক / জলবিমুখ): এই ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পানির সাথে ভালোভাবে মিশে না। যেমন: **অ্যালানিন (Alanine)** → R গ্রুপ: $-CH_3$ → ননপোলার (জলবিমুখ)।

পোলার (Polar) সাইড চেইন (হাইড্রোফিলিক / জলপ্রেমী): এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পানির সাথে সহজে মিশতে পারে। যেমন: **সিরিন (Serine)** → R গ্রুপ: $-CH_2OH$ → পোলার (জলপ্রেমী)

অ্যাসিডিক (Acidic) অ্যামিনো অ্যাসিড (ঋণাত্মক চার্জযুক্ত): এদের সাইড চেইনে সাধারণত কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, যা কোষের pH-এ আয়নিত হয়ে নেতিবাচক চার্জ ধারণ করে। যেমন: **গ্লুটামিক অ্যাসিড (Glutamic Acid)** → R গ্রুপ: $-CH_2-CH_2-COOH$ ।

বেসিক (Basic) অ্যামিনো অ্যাসিড (ধনাত্মক চার্জযুক্ত): এদের সাইড চেইনে অ্যামিনো গ্রুপ থাকে, যা সাধারণত ধনাত্মক চার্জ ধারণ করে। যেমন: **লাইসিন (Lysine)** → R গ্রুপ: $-(CH_2)_4-NH_2$ ।

এখানে “অ্যাসিডিক” ও “বেসিক” শব্দগুলো শুধুমাত্র সাইড চেইন (R গ্রুপ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব অ্যামিনো অ্যাসিডেই মূল গঠনে অ্যামিনো ও কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে। যেসব অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইনে চার্জ থাকে (অ্যাসিডিক ও বেসিক), তারা সাধারণত হাইড্রোফিলিক (জলপপ্রেমী)।

কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যারোমেটিক (Aromatic), যেমন **ফেনাইলঅ্যালানিন (Phenylalanine)**। এদের পার্শ্বশিকল (Side chain) বা R-গ্রুপে একটি সুস্থিত অ্যারোমেটিক বলয় (যেমন- বেনজিন রিং) থাকে। এছাড়াও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছেঃ

মেথিওনিন (Methionine): প্রোটিন শিকল বা চেইনের প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে। এটি প্রোটিন সংশ্লেষণের (Translation) সময় mRNA-এর শুরুর কোডন বা বা স্টার্ট (Start) কোডন AUG দ্বারা সংকেতিত হয়। তাই এটি প্রোটিন চেইনের প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে ।

প্রোলিন (Proline): প্রোটিন চেইনে বাঁক (Kink) তৈরি করে। এর গঠন চক্রাকার (Cyclic) হওয়ায় এটি প্রোটিন চেইনে বাঁক বা "Kink" (Helix breaker) তৈরি করে। এটি প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে প্রোটিন শিকল বা চেইনের মোড় ঘোরার জন্য।

সিস্টেইন (Cysteine): প্রোটিন চেইনের মধ্যে সংযোগ (Bond) তৈরি করে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি সালফাহাইড্রিল (-SH)) গ্রুপ থাকে। দুটি সিস্টেইন অণুুর মধ্যে বিক্রিয়ায় ডাইসালফাইড বন্ধন (Disulfide bond -S-S) তৈরি হয়, যা প্রোটিনের গঠনকে দৃঢ় করতে চেইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিড তার সাইড চেইন (R গ্রুপ)-এর রাসায়নিক প্রকৃতির মাধ্যমে প্রোটিনের আকৃতি ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব অংশে

চিত্র ৬.৪.৪: প্রোটিনের ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রথমে একটি সাধারণ অ্যামিনো অ্যাসিডের দুইটি আয়নিত রূপ দেখানো হয়েছে। কোষের ভেতরে pH প্রায় ৭.২ হওয়ায় এই আয়নিত রূপগুলোই বেশি দেখা যায়। অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত তাদের সাইড চেইন (R group)-এর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিন অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ বা এক অক্ষরের প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয় (বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে)। প্রোটিনে ব্যবহৃত সব অ্যামিনো অ্যাসিডই L-এনানশিওমার।

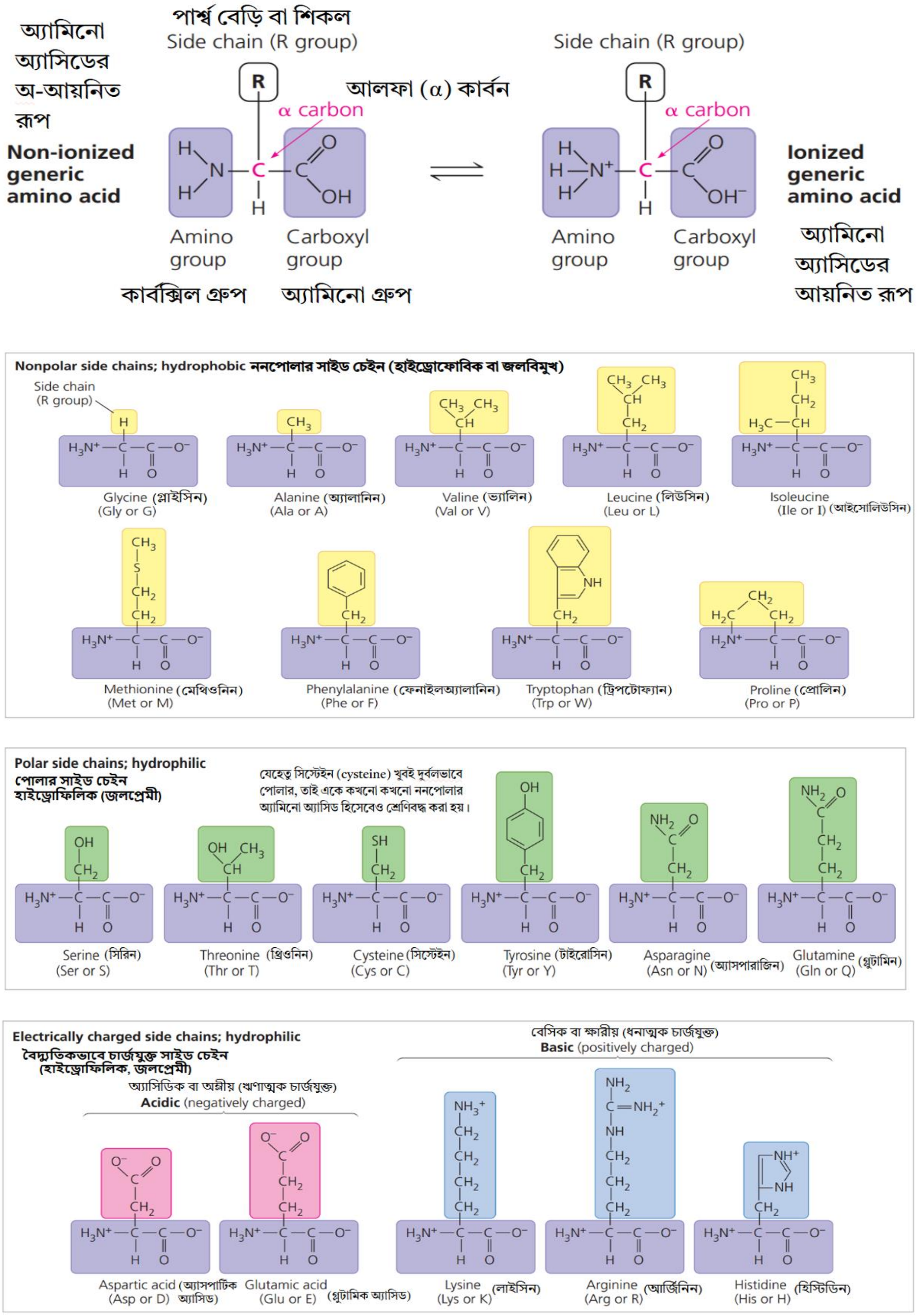

বেশি ননপোলার জলবিমুখ বা হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, সেগুলো সাধারণত পানিকে এড়িয়ে প্রোটিনের ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে যায়, যাকে হাইড্রোফোবিক বর্জন বা এক্সক্লুশন (Hydrophobic exclusion) বলা হয়। হাইড্রোফোবিক এক্সক্লুশন (Hydrophobic exclusion) বা হাইড্রোফোবিক বর্জন হলো জলীয় বা পোলার (Polar) পরিবেশে অ-পোলার (Non-polar) বা জল-বিদ্বেষী অণুগুলোর একসাথে গুচ্ছবদ্ধ (Aggregate) হয়ে যাওয়ার প্রবণতা। সহজ কথায়, পানির অণুগুলো জলবিমুখ বা হাইড্রোফোবিক অণুগুলোকে নিজেদের থেকে দূরে ঠেলে দেয়, যার ফলে ওই অণুগুলোগুলো একে অপরের সাথে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়।

অ্যামিনো অ্যাসিডের মনোমারগুলো যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তৈরি করে।

এই পর্যায়ে আমরা জানব কীভাবে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একত্রিত হয়ে পলিমার গঠন করে। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের R গ্রুপ (R group) শারীরবৃত্তীয় pH (Physiological pH) -এ আয়নিত (Ionized) অবস্থায় থাকে। এক প্রান্তে ধনাত্মক অ্যামিনো গ্রুপ ($NH3^+$) এবং অন্য প্রান্তে ঋণাত্মক কার্বক্সিল গ্রুপ (COO^-) থাকে। যখন দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড এমনভাবে অবস্থান করে যে একটির কার্বক্সিল গ্রুপ (Carboxyl group) অন্যটির অ্যামিনো গ্রুপের (Amino group) পাশে আসে, তখন একটি নির্জলীকরণ বা ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া (Dehydration reaction) ঘটে এবং একটি পানির অণু অপসারিত হয় (**চিত্র ৬.৪.৫**)। এর ফলে যে সমযোজী বন্ধন (Covalent bond) তৈরি হয় তাকে পেপটাইড বন্ধন (Peptide bond) বলা হয়। এই বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড N—C সংযোগের চারদিকে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে না, কারণ পেপটাইড বন্ধনের আংশিক দ্বি-বন্ধন (Partial double-bond) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কেন্দ্রীয় কার্বনের সাথে থাকা N—C এবং C—C বন্ধন থেকে ভিন্ন। পেপটাইড বন্ধনের চারদিকে ঘূর্ণনের সীমাবদ্ধতা অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল থেকে কুণ্ডলী (Coil) ও অন্যান্য গঠন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত সরল, শাখাবিহীন অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলকে পলিপেপটাইড (Polypeptide) বলা হয়। অর্থাৎ, পলিপেপটাইড হলো অনেক অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত একটি পলিমার। কোষ কীভাবে পলিপেপটাইড তৈরি করে, সে সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যদি একটি পলিপেপটাইড ভাঁজ হয়ে (Fold) নির্দিষ্ট কার্যসম্পন্ন গঠন তৈরি করতে পারে, তবে তাকে প্রোটিন (Protein) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, লালায় উপস্থিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এনজাইম লাইসোজাইম (Lysozyme) একটি প্রোটিন। তবে কিছু প্রোটিন, যেমন রক্তের অক্সিজেন পরিবহনকারী হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin), একাধিক পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত।

চিত্র ৬.৪.৫-এ বেগুনি রঙে দেখানো পরমাণুর পুনরাবৃত্ত ধারাকে পলিপেপটাইডের মেরুদণ্ড বা ব্যাকবোন (Polypeptide backbone) বলা হয়। এই মেরুদণ্ড বা ব্যাকবোন থেকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন বা R গ্রুপ (R group) বের হয়ে থাকে। পলিপেপটাইডের দৈর্ঘ্য কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে শুরু করে ১,০০০ বা তারও বেশি অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি নির্দিষ্ট পলিপেপটাইডের একটি স্বতন্ত্র সরল অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম (Linear sequence) থাকে।

পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের এক প্রান্তে একটি মুক্ত অ্যামিনো গ্রুপ থাকে, যাকে N-টার্মিনাস (N-terminus) বলা হয়। অপর প্রান্তে একটি মুক্ত কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, যাকে C-টার্মিনাস (C-terminus) বলা হয়। একটি পলিপেপটাইডের সামগ্রিক রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে এর সাইড চেইনের ধরন ও অনুক্রমের উপর। এই সাইড চেইনগুলো নির্ধারণ করে পলিপেপটাইড কীভাবে ভাঁজ (Fold) হবে এবং এর চূড়ান্ত আকৃতি ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। প্রকৃতিতে বিদ্যমান অসংখ্য পলিপেপটাইড একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তুলে ধরে—কোষ সীমিত সংখ্যক

মনোমার (Monomer) ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন অনুক্রমে যুক্ত করে অসংখ্য ধরনের এবং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের পলিমার তৈরি করতে পারে।

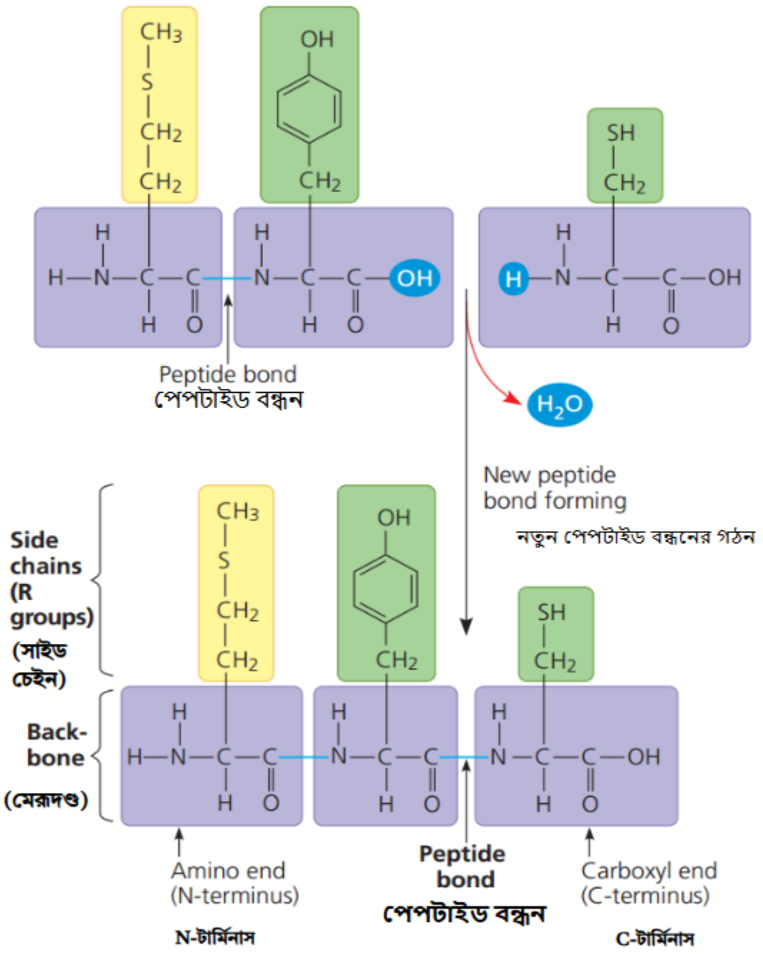

চিত্র ৬.৪.৫: একটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের (Polypeptide chain) গঠন। পেপটাইড বন্ধন নির্জলীকরণ বা ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়, যা একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপকে পরবর্তী অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপের সাথে যুক্ত করে। পেপটাইড বন্ধন এক সময়ে একটি করে গঠিত হয় এবং এটি অ্যামিনো প্রান্ত বা N-টার্মিনাস (N-terminus) থেকে শুরু হয়। পলিপেপটাইডের একটি মেরুদণ্ড বা ব্যাকবোন থাকে, যা চিত্রে বেগুনি (Purple) রঙে দেখানো হয়েছে। এই ব্যাকবোনের সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন বা R গ্রুপ (Side chains/R groups) যুক্ত থাকে, যা চিত্রে হলুদ (Yellow) ও সবুজ (Green) রঙে দেখানো হয়েছে।

প্রোটিনের গঠন ও কাজ (Protein Structure and Function)।

প্রোটিনের কাজ নির্ভর করে তার জটিল ত্রিমাত্রিক গঠনের (3D/Three-dimensional structure) উপর। এই গঠনের সবচেয়ে সহজ স্তর হলো অ্যামিনো অ্যাসিডেরধারাবাহিক বিন্যাস বা সিকোয়েন্স (Amino Acid Sequence)। একটি পলিপেপটাইডের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম থেকেই বোঝা যায় প্রোটিনটি কীভাবে ভাঁজ হবে এবং কী কাজ করবে।

“পলিপেপটাইড” আর “প্রোটিন” এক জিনিস নয়। একটি পলিপেপটাইড অনেকটা লম্বা সুতার মতো, আর সেই সুতা দিয়ে নির্দিষ্ট আকারের সোয়েটার তৈরি করলে যেমন একটি সম্পূর্ণ জিনিস হয়, তেমনি পলিপেপটাইড ভাঁজ হয়ে কার্যকর প্রোটিন তৈরি করে । একটি কার্যকর প্রোটিনে এক বা একাধিক পলিপেপটাইড সঠিকভাবে পাকানো, ভাঁজ হওয়া এবং কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে (**চিত্র ৬.৪.৬**)।

প্রতিটি পলিপেপটাইডের অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রমই নির্ধারণ করে যে স্বাভাবিক কোষীয় পরিবেশে (Cellular conditions) প্রোটিনটি কী ধরনের ত্রিমাত্রিক গঠন ধারণ করবে। যখন একটি কোষ পলিপেপটাইড তৈরি করে, তখন শৃঙ্খলটি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Spontaneously) ভাঁজ হয়ে কার্যকরী গঠন ধারণ করে। এই ভাঁজ হওয়ার প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের বন্ধন (Bond) গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত ও

চিত্র ৬.৪.৬: প্রোটিনকে বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন বা চিত্রিত (Visualization) করা যায়, যা নির্ভর করে প্রোটিনের চিত্রটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।

Structural Models
(গাঠনিক মডেল)

প্রোটিনের গঠন নিয়ে গবেষণার বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করে কম্পিউটার প্রোটিনের অনেক ধরনের গাঠনিক মডেল তৈরি করতে পারে। প্রতিটি মডেল প্রোটিনের গঠনের ভিন্ন দিককে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু কোনো একক মডেল প্রোটিনের প্রকৃত চেহারা সম্পূর্ণভাবে দেখাতে পারে না। এখানে দেখানো তিনটি মডেল **লাইসোজাইম (Lysozyme)** নামক একটি প্রোটিনকে উপস্থাপন করে, যা চোখের পানি ও লালায় থাকে। লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন অণুকে নিশানা করে তাদের সাথে যুক্ত হয় এবং অণুগুলোর কার্যকলাপ নষ্ট করে, যা শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

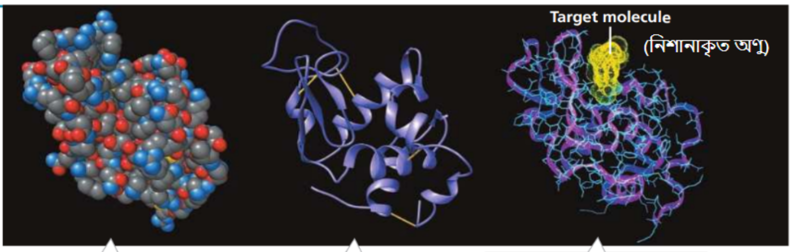

স্পেস-ফিলিং মডেল (Space-filling model): প্রোটিনের সামগ্রিক গোলাকার (Globular) আকৃতি দেখায়। এতে প্রোটিনের সব পরমাণু (হাইড্রোজেন ছাড়া) প্রদর্শিত হয়। রঙের অর্থ: ধূসর = কার্বন (Carbon), লাল = অক্সিজেন (Oxygen), নীল = নাইট্রোজেন (Nitrogen), হলুদ = সালফার (Sulfur)

রিবন মডেল (Ribbon model): শুধুমাত্র পলিপেপটাইড ব্যাকবোন দেখায়। এটি প্রোটিন কীভাবে ভাঁজ হয়ে ত্রিমাত্রিক আকৃতি তৈরি করে তা বোঝায়। এখানে প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক আকৃতিটি ডাইসালফাইড বন্ধন (হলুদ রেখা) দ্বারা স্থিতিশীল হয়েছে।

ওয়্যারফ্রেম মডেল (Wireframe model, নীল): প্রোটিনের ওয়্যারফ্রেম মডেল হলো প্রোটিন অণুর ত্রিমাত্রিক (3D) কাঠামোর একটি সরলীকৃত চিত্র, যেখানে শুধুমাত্র পরমাণুগুলোর মধ্যকার বন্ধনগুলোকে রেখা বা তারের (wire) মতো দেখানো হয়। এটি প্রোটিন গঠনের ভেতরের কঙ্কাল বা কঙ্কালচিত্রের মতো। এতে পলিপেপটাইড ব্যাকবোন দেখায়, যেখানে পাশের শৃঙ্খলগুলো (Side chains) বের হয়ে থাকে। এটি রিবন মডেলের তুলনায় আরও বিশদ। এখানে ব্যাকটেরিয়ার নিশানাকৃত অণু (হলুদ) যুক্ত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

Simplified Diagrams
(সরলীকৃত চিত্র)

প্রোটিন উপস্থাপনের জন্য সব সময় বিস্তারিত কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় না। যখন চিত্রের মূল লক্ষ্য প্রোটিনের **কাজ (Function)** দেখানো, তখন সরল চিত্র বেশি উপযোগী।

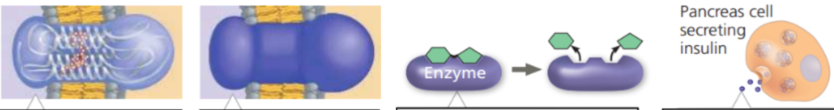

একটি স্বচ্ছ (Transparent) আকৃতি ব্যবহার করে চোখের রডোপসিন (Rhodopsin) প্রোটিনের রিবন মডেলে দেখানো হয়েছে। এতে প্রোটিনের আকার ও কিছু অভ্যন্তরীণ গঠন বোঝা যায়।

যখন প্রোটিন কাঠামোর বিস্তারিত প্রয়োজন হয় না, তখন একটি অস্বচ্ছ বা কঠিন (Solid) সরল আকৃতি ব্যবহার করা যায়।

এখানে একটি সাধারণ আকৃতি ব্যবহার করে একটি এনজাইমকে দেখানো হয়েছে, কারণ এখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে এনজাইমের কাজকে বোঝানো।

কখনও কখনও প্রোটিনকে শুধুমাত্র একটি বিন্দু (Dot) হিসেবেও দেখানো হয়, যেমন এখানে ইনসুলিনের ক্ষেত্রে।

স্থিতিশীল হয়, এবং এই বন্ধনগুলো নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুক্রমের উপর।

অনেক প্রোটিন প্রায় গোলাকার আকৃতির হয়, যাদের গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) বলা হয়। আবার কিছু প্রোটিন দীর্ঘ আঁশ বা তন্তুর (Fiber) মতো আকৃতির হয়, যাদের আঁশালো বা ফাইব্রাস প্রোটিন (Fibrous protein) বলা হয়। এই দুটি প্রধান শ্রেণির মধ্যেও অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়।

একটি প্রোটিনের নির্দিষ্ট গঠনই তার কার্য নির্ধারণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোনো প্রোটিনের কাজ নির্ভর করে তার অন্য একটি অণুকে সনাক্ত (Recognize) ও আবদ্ধ (Bind) করার ক্ষমতার উপর। অর্থাৎ, প্রোটিনের কাজ হলো অন্য কোনো অণুকে চিনতে ও তার সাথে যুক্ত হতে পারা। গঠন ও কার্যকারিতার চমৎকার উদাহরণ হিসেবে অ্যান্টিবডি (Antibody) এবং ফ্লু ভাইরাসের (Flu virus) মধ্যে সুনির্দিষ্ট আকৃতিগত মিল উল্লেখ করা যায় **(চিত্র ৬.৪.৭)**। অ্যান্টিবডি হলো শরীরের একটি প্রোটিন, যা ভাইরাসের নির্দিষ্ট অংশের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত করে।

আরেকটি উদাহরণ হলো এন্ডরফিন (Endorphin) ও মরফিন (Morphine)। এন্ডরফিন শরীরের তৈরি অণু এবং মরফিন একটি কৃত্রিম ওষুধ। উভয়ই মানুষের মস্তিষ্কের কোষের পৃষ্ঠে অবস্থিত রিসেপ্টর প্রোটিনের (Receptor protein) সাথে যুক্ত হতে পারে। এর

ফলে আনন্দ অনুভূতি (Euphoria) সৃষ্টি হয় এবং ব্যথা কমে যায়। মরফিন, হেরোইন (Heroin) এবং অন্যান্য ওপিয়েট (Opiate) ওষুধ এন্ডরফিনের মতো কাজ করতে পারে, কারণ এদের আকৃতি এন্ডরফিনের অনুরূপ। তাই এরা মস্তিষ্কের এন্ডরফিন রিসেপ্টরের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত হতে পারে। এই সংযুক্তি অত্যন্ত নির্দিষ্ট, অনেকটা হাত মেলানো বা করমর্দনের (Handshake) মতো। এন্ডরফিন রিসেপ্টরসহ অন্যান্য রিসেপ্টর অণুও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। তাই প্রোটিনের সঠিক গঠনই তার নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা দেয়। অর্থাৎ, একটি প্রোটিনের কাজ—যেমন কোনো রিসেপ্টর প্রোটিনের নির্দিষ্ট ব্যথানাশক সংকেতবাহী অণুর সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা—তার সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল আণবিক গঠনের (Molecular structural order) ফলস্বরূপ উদ্ভূত একটি বৈশিষ্ট্য (Emergent property)।

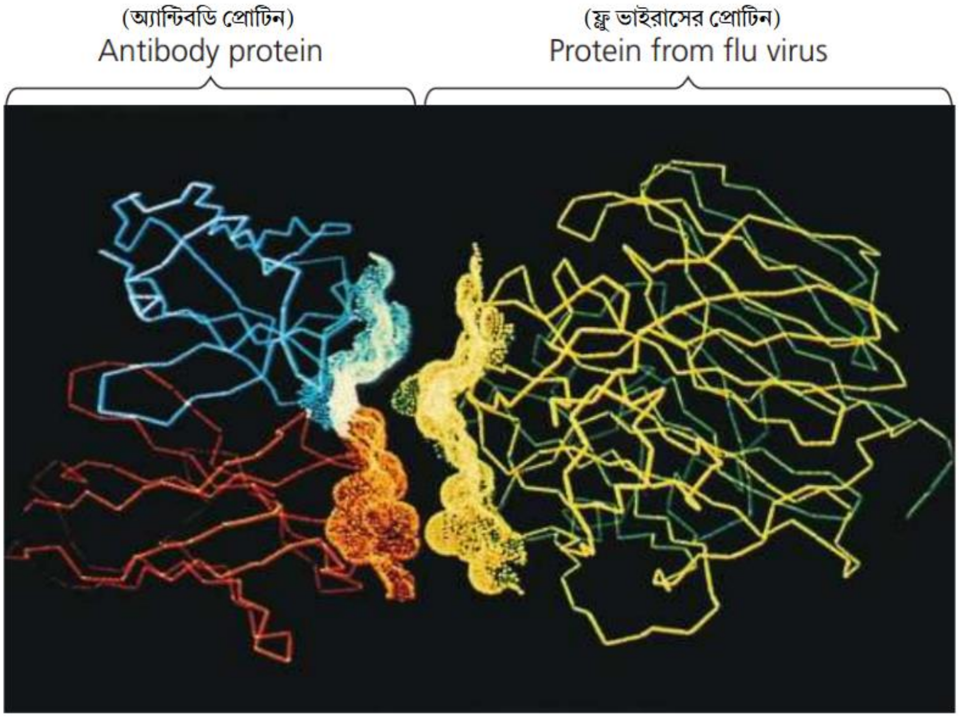

চিত্র ৬.৪.৭: দুটি প্রোটিনের পৃষ্ঠের আকৃতিগত মিল বা পরিপূরকতা (Complementarity of Shape Between Two Protein Surfaces)। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি (X-ray crystallography) নামক একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অ্যান্টিবডি প্রোটিনের (নীল ও কমলা, বাম পাশে) সাথে একটি ফ্লু ভাইরাস প্রোটিনের (হলুদ ও সবুজ, ডান পাশে) যুক্ত অবস্থার কম্পিউটার মডেল তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি পরিবর্তিত ওয়্যারফ্রেম মডেল (Wireframe model), যেখানে দুটি প্রোটিন যে স্থানে মিলিত হয়েছে সেখানে একটি “ইলেকট্রন ঘনত্ব মানচিত্র” (Electron density map) যোগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে দুটি ছবিকে সামান্য দূরে সরিয়ে দেখানো হয়েছে, যাতে তাদের পৃষ্ঠের আকৃতিগত মিল বা পরিপূরকতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

প্রোটিনের গঠনের চারটি ভাগ (Four Levels of Protein Structure)।

অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় হওয়া সত্ত্বেও, সব প্রোটিনের গঠন সাধারণত তিনটি স্তরে বা ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেগুলো হলো প্রাইমারি (Primary, ১ম), সেকেন্ডারি (Secondary, ২য়) এবং টারশিয়ারি (Tertiary, ৩য়) গঠন। যখন কোনো প্রোটিন দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত হয়, তখন একটি চতুর্থ ভাগ সৃষ্টি হয়, যাকে কোয়াটার্নারি (Quaternary, ৪র্থ) গঠন বলা হয়। চিত্র ৬.৪.৮-এ প্রোটিন গঠনের এই চারটি ভাগ বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের আণবিক ভিত্তি বোঝার জন্য প্রোটিনের বিভিন্ন গঠন ভালোভাবে অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৬.৪.৮: প্রোটিনের বিভিন্ন গঠনের তাত্ত্বিক ছবি (কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি)।

প্রাইমারি স্ট্রাকচার (Primary Structure)

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর সরল বা সোজা শৃঙ্খল

প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচার বলতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর নির্দিষ্ট ক্রম বা বিন্যাসকে (Sequence) বোঝায়। উদাহরণ হিসেবে ট্রান্সথাইরেটিন (Transthyretin) নামের একটি গোলাকার রক্তের প্রোটিনকে ধরা যেতে পারে, যা ভিটামিন A এবং একটি থাইরয়েড হরমোন পরিবহন করে। ট্রান্সথাইরেটিন চারটি একই ধরনের পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত, এবং প্রতিটি শৃঙ্খলের ১২৭টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এখানে এর একটি শৃঙ্খলকে খুলে দেখানো হয়েছে, যাতে এর প্রাইমারি স্ট্রাকচার সহজে বোঝা যায়। শৃঙ্খলের প্রতিটি অবস্থানে ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের যেকোনো একটি থাকে, যা এখানে তিন অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপে দেখানো হয়েছে।

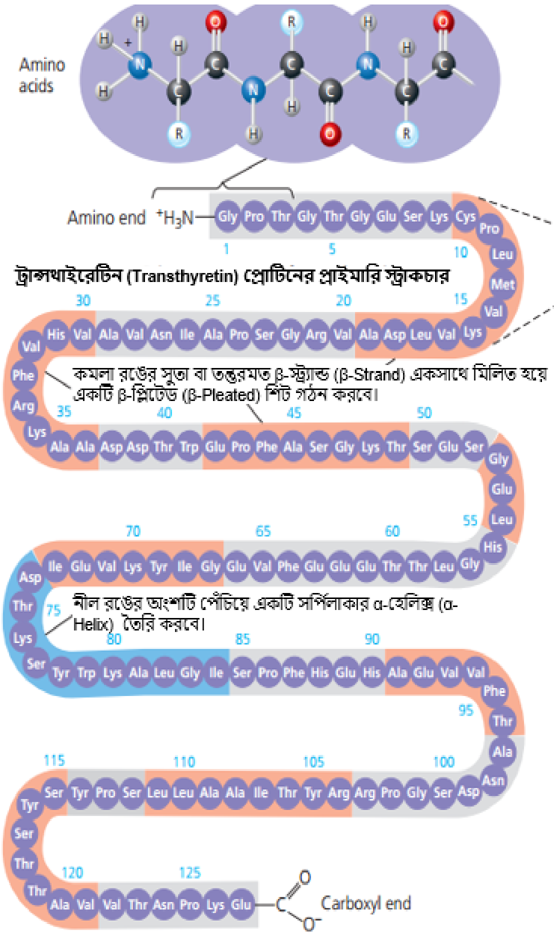

প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচার অনেকটা একটি বড় শব্দের অক্ষরগুলোর সাজানোর মতো। যদি এটি দৈবভাবে বা এলোমেলোভাবে তৈরি হতো, তাহলে ১২৭টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে অসংখ্য ভিন্ন ধরনের পলিপেপটাইড চেইন তৈরি হতে পারত। ১২৭টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে $২০^{১২৭}$ টি ভিন্ন ভিন্ন পলিপেপটাইড শৃঙ্খল তৈরি হওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রোটিনের সঠিক গঠন এলোমেলোভাবে হয় না। এটি জিনগত তথ্যের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই প্রাইমারি স্ট্রাকচার থেকেই পরে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার (যেমন α-হেলিক্স ও β-প্লিটেড শীট) এবং টারশিয়ারি স্ট্রাকচার তৈরি হয়। কারণ, পলিপেপটাইডের ব্যাকবোন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন (R group)-এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য প্রোটিনের ভাঁজ ও আকৃতি নির্ধারণ করে।

সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার (Secondary Structure)

পলিপেপটাইড ব্যাকবোনের পরমাণুগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে স্থিতিশীল অংশগুলো

ট্রান্সথাইরেটিনের একটি **α-হেলিক্স** অঞ্চলের অংশ।

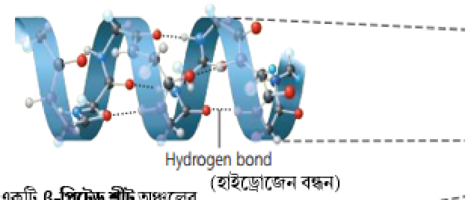

ট্রান্সথাইরেটিনের একটি **β-প্লিটেড শীট** অঞ্চলের অংশ, যা পাশাপাশি থাকা β-স্ট্র্যান্ড দিয়ে গঠিত।

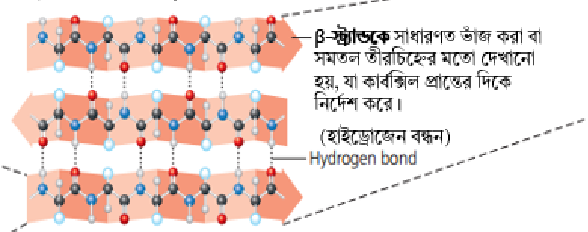

বেশিরভাগ প্রোটিনে পলিপেপটাইড চেইনের কিছু অংশ বারবার পেঁচানো বা ভাঁজ হওয়া অবস্থায় থাকে, যা প্রোটিনের সামগ্রিক আকৃতি গঠনে সাহায্য করে। এই পেঁচানো ও ভাঁজ হওয়া অংশগুলোকে একসাথে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার বলা হয়। এটি তৈরি হয় পলিপেপটাইড ব্যাকবোনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন ছাড়া অন্য অংশগুলোর মধ্যে অসংখ্য হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে। এক্ষেত্রে অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন বা R-গ্রুপের মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ধন বিবেচ্য নয়।

পলিপেপটাইড ব্যাকবোনে অক্সিজেন পরমাণুতে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ এবং নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক চার্জ থাকে (উপরের চিত্র লক্ষ করলে বোঝা যাবে)। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জের আকর্ষণের কারণে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হতে পারে। প্রতিটি হাইড্রোজেন বন্ধন আলাদাভাবে দুর্বল হলেও, দীর্ঘ অংশজুড়ে অনেকগুলো বন্ধন একসাথে থাকার কারণে প্রোটিনের একটি নির্দিষ্ট আকৃতি স্থিতিশীল হয়।

সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের একটি ধরন হলো **α-হেলিক্স (α- Helix)**। α-হেলিক্স হলো এমন একটি জ্যামিতিক আকৃতি যা দেখলে মনে হয় কোনো সিলিন্ডার, চোঙ বা কোণের চারপাশে সুষমভাবে পেঁচিয়ে তৈরি কোনো চোঙাকৃতি বা নলাকার আকৃতি (Cylindrical)। যেমন স্ক্রুর প্যাঁচ বা ডিএনএ অণুর গঠন। পলিপেপটাইডের α-হেলিক্স হলো একটি সূক্ষ্ম প্যাঁচানো **নলাকার (Cylindrical)** গঠন, যেখানে প্রতি চতুর্থ অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয়। ট্রান্সথাইরেটিন প্রোটিনের প্রতিটি পলিপেপটাইডে মাত্র একটি α-হেলিক্স অংশ থাকে, তবে অনেক গ্লোবুলার প্রোটিনে একাধিক α-হেলিক্স অঞ্চল দেখা যায়। আবার কিছু তন্তুযুক্ত (Fibrous) প্রোটিন, যেমন চুলের গঠনকারী α-ক্যারাটিন প্রোটিন, প্রায় পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে α-হেলিক্স আকারে থাকে।

সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের আরেকটি ধরন হলো **β-প্লিটেড শীট (β-Pleated Sheet)**। এটি অনেকটা পাতলা ও চ্যাপ্টা আবরণ, চাদরের মত। β-প্লিটেড শীটে পলিপেপটাইড চেইনের দুই বা ততোধিক অংশ পাশাপাশি অবস্থান করে এবং তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয়। β-প্লিটেড শীটের পলিপেপটাইড চেইনগুলোকে **β-স্ট্র্যান্ড (β-Strand)** বলা হয়। β-প্লিটেড শীট অনেক গ্লোবুলার প্রোটিনের মূল অংশ তৈরি করে এবং কিছু তন্তুযুক্ত প্রোটিনেও প্রধান গঠন হিসেবে থাকে, যেমন মাকড়সার জালের সিল্ক প্রোটিন। অসংখ্য হাইড্রোজেন বন্ধনের সম্মিলিত শক্তির কারণে মাকড়সার সিল্কের তন্তু ইস্পাতের তারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়।

মাকড়সা সিল্কের মতো তন্তু নিঃসরণ করে জাল তৈরি করে। এই তন্তুর প্রোটিনে β-প্লিটেড শীট থাকে, যা মাকড়সার জালকে টানলে প্রসারিত হতে এবং পরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করে।

টারশিয়ারি স্ট্রাকচার (Tertiary Structure)

সাইড চেইনগুলোর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে স্থিতিশীল হয়ে প্রোটিনকে ত্রিমাত্রিক আকৃতি দেয়।

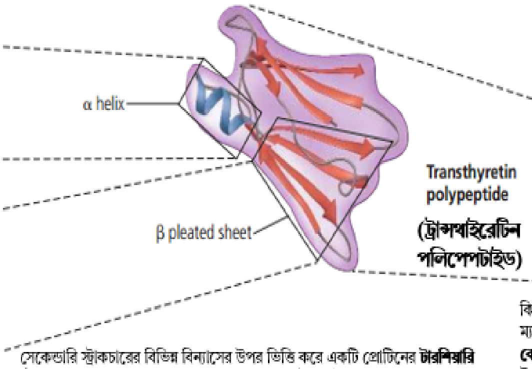

সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের বিভিন্ন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটি প্রোটিনের **টারশিয়ারি স্ট্রাকচার (Tertiary structure)** গঠিত হয়। এখানে ট্রান্সথাইরেটিন (Transthyretin) পলিপেপটাইডের একটি রিবন মডেল (Ribbon model) দেখানো হয়েছে। সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারে মূলত পলিপেপটাইড ব্যাকবোনের (Backbone) অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে, কিন্তু টারশিয়ারি স্ট্রাকচার হলো পুরো পলিপেপটাইডের সামগ্রিক ত্রিমাত্রিক আকৃতি, যা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন বা R গ্রুপগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়।

টারশিয়ারি স্ট্রাকচার গঠনে যে ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার একটি হলো জলবিমুখ মিথস্ক্রিয়া বা **হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন (Hydrophobic Interaction)** নামটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হলেও এর অর্থ হলো—যেসব অ্যামিনো অ্যাসিডের সাইড চেইন ননপোলার (Nonpolar) বা হাইড্রোফোবিক (জলবিমুখ), তারা সাধারণত পানির সংস্পর্শ এড়িয়ে প্রোটিনের ভেতরের অংশে একত্রিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পানি ননপোলার পদার্থকে দূরে ঠেলে দেয় বলেই এই "হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন" সৃষ্টি হয়। ননপোলার সাইড চেইনগুলো কাছাকাছি এলে **ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন (Van der Waals interactions)** তাদের একত্রে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

এছাড়া, পোলার (polar) সাইড চেইনের মধ্যে **হাইড্রোজেন বন্ড (Hydrogen bond)** এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত সাইড চেইনের মধ্যে **আয়নিক বন্ড (Ionic bond)** গঠিত হয়, যা টারশিয়ারি স্ট্রাকচারকে আরও স্থিতিশীল করে। কোষের জলীয় পরিবেশে এগুলো পৃথকভাবে দুর্বল আন্তঃক্রিয়া হলেও, সবগুলোর সম্মিলিত প্রভাব প্রোটিনকে একটি নির্দিষ্ট ও অনন্য আকৃতি প্রদান করে।

প্রোটিনের গঠনকে আরও শক্তিশালী করতে **ডাইসালফাইড ব্রিজ (Disulfide bridge)** নামক সমযোজী বন্ধন (Covalent bond) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ডাইসালফাইড ব্রিজ তৈরি হয় যখন দুটি সিস্টেইন (Cysteine) মনোমার, যাদের সাইড চেইনে সালফহাইড্রিল গ্রুপ (—SH) থাকে, প্রোটিন ভাঁজ হওয়ার ফলে কাছাকাছি চলে আসে। তখন একটি সিস্টেইনের সালফার অপর সিস্টেইনের সালফারের সাথে বন্ধন গঠন করে এবং একটি ডিসালফাইড ব্রিজ (—S—S—) তৈরি হয়। এই ব্রিজ প্রোটিনের বিভিন্ন অংশকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে রাখে।

এই সকল ধরনের আন্তঃক্রিয়া—হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন, ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন, হাইড্রোজেন বন্ড, আয়নিক বন্ড এবং ডিসালফাইড ব্রিজ—সম্মিলিতভাবে একটি প্রোটিনের টারশিয়ারি স্ট্রাকচার গঠনে ও স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা নিচে একটি কাল্পনিক প্রোটিনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

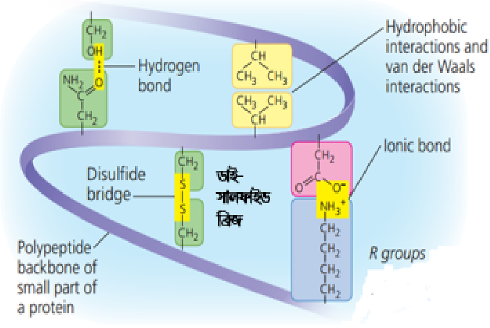

কোয়াটার্নারি স্ট্রাকচার (Quaternary Structure)

দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড একসাথে যুক্ত হয়। এই গঠন সব প্রোটিনে থাকে না।

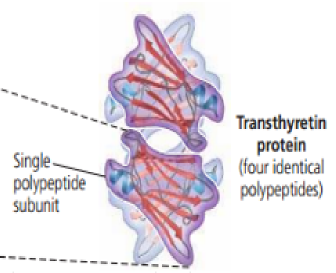

কিছু প্রোটিন দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড চেইন একত্রিত হয়ে একটি কার্যকরী বৃহৎ অণু বা ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule) তৈরি করে। এই ধরনের প্রোটিনের সামগ্রিক গঠনকে **কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার (Quaternary structure)** বলা হয়। অর্থাৎ, একাধিক পলিপেপটাইড উপ-একক বা সাবইউনিট (Subunit) একত্রিত হয়ে যে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন গঠন করে, সেটিই কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার। যখন কয়েকটি ছোট অংশ বা একক মিলে একটি বড় কাঠামো তৈরি করে, তখন প্রতিটি ছোট অংশকে বা একককে উপ-একক বা সাব-ইউনিট বলা হয়। ট্রান্সথাইরেটিন প্রোটিনের কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার রয়েছে কারণ এটি একটি গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein), যা চারটি পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো কোলাজেন (Collagen)। এটি একটি ফাইব্রাস প্রোটিন (Fibrous protein), যেখানে তিনটি অভিন্ন হেলিকাল পলিপেপটাইড (Helical polypeptide) পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে একটি বৃহৎ তিনগুণ বা ট্রিপল হেলিক্স (triple helix) তৈরি করে। কয়েকটি দড়ি বা রশি পেঁচালে যেমন আরও মজবুত বা শক্ত রশি তৈরি হয় তেমনি এই বিশেষ গঠন কোলাজেন ফাইবারকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। ফলে কোলাজেন ত্বক, অস্থি, টেন্ডন (Tendon), লিগামেন্ট Ligament) এবং অন্যান্য যোজক টিস্যু (Connective tissue)-এর প্রধান কাঠামোগত উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। মানুষের শরীরের মোট প্রোটিনের প্রায় ৪০% কোলাজেন দ্বারা গঠিত।

Collagen
(কোলাজেন)

হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) হলো কোয়াটারনারি স্ট্রাকচারযুক্ত আরেকটি গ্লোবিউলার প্রোটিন। এটি লোহিত রক্তকণিকার (Red blood cell) অক্সিজেন-বহনকারী প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন চারটি পলিপেপটাইড সাবইউনিট নিয়ে গঠিত—এর মধ্যে দুটি এক ধরনের (α বা alpha) এবং অন্য দুটি আরেক ধরনের (β বা beta)। α এবং β উভয় সাবইউনিটই প্রধানত আলফা-হেলিক্যাল সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার (α-helical secondary structure) দ্বারা গঠিত। প্রতিটি সাবইউনিটে হিম (heme) নামক একটি ননপলিপেপটাইড উপাদান (nonpolypeptide component) থাকে। এই হিম গ্রুপে একটি লৌহ (iron) পরমাণু উপস্থিত থাকে, যা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে। এর ফলে হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পরিবহন করতে সক্ষম হয়।

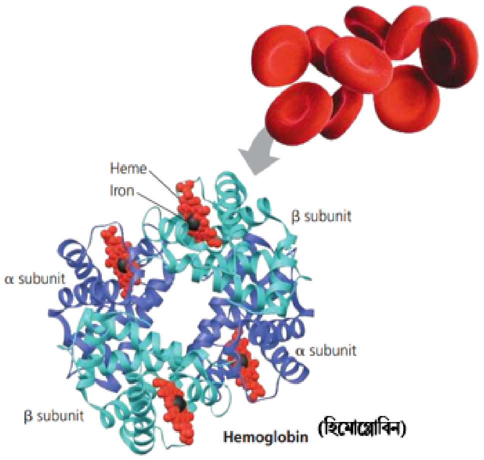

মোটিফ (Motif)।

জীববিজ্ঞানীরা যখন প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন (Three-dimensional structure) আবিষ্কার করতে শুরু করেন, যা প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম (Sequence) নির্ধারণ করার চেয়েও বেশি কঠিন কাজ, তখন তারা লক্ষ্য করেন যে অনেক ভিন্ন ধরনের প্রোটিনের মধ্যেও কিছু গঠনগত মিল রয়েছে। এই ধরনের পুনরাবৃত্ত গঠনকে **মোটিফ (Motif)** বা কখনও কখনও **"সুপারসেকেন্ডারি স্ট্রাকচার (Supersecondary structure)"** বলা হয়। "মোটিফ" শব্দটি শিল্পকলা (Arts) থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে এটি সংগীত বা নকশায় বারবার ব্যবহৃত কোনো বিশেষ থিম বা নকশাকে বোঝায়।

প্রোটিনে খুব সাধারণ একটি মোটিফ হলো **β-α-β motif**। এটি প্রোটিনে একটি ভাঁজ বা খাঁজ (Fold or crease) তৈরি করে, যাকে রসম্যান ফোল্ড (**Rossmann fold)** বলা হয়। এই গঠনটি বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের নিউক্লিওটাইড-বাইন্ডিং সাইট (Nucleotide-binding site), অর্থাৎ প্রোটিনের যেসমস্ত অংশ DNA-এর নিউক্লিওটাইডগুলোর সাথে বাঁধে সেই সমস্ত অংশের কেন্দ্রে দেখা যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হলো **β-Barrel**। এতে একটি **β-Sheet** ভাঁজ হয়ে একটি নলাকার (Tube-like) গঠন তৈরি করে।

তৃতীয় ধরনের মোটিফ হলো **Helix-turn-helix motif**। এটি দুটি **α-Helix** দ্বারা গঠিত, যাদের মাঝে একটি বাঁক (Bend বা turn) থাকে। এই মোটিফটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক প্রোটিন DNA-এর দ্বৈত সর্পিল গঠন (DNA double helix)-এর সাথে যুক্ত হতে এটি ব্যবহার করে।

মোটিফগুলো প্রোটিনের গঠনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট যুক্তি বা সংগঠন নির্দেশ করে, যদিও বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারেননি কেন এগুলো এত বেশি দেখা যায়। একটু চিন্তা করলে বলা যায়, যদি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো প্রোটিনের ভাষার অক্ষর (Letters) হয়, তবে মোটিফগুলো সেই ভাষার বারবার ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশের মতো। এগুলো কি শুধুই বিবর্তনের (Evolution) মাধ্যমে সফল গঠনগুলোর পুনঃব্যবহার, নাকি এগুলো কোনো সমস্যার, যেমন নিউক্লিওটাইডের সাথে বন্ধন তৈরি করা, সবচেয়ে কার্যকর সমাধান?

অজানা (Unknown) প্রোটিনের কাজ নির্ধারণ করতেও মোটিফ অত্যন্ত উপকারী। কোনো অজানা প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সকে পরিচিত কার্যকর মোটিফগুলোর তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেসের (Database) সাথে তুলনা করা যায়। যদি সেই প্রোটিনে কোনো পরিচিত মোটিফ পাওয়া যায়, তবে তা ঐ প্রোটিনের সম্ভাব্য কাজ বা কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিতে পারে।

ডোমেইন (Domain)।

প্রোটিনের **ডোমেইন (Domain)** হলো একটি বড় প্রোটিন গঠনের ভেতরে থাকা **স্বতন্ত্র কার্যকরী অংশ (Functional unit)**। এগুলোকে প্রোটিনের **টারশিয়ারি স্ট্রাকচার (Tertiary structure)**-এর ভেতরের উপগঠন (Substructure) হিসেবে ভাবা যায়। আগের উপমাটি (Metaphor) অনুসারে বলা যায়, অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acids) হলো প্রোটিনের ভাষার অক্ষর, মোটিফ (Motifs) হলো শব্দ বা বাক্যাংশ, আর ডোমেইন (Domain) হলো অনুচ্ছেদ বা paragraph-এর মতো।

বেশিরভাগ প্রোটিন একাধিক ডোমেইন নিয়ে গঠিত, এবং প্রতিটি ডোমেইন প্রোটিনের ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ডোমেইনগুলো তাদের আকৃতি অনুসারেও (Physically) আলাদা করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, **ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর (Transcription factors)** হলো এমন প্রোটিন, যা DNA-এর সাথে যুক্ত হয়ে তার ট্রান্সক্রিপশন (Transcription) শুরু করে। যদি কোনো ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের DNA যুক্ত হওয়ার অংশ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের অন্য একটি অংশের সাথে বদলে দেওয়া হয়, তাহলে DNA-এর প্রতি তার যুক্ত

চিত্র ৬.৪.৯: মোটিফ (Motif) এবং ডোমেইন (Domain)। সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের (Secondary structure) বিভিন্ন উপাদান একত্রিত হয়ে, ভাঁজ (Fold) বা বাঁক (Crease) তৈরি করে **মোটিফ (Motif)** গঠন করতে পারে। এই মোটিফগুলো বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনে দেখা যায় এবং এগুলোর মাধ্যমে প্রোটিনের সম্ভাব্য কাজ বা কার্যকারিতা (Function) সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রোটিন আরও বড় বড় অংশ বা **ডোমেইন (Domain)** দিয়েও গঠিত হয়। ডোমেইন হলো প্রোটিনের কার্যকরীভাবে স্বতন্ত্র (Functionally distinct) অংশ, যেখানে প্রতিটি ডোমেইন নির্দিষ্ট একটি কাজ সম্পাদন করে। প্রোটিনের মধ্যে এই ডোমেইনগুলোর ত্রিমাত্রিক বিন্যাস (Three-dimensional arrangement) বা স্থানিক সংগঠনই প্রোটিনের **টারশিয়ারি স্ট্রাকচার (Tertiary structure)** তৈরি করে।

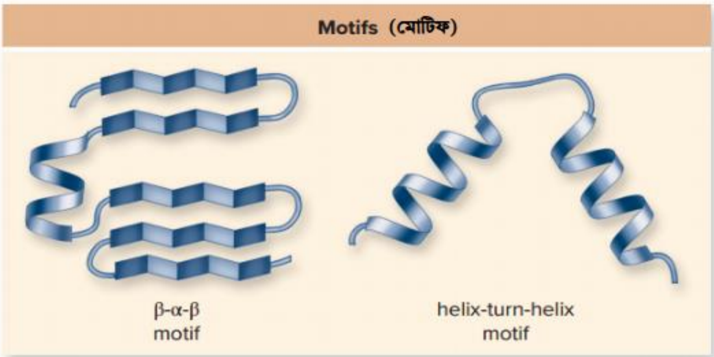

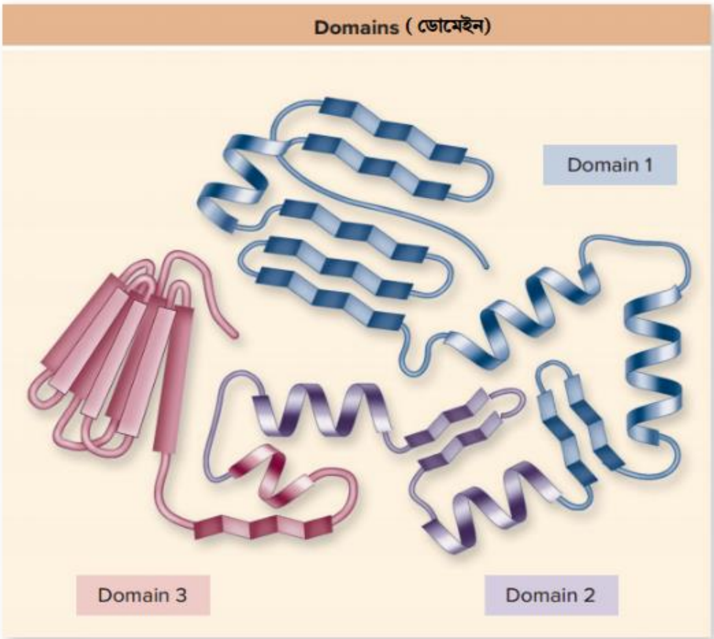

হওয়ার নির্দিষ্টতা (Specificity), অর্থাৎ প্রোটিনটি DNA-এর নির্দিষ্ট যে অংশের সাথে যুক্ত হত তা পরিবর্তিত হতে পারে। এই ধরনের পরীক্ষাকে **Domain-swapping experiment** বা ডোমেইন বদলানোর পরীক্ষা বলা হয়।

একটি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর সাধারণত দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমটি, DNA Binding Domain (DBD) বা DNA বাঁধার বা যুক্ত হওয়ার ডোমেইন; এটি DNA-এর সুনির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়। দ্বিতীয়টি, Activation Domain (AD) বা সক্রিয়কারী ডোমেইন; এটি এনজাইম বা অন্যান্য প্রোটিনকে (Co-activators/Mediators) ডেকে এনে জিন চালুর প্রক্রিয়া শুরু করে। সহজ কথায়, এটি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের সেই "সুইচ (Switch)" বা "অ্যাক্টিভেটর (Activator)" অংশ, যা জিনের ট্রান্সক্রিপশন বা প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের উপর ডোমেইন বদলানোর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে প্রোটিনে DNA বাঁধার বা যুক্ত হওয়ার ডোমেইন এবং সক্রিয়কারী ডোমেইন (Activation domain) কার্যকরীভাবে (Functionally) পৃথক।

প্রোটিনের এই কার্যকরী ডোমেইনগুলো প্রোটিনকে সঠিকভাবে ভাঁজ (Fold) হতেও সাহায্য করে। যখন একটি Polypeptide-এর শিকল (Chain) ভাঁজ হয়, তখন প্রতিটি ডোমেইন প্রায় স্বাধীনভাবে (Independently) নিজস্ব সঠিক গঠন গ্রহণ করে। এটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। যদি কোনো Polypeptide-এর সেই অংশটুকু আলাদা করে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা

হয়, যা একটি নির্দিষ্ট ডোমেইন গঠন করে, তাহলে দেখা যায় যে সেই অংশটিও সম্পূর্ণ প্রোটিনে যেভাবে ভাঁজ হয়, ঠিক একই ধরনের গঠন তৈরি করে।

একটি প্রোটিনের বিভিন্ন ডোমেইন-কে একটি Polypeptide-এর শিকল (Chain) একসাথে যুক্ত করে রাখে। এটি অনেকটা এমন, যেন একটি দড়িতে (Rope) পাশাপাশি কয়েকটি গিঁট (Knots) বাঁধা আছে।

প্রোটিনের ডোমেইনগুলো অনেক সময় সেই জিনগুলোর (Genes) গঠনের সাথেও সম্পর্কিত, যেগুলো এই ডোমেইনগুলো তৈরি করে। ইউক্যারিওট (Eukaryote)-এ জিনগুলো প্রায়ই জিনোমে (Genome) খণ্ড খণ্ড অবস্থায় থাকে। এই অংশগুলোকে **এক্সন (Exons)** বলা হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলো প্রোটিনের কার্যকরী ডোমেইনগুলোর জন্য সংকেত বা কোড (Code) বহন করে।

সিকেল-সেল রোগ (Sickle-Cell Disease): প্রাইমারি স্ট্রাকচারের পরিবর্তন।

প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচারে (Primary Structure), অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের সাজানো ক্রমে, সামান্য পরিবর্তন হলেও প্রোটিনের আকার (Shape) ও কাজ (Function) বদলে যেতে পারে। সিকেল-সেল রোগ (Sickle-Cell Disease) এর একটি ভালো উদাহরণ।

এটি একটি বংশগত রক্তের রোগ (Inherited Blood Disorder)। এই রোগে হিমোগ্লোবিনের (Hemoglobin) ষষ্ঠ অ্যামিনো অ্যাসিডে স্বাভাবিক গ্লুটামিক অ্যাসিডের (Glutamic Acid) বদলে ভ্যালিন (Valine) বসে যায়। হিমোগ্লোবিন হলো সেই প্রোটিন যা লোহিত রক্তকণিকায় (Red Blood Cells) অক্সিজেন বহন করে।

স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকা চাকতির মতো গোল (Disk-shaped) হয়। কিন্তু সিকেল-সেল রোগে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন অণুগুলো একসঙ্গে লেগে লম্বা শিকল বা চেইন (Chain) তৈরি করে। এতে কিছু রক্তকণিকা কাস্তের মতো বাঁকা (Sickle-shaped) হয়ে যায় (**চিত্র ৬.৪.১০**)। এই বাঁকা রক্তকণিকাগুলো মাঝে মাঝে ছোট রক্তনালিতে আটকে যায় এবং রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত করে, যাকে "সিকেল-সেল সঙ্কট বা ক্রাইসিস" (Sickle-cell Crises) বলা হয়।

এই রোগটি প্রমাণ করে যে প্রোটিনের গঠনে খুব ছোট একটি পরিবর্তনও প্রোটিনের কাজের ওপর বড় ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রোটিনের গঠন কিভাবে নির্ধারিত হয়?

প্রতিটি প্রোটিনের একটি নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আকার থাকে, আর এই বিশেষ আকারই প্রোটিনকে নির্দিষ্ট কাজ করতে সাহায্য করে। একটি পলিপেপটাইড চেইনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম তার ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ধারণ করে।

সাধারণত প্রোটিন ভাঁজ হওয়ার (Protein Folding) কাজটি কোষের ভেতরে প্রোটিন তৈরি হওয়ার সময় ঘটে এবং এতে অন্য কিছু প্রোটিন সাহায্য করে। তবে প্রোটিনের গঠন তার চারপাশের পরিবেশের ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার ওপরও নির্ভর করে।

যদি pH, লবণের ঘনত্ব (Salt Concentration), তাপমাত্রা (Temperature) বা পরিবেশের অন্য কোনো অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তাহলে প্রোটিনের ভেতরের দুর্বল রাসায়নিক বন্ধন (Weak Chemical Bonds) ও পারস্পরিক ক্রিয়া (Interactions) ভেঙে যেতে পারে। এর ফলে প্রোটিন তার স্বাভাবিক আকার (Native Shape) হারিয়ে ফেলে এবং খুলে যায়। এই পরিবর্তনকে ডিন্যাচারেশন (Denaturation) এবং অস্বাভাবিক আকৃতির প্রোটিনকে তখন ডিন্যাচারড (Denatured) প্রোটিন বলা হয়। যেহেতু ডিন্যাচারড (Denatured) প্রোটিনের আকার বিকৃত হয়ে যায়,

তাই এটি আর জৈবিকভাবে সক্রিয় (Biologically Active) থাকে না, অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট কাজটি আর করতে পারে না।

চিত্র ৬.৪.১০: হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) প্রোটিনে মাত্র একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হলে কীভাবে সিকল-সেল রোগ সৃষ্টি হয়।

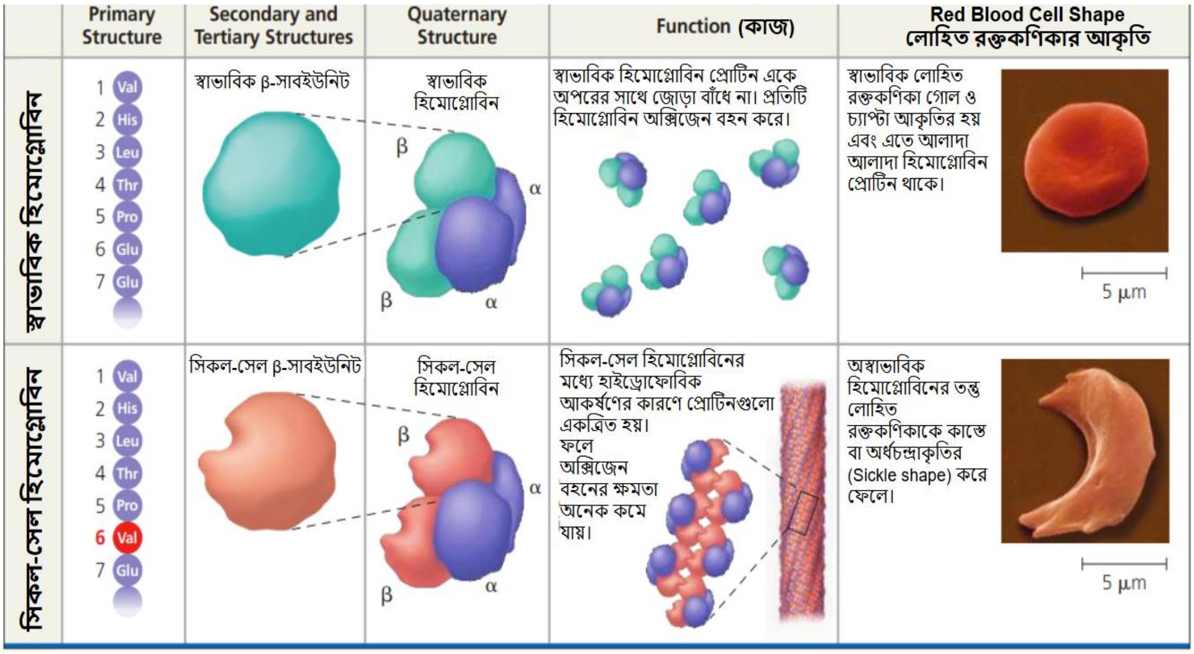

বেশিরভাগ প্রোটিনকে জলীয় পরিবেশ (Aqueous Environment) থেকে ইথার (Ether) বা ক্লোরোফর্মের (Chloroform) মতো ননপোলার দ্রাবকে (Nonpolar Solvent) নিলে তার স্বাভাবিক আকার হারিয়ে ফেলে বা ডিন্যাচারড হয়ে যায়। কারণ তখন পলিপেপটাইড চেইনগুলোর ভাঁজ এমনভাবে নষ্ট হয় যাতে এর হাইড্রোফোবিক অংশগুলো (Hydrophobic Regions) বাইরের দিকে থাকে।

এছাড়াও কিছু রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bonds), আয়নিক বন্ধন (Ionic Bonds) এবং ডাইসালফাইড ব্রিজ (Disulfide Bridges) ভেঙে দিয়ে প্রোটিনকে ডিন্যাচারড করতে পারে। অতিরিক্ত তাপ (Excessive Heat) প্রোটিনের গঠন নষ্ট করতে পারে, কারণ এতে পলিপেপটাইড চেইন বেশি নড়াচড়া করে এবং দুর্বল বন্ধনগুলো ভেঙে যায়।

ডিম রান্না করলে ডিমের সাদা অংশ (Egg White) সাদা ও শক্ত হয়ে যায়, কারণ এর প্রোটিনগুলো ডিন্যাচারড হয়ে অদ্রবণীয় (Insoluble) হয়ে যায়। একই কারণে অতিরিক্ত জ্বর (High Fever) বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ খুব বেশি তাপমাত্রায় রক্তের প্রোটিনও ডিন্যাচারড হতে পারে।

কখনও কখনও পরীক্ষাগারে তাপ বা রাসায়নিকের কারণে ডিন্যাচারড হওয়া প্রোটিন, ডিন্যাচারিং এজেন্ট বা কার্যকারক (Denaturing Agent) সরিয়ে ফেললে, অর্থাৎ যে তাপ বা রাসায়নিকের কারণে ডিন্যাচারড হয়েছিল তা সরিয়ে নিলে, প্রোটিনটি আবার তার কার্যকর আকারে (Functional Shape) ফিরে আসতে পারে (**চিত্র ৬.৪.১১**)। তবে সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়; যেমন ভাজা ডিম (Fried Egg) আবার তরল অবস্থায় ফিরে আসে না।

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রোটিনের নির্দিষ্ট আকার তৈরির তথ্য তার প্রাইমারি স্ট্রাকচারে (Primary Structure) বা অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমে লুকিয়ে থাকে। এই ক্রমই নির্ধারণ করে কোথায় আলফা হেলিক্স (α Helix) গঠিত হবে, কোথায় বেটা প্লিটেড শীট (β Pleated Sheet) থাকবে, কোথায় ডাইসালফাইড ব্রিজ তৈরি হবে এবং কোথায় আয়নিক বন্ধন গঠিত হবে।

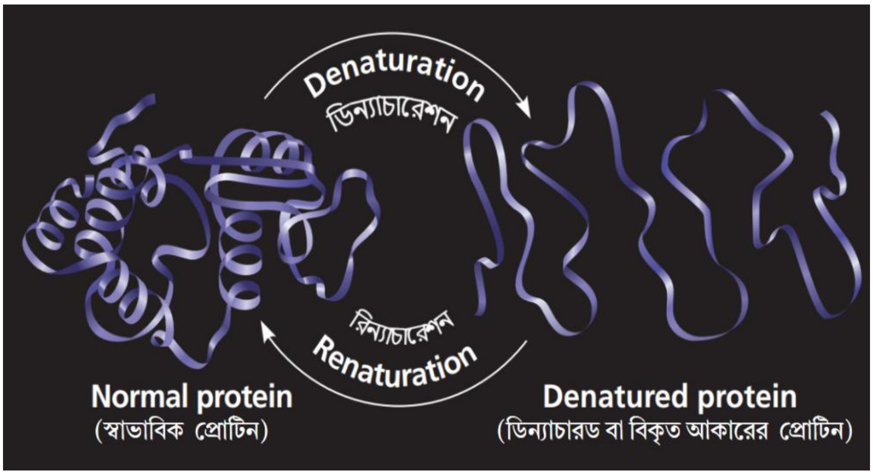

চিত্র ৬.৪.১১: একটি প্রোটিনের ডিন্যাচারেশন (Denaturation) ও রিন্যাচারেশন (Renaturation)। উচ্চ তাপমাত্রা বা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে একটি প্রোটিন ডিন্যাচারড (Denatured) হতে পারে। এতে প্রোটিন তার স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিক গঠন ও আকৃতি হারায় এবং ফলস্বরূপ তার স্বাভাবিক জৈবিক কাজ করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। তবে ডিন্যাচারড প্রোটিনটি যদি দ্রবণে (Solution) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাহলে পরিবেশের রাসায়নিক ও ভৌত অবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক করা হলে এটি আবার তার পূর্বের স্বাভাবিক গঠন ফিরে পেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে রিন্যাচারেশন (Renaturation) বলা হয়। অর্থাৎ, অতিরিক্ত তাপ বা রাসায়নিক পদার্থের কারণে প্রোটিনের আকৃতি নষ্ট হয়ে গেলে সেটি কাজ করতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে প্রোটিন আবার তার আগের আকৃতি ফিরে পায় এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

কোষে প্রোটিন ভাঁজ হওয়া বা ফোল্ডিং (Protein Folding in the Cell)।

বর্তমানে জীববিজ্ঞানীরা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড ক্রম বা সিকোয়েন্স সম্পর্কে জানেন, এবং প্রতি মাসে আরও প্রায় ৪.৫–৫ মিলিয়ন নতুন সিকোয়েন্স যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক (3D) গঠন নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষকেরা বহু প্রোটিনের প্রাইমারি স্ট্রাকচার ও তাদের ত্রিমাত্রিক গঠনের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন, যাতে প্রোটিন কিভাবে ভাঁজ হয়ে ত্রিমাত্রিক আকার ধারণ করে তার নিয়ম বোঝা যায়।

কিন্তু প্রোটিন ভাঁজ বা ফোল্ডিং প্রক্রিয়া এত সহজ নয়। অধিকাংশ প্রোটিন স্থিতিশীল চূড়ান্ত গঠন পাওয়ার আগে কয়েকটি মধ্যবর্তী (Intermediate) ধাপ অতিক্রম করে। শুধু প্রোটিনের পরিণত (Mature) গঠন দেখলে বোঝা যায় না যে কোন কোন ধাপে ভাঁজ বা ফোল্ডিং হয়ে সেই গঠন তৈরি হয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা এখন এমন পদ্ধতি তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে একটি প্রোটিনকে ফোল্ডিংয়ের বিভিন্ন ধাপে অনুসরণ করা যায় এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানা যায়।

কোষে পলিপেপটাইডের ভুলভাবে ভাঁজ বা ফোল্ড হওয়া (Misfolding) একটি গুরুতর সমস্যা, যা বর্তমানে চিকিৎসা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক রোগ—যেমন সিস্টিক ফাইব্রোসিস (Cystic fibrosis), আলঝাইমারস (Alzheimer's), পারকিনসন্স (Parkinson's) এবং ম্যাড কাউ (Mad cow) রোগ—ভুলভাবে ভাঁজ হওয়া প্রোটিনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমনকি ট্রান্সথাইরেটিন প্রোটিনের ভুলভাবে ভাঁজ হওয়া রূপও কিছু রোগের সঙ্গে জড়িত, যার মধ্যে এক ধরনের বার্ধক্যজনিত ডিমেনশিয়া (Dementia) বা ভুলে যাওয়া রোগও রয়েছে।

সঠিকভাবে ভাঁজ হওয়া যেকোনো প্রোটিনের নির্ভুল ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ধারণ করা সহজ নয়, কারণ একটি প্রোটিনে হাজার হাজার পরমাণু থাকে। প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক (3D) গঠন নির্ধারণের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি (X-ray Crystallography) **(চিত্র ৬.৪.১২)**। এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো অণুর (যেমন: প্রোটিন, ডিএনএ, বা রাসায়নিক যৌগ) ভেতরের পরমাণুগুলো ঠিক কীভাবে সাজানো থাকে, তা ত্রিমাত্রিক (3D) আকারে বের করা যায়। সাধারণ মাইক্রোস্কোপ

দিয়ে পরমাণু দেখা যায় না, তাই এই বিশেষ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে যে অণু বা প্রোটিনের গঠন জানা প্রয়োজন, সেটিকে তরল দ্রবণ থেকে শক্ত ক্রিস্টাল বা স্ফটিকে রূপান্তর করা হয় (Crystallization)। এরপর এই ক্রিস্টালের ওপর শক্তিশালী এক্স-রে বিম (X-ray beam) ফেলা হয়। এক্স-রে বিম (X-ray beam) হলো অদৃশ্য উচ্চ-শক্তির তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ (Electromagnetic radiation) যা খালি চোখে দেখা যায় না। স্ফটিকাকারে (Crystallized) থাকা অণুর পরমাণুগুলো খুব নিখুঁতভাবে সাজানো থাকে। যখন এক্স-রে ক্রিস্টালটির মধ্য দিয়ে যায়, তখন পরমাণুগুলো এই রশ্মিকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয় বা বিচ্ছুরণ ঘটায় (Diffraction)। ছড়িয়ে পড়া এক্স-রে গুলো একটি পর্দায় বা সেন্সরে (Sensor) গিয়ে আঘাত হানে এবং উজ্জ্বল ও অন্ধকার বিন্দু বা ডটের (Dot) একটি নকশা তৈরি করে, যাকে ডিফ্রেকশন প্যাটার্ন (Diffraction Pattern) বলে। সবশেষে, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও গাণিতিক হিসেব-নিকেশ ব্যবহার করে এই নকশাটি বিশ্লেষণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা একটি "ইলেকট্রন ডেনসিটি ম্যাপ" পান, যেখানে পরমাণুগুলো বসিয়ে এমন একটি ত্রিমাত্রিক (3D) মডেল তৈরি করতে পারেন যেখানে প্রোটিনের প্রতিটি পরমাণুর সঠিক অবস্থান দেখা যায়।

চিত্র ৬.৪.১২: প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডের ত্রিমাত্রিক আকৃতি ও গঠন আবিষ্কারের একটি পদ্ধতি হচ্ছে এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি (X-ray Crystallography)।

X-Ray Crystallography (এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি)

প্রয়োগ (Application): বিজ্ঞানীরা নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) এবং প্রোটিনের মতো বৃহৎ জৈব অণুর (Macromolecule) ত্রিমাত্রিক (3D) গঠন নির্ধারণ করতে এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

পদ্ধতি (Technique): প্রথমে প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডকে স্ফটিক (Crystal) আকারে প্রস্তুত করা হয়। এরপর সেই স্ফটিকের মধ্য দিয়ে একটি এক্স-রে রশ্মি (X-ray beam) প্রেরণ করা হয়। স্ফটিকের পরমাণুগুলো এক্স-রে রশ্মিকে বিচ্ছুরিত (Diffract) বা বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে নির্দিষ্ট বিন্যাসে কিছু আলোকবিন্দুর (Spots) একটি নকশা তৈরি হয়, যাকে এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন (X-ray diffraction pattern) বলা হয়। একটি ডিজিটাল ডিটেক্টর বা শনাক্তকারী যন্ত্র এই প্যাটার্ন বা নকশা রেকর্ড করে।

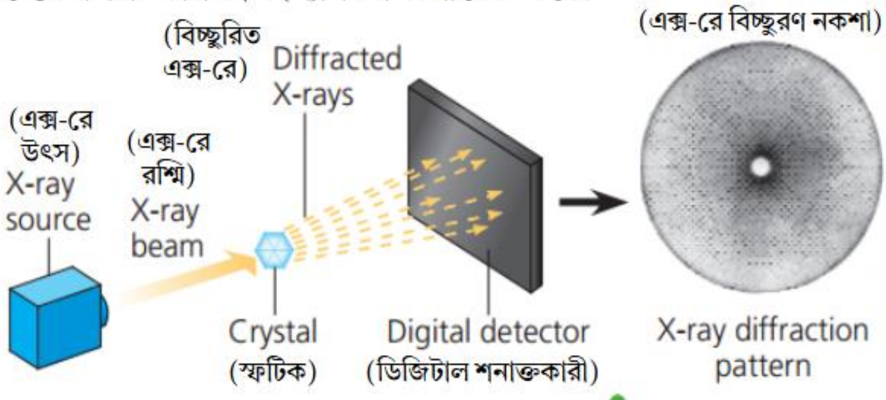

ফলাফল (Results): এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত মনোমারগুলোর (যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড বা নিউক্লিওটাইড) ক্রম ব্যবহার করে গবেষকেরা প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার মডেল তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র ৬.৪.৮-এ প্রদর্শিত চার-উপএককবিশিষ্ট (Four-subunit) প্রোটিন ট্রান্সথাইরেটিন (Transthyretin)-এর ত্রিমাত্রিক গঠন এভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

এছাড়াও নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্পেকট্রোস্কোপি (Nuclear Magnetic Resonance/NMR spectroscopy), ক্রায়ো-ইএম মাইক্রোস্কোপি (Cryo-electron microscopy, cryo-EM), এবং বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) প্রোটিনের গঠন ও কাজ বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি। বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) হলো জীববিজ্ঞানের একটি আন্তঃবিষয়ক শাখা, যেখানে কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান এবং গণিত ব্যবহার করে বিশাল পরিমাণ জৈবিক ডেটা (যেমন- ডিএনএ, জিনোম, এবং প্রোটিন) বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা হয়। সহজ কথায়, এটি জীববিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলো বোঝার জন্য কম্পিউটারের সাহায্যে ডেটা প্রসেস করার একটি আধুনিক বিজ্ঞান।

অনেক প্রোটিন আছে যাদের গঠন নির্ধারণ করা খুবই কঠিন, কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে এসব প্রোটিন বা প্রোটিনের কিছু অংশের নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠন থাকে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রোটিন বা অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ধরনের প্রোটিনের নমনীয়তা ও অনির্দিষ্ট গঠনই তাদের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিভিন্ন সময়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। এই ধরনের প্রোটিনকে স্বভাবগতভাবেই বিশৃঙ্খল অথবা গঠনহীন প্রোটিন (Intrinsically Disordered Protein/IDP, ইন্ট্রিনজিক্যালি ডিজঅর্ডার্ড বা আইডিপি প্রোটিন) বলা হয়। আইডিপি প্রোটিন (Intrinsically Disordered Protein/IDP) হল এমন এক ধরণের অন্তর্নিহিতভাবে অগঠিত প্রোটিন যাদের কোনো নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ত্রিমাত্রিক বা থ্রি-ডাইমেনশনাল (3D) গঠন বা আকৃতি থাকে না। সাধারণত, প্রোটিন কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে (Folded shape) নিজেদের গুটিয়ে নেয়। কিন্তু আইডিপি-গুলোর অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস এমন হয় যে, তারা সর্বদা একটি নমনীয়, বিশৃঙ্খল এবং পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে। এর ফলে তারা বিভিন্ন অণুর সাথে খুব সহজেই মিশে বা যুক্ত হয়ে নানা রকম আকৃতি ধারণ করতে পারে। আলফা-সিনুকলিন (Alpha-synuclein) প্রোটিনটি মানুষের মস্তিষ্কের কোষে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি একটি অন্তর্নিহিতভাবে অগঠিত বা ইন্ট্রিনজিক্যালি ডিজঅর্ডার্ড প্রোটিন এবং মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে যোগাযোগের কাজে সাহায্য করে। কিন্তু কোনো কারণে এই প্রোটিনটি যদি ভুলভাবে জমাট বাঁধতে শুরু করে, তবে তা স্নায়ুরোগ যেমন পারকিনসন্স ডিজিজ (Parkinson's disease)-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধারণা করা হয় যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রায় ২০-৩০% প্রোটিন এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, এবং বর্তমানে এগুলো নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

৬.৫ নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acids) বংশগত তথ্যের সংরক্ষণ, স্থানান্তর ও প্রকাশ করে।

প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন যদি তার অ্যামিনো অ্যাসিড ক্রম বা প্রাথমিক গঠন (Primary Structure) দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে প্রশ্ন হলো—এই প্রাথমিক গঠনকে কী নির্ধারণ করে?

এর উত্তর হলো **জিন (Gene)**। জিন হলো বংশগতির (Heredity) একটি মৌলিক একক, যা একটি পলিপেপটাইড (Polypeptide)-এর অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বহন করে।

জিন গঠিত হয় **ডিএনএ (DNA; Deoxyribonucleic Acid)** দ্বারা। ডিএনএ হলো **নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)** নামক এক শ্রেণির জৈব অণুর অন্তর্ভুক্ত। নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রধান কাজ হলো বংশগত তথ্য সংরক্ষণ (Storage), এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তর (Transmission) এবং সেই তথ্যের প্রকাশ (Expression) নিশ্চিত করা।

নিউক্লিক অ্যাসিড হলো এক ধরনের **পলিমার (Polymer)**, যা অসংখ্য ছোট একক **নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)** দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ, নিউক্লিওটাইড

হলো নিউক্লিক অ্যাসিডের মৌলিক গঠন একক বা মনোমার (Monomer)।

সংক্ষেপে:
জিন (Gene) → ডিএনএ (DNA) → নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid) → নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)

এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের তথ্য সংরক্ষিত, স্থানান্তরিত এবং প্রকাশিত হয়।

নিউক্লিক অ্যাসিডের (Nucleic Acid) ভূমিকা

নিউক্লিক অ্যাসিডের (Nucleic Acid) দুটি প্রধান ধরন হলো **ডিএনএ (DNA; Deoxyribonucleic Acid)** এবং **আরএনএ (RNA; Ribonucleic Acid)**। এই দুটি অণু জীবদেহকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে তার জটিল গঠন ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।

সবগুলো অণুর মধ্যে ডিএনএ (DNA) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নিজের প্রতিলিপি (Replication) তৈরির নির্দেশনা নিজেই বহন করে। এছাড়া ডিএনএ, আরএনএ (RNA) তৈরির নির্দেশ দেয় এবং আরএনএর মাধ্যমে প্রোটিন (Protein) সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ডিএনএ থেকে আরএনএ এবং আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে **জিনের প্রকাশ** (Gene Expression) বলা হয় **(চিত্র ৬.৫.১)**।

ডিএনএ হলো জীবের **বংশগত উপাদান** (Genetic **Material)**, যা সন্তান তার পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। অর্থাৎ, ডিএনএ হলো বংশগত তথ্যের ধারক। প্রতিটি **ক্রোমোজোম (Chromosome)** একটি দীর্ঘ ডিএনএ অণু দ্বারা গঠিত এবং এতে সাধারণত শত শত বা তারও বেশি **জিন (Gene)** থাকে।

যখন একটি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন কোষ তৈরি করে, তখন তার ডিএনএ অণুগুলো অনুলিপি (Copy) হয়ে নতুন কোষে স্থানান্তরিত হয়। ফলে বংশগত তথ্য এক প্রজন্মের কোষ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কোষে পৌঁছে যায়।

কোষের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ডিএনএর গঠনের মধ্যে সংকেত (Code) আকারে সংরক্ষিত থাকে। তবে ডিএনএ নিজে সরাসরি কোষের কাজ সম্পাদন করে না। যেমন, একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার নিজে বারকোড পড়তে পারে না; বারকোড পড়ার জন্য স্ক্যানার দরকার হয়। একইভাবে, জিনগত তথ্য বাস্তবায়নের জন্য **প্রোটিন (Protein)** প্রয়োজন।

প্রোটিন হলো কোষের কার্যকর যন্ত্রপাতি। কোষের জৈবিক কাজ সম্পাদনের জন্য যে আণবিক যন্ত্রপাতি (Molecular Hardware) ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। উদাহরণস্বরূপ, লোহিত রক্তকণিকায় (Red Blood Cell) অক্সিজেন বহনকারী অণু হলো **হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin)**, যা একটি প্রোটিন। ডিএনএ হিমোগ্লোবিনের গঠন নির্ধারণ করে, কিন্তু অক্সিজেন পরিবহন করে হিমোগ্লোবিন নিজেই।

জিনের প্রকাশ (Gene Expression) প্রক্রিয়ায় আরএনএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিএনএর একটি নির্দিষ্ট জিন **মেসেঞ্জার আরএনএ (Messenger RNA বা mRNA)** নামক এক ধরনের আরএনএ তৈরির নির্দেশ দেয়। এই mRNA কোষের প্রোটিন-সংশ্লেষণ যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে একটি **পলিপেপটাইড (Polypeptide)** তৈরি করে। পরে এই পলিপেপটাইড ভাঁজ (Fold) হয়ে কার্যকর প্রোটিনে পরিণত হয়।

তাই জিনগত তথ্য প্রবাহকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায়—

DNA (ডিএনএ) → RNA (আরএনএ) → Protein (প্রোটিন)

এই ধারাকে জীববিজ্ঞানের **কেন্দ্রীয় মতবাদ (Central Dogma)** বলা হয়।

প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান হলো **রাইবোসোম (Ribosome)**। ইউক্যারিওটিক কোষে (Eukaryotic Cell) ডিএনএ থাকে **নিউক্লিয়াসে (Nucleus)**, কিন্তু রাইবোসোম থাকে **সাইটোপ্লাজমে (Cytoplasm)**। তাই mRNA নিউক্লিয়াস থেকে জিনগত নির্দেশনা বহন করে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে যায়, যেখানে রাইবোসোম সেই নির্দেশনা অনুসারে প্রোটিন তৈরি করে। অন্যদিকে, **প্রোক্যারিওটিক কোষে (Prokaryotic Cell)** নিউক্লিয়াস না থাকলেও mRNA একইভাবে ডিএনএ থেকে তথ্য নিয়ে রাইবোসোমে পৌঁছে দেয় এবং সেই তথ্যকে অ্যামিনো অ্যাসিডের (Amino Acid) ক্রমে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরও বিভিন্ন ধরনের আরএনএ আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো কোষের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব ডিএনএ অংশ এই আরএনএগুলোর সংশ্লেষণ নির্দেশ করে, সেগুলোকেও **জিন (Gene)** হিসেবে গণ্য করা হয়।

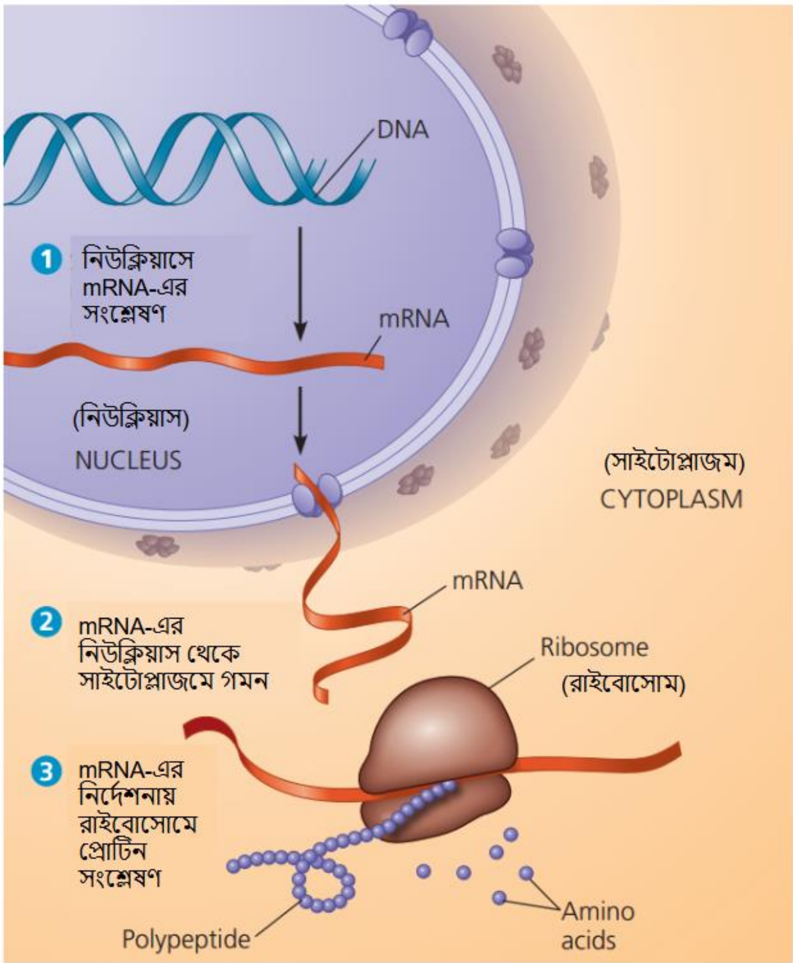

চিত্র ৬.৫.১: জিনের প্রকাশ (Gene Expression): DNA → RNA → Protein। ইউক্যারিওটিক (Eukaryotic) কোষে নিউক্লিয়াসে (Nucleus) অবস্থিত DNA, মেসেঞ্জার RNA (mRNA) তৈরির নির্দেশনা প্রদান করে। এরপর mRNA সেই তথ্য সাইটোপ্লাজমে (Cytoplasm) নিয়ে যায়, যেখানে রাইবোসোম (Ribosome) প্রোটিন তৈরি করে। এই পুরো প্রক্রিয়াকে জিনের প্রকাশ (Gene Expression) বলা হয়।

নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদানসমূহ (The Components of Nucleic Acids)।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid) হলো বৃহৎ জৈব অণু বা **ম্যাক্রোমলিকিউল (Macromolecule)**, যা অসংখ্য **নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)** একত্রে যুক্ত হয়ে গঠিত **পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide)** নামে পরিচিত পলিমার (Polymer) হিসেবে বিদ্যমান থাকে।অর্থাৎ, নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন একক (Monomer) হলো **নিউক্লিওটাইড**।

একটি নিউক্লিওটাইডের গঠন: সাধারণভাবে একটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত **(চিত্র ৬.৫.২):**

১। **পাঁচ-কার্বনযুক্ত শর্করা (Pentose Sugar)**

২। **নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার বা বেস (Nitrogenous Base)**

৩। **এক থেকে তিনটি ফসফেট গ্রুপ (Phosphate Group)**

চিত্র ৬.৫.২: নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদানসমূহ (ক) একটি পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide)-এ একটি শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড (Sugar–Phosphate Backbone) থাকে, যার সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাঙ্গ (Variable Appendages) হিসেবে নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার বা বেসসমূহ (Nitrogenous Bases) যুক্ত থাকে। (খ) একটি পলিনিউক্লিওটাইডে (Polynucleotide) প্রতিটি নিউক্লিওটাইড মনোমার (Nucleotide Monomer) একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস (Nitrogenous Base), একটি শর্করা (Sugar) এবং একটি ফসফেট গ্রুপ (Phosphate Group) নিয়ে গঠিত। শর্করার কার্বন পরমাণুগুলোর সংখ্যা নির্দেশ করার ক্ষেত্রে প্রাইম চিহ্ন (′) ব্যবহার করা হয়েছে। (গ) একটি নিউক্লিওসাইড (Nucleoside) একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস (পিউরিন বা পাইরিমিডিন; Purine or Pyrimidine) এবং একটি পাঁচ-কার্বনবিশিষ্ট শর্করা (ডিঅক্সিরাইবোজ বা রাইবোজ; Deoxyribose or Ribose) নিয়ে গঠিত।

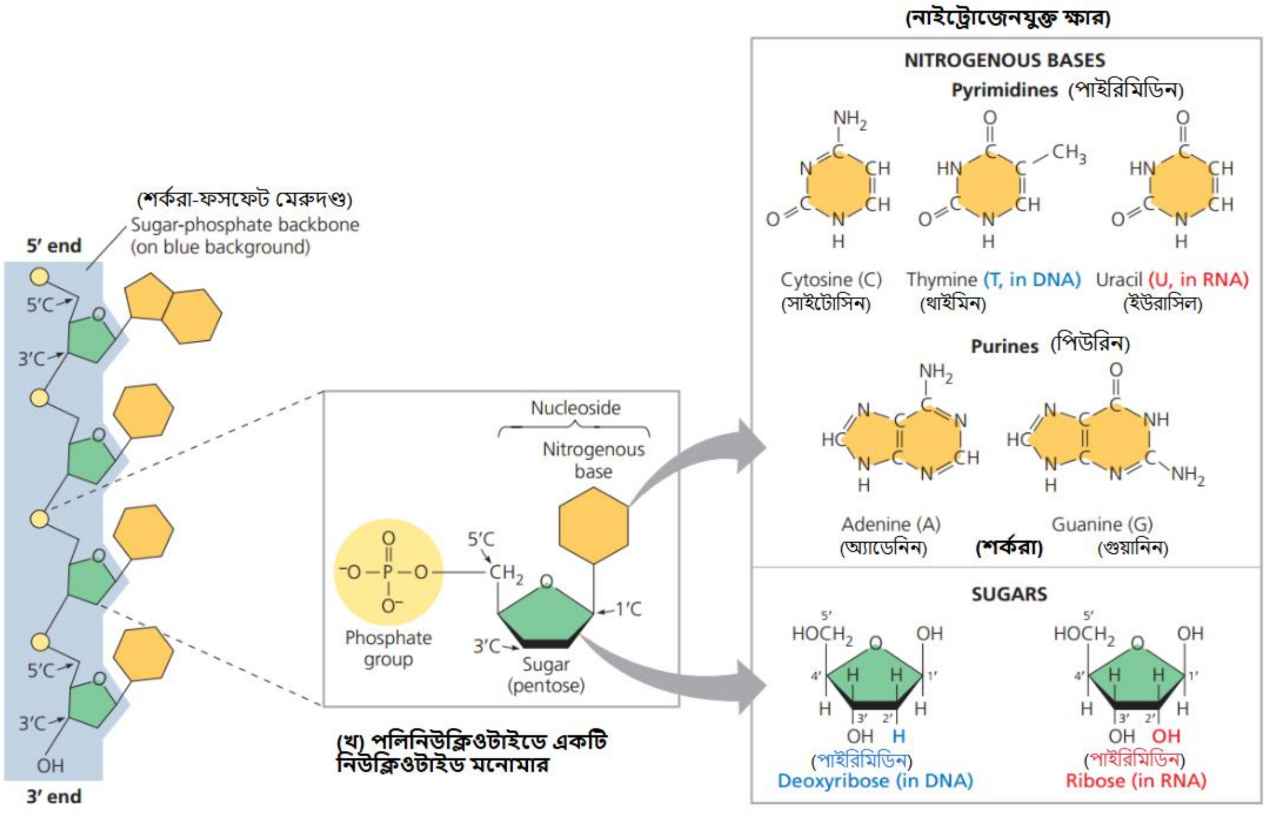

(ক) একটি পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide)/ নিউক্লিক অ্যাসিড

(গ) নিউক্লিওসাইড (Nucleoside) -এর উপাদানসমূহ।

পলিনিউক্লিওটাইড তৈরির সময় যে প্রাথমিক নিউক্লিওটাইড ব্যবহৃত হয়, তাতে সাধারণত তিনটি ফসফেট গ্রুপ থাকে। তবে পলিমার গঠনের সময় দুটি ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র **শর্করা (Sugar)** এবং **নাইট্রোজেনযুক্ত বেস (Base)** নিয়ে গঠিত অংশকে **নিউক্লিওসাইড (Nucleoside)** বলা হয়। অর্থাৎ,

নিউক্লিওসাইড = শর্করা + বেস

এবং

নিউক্লিওটাইড = নিউক্লিওসাইড + ফসফেট গ্রুপ

নাইট্রোজেনযুক্ত বেস (Nitrogenous Bases): নিউক্লিওটাইডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো **নাইট্রোজেনযুক্ত বেস**। প্রতিটি বেসে এক বা দুটি বলয় (Ring) থাকে, যার মধ্যে নাইট্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান। এই বেসগুলো দ্রবণ থেকে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) গ্রহণ করতে পারে, তাই এদের "বেস" বলা হয়।

নাইট্রোজেনযুক্ত বেস দুই ধরনের—

১. পাইরিমিডিন (Pyrimidine)

পাইরিমিডিনে একটি ছয়-সদস্যবিশিষ্ট বলয় (Six-membered ring) থাকে। পাইরিমিডিন পরিবারের সদস্য তিনটি হলো—

- **সাইটোসিন** (Cytosine, C)
- **থাইমিন** (Thymine, T)
- **ইউরাসিল** (Uracil, U)

২. পিউরিন (Purine)

পিউরিন অপেক্ষাকৃত বড় আকারের। এতে একটি ছয়-সদস্যবিশিষ্ট বলয়ের সঙ্গে একটি পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট বলয় যুক্ত থাকে। পিউরিন পরিবারের সদস্য দুটি হলো—

- **অ্যাডেনিন** (Adenine, A)
- **গুয়ানিন** (Guanine, G)
- **DNA ও RNA-তে বেসের উপস্থিতি:**

বেস	DNA	RNA
অ্যাডেনিন (A)	✓	✓
গুয়ানিন (G)	✓	✓
সাইটোসিন (C)	✓	✓
থাইমিন (T)	✓	X
ইউরাসিল (U)	X	✓

অর্থাৎ,

- **অ্যাডেনিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন** DNA এবং RNA উভয়েই থাকে।
- **থাইমিন** শুধুমাত্র DNA-তে থাকে।
- **ইউরাসিল** শুধুমাত্র RNA-তে থাকে।

নিউক্লিওটাইডের শর্করা (Sugar): নাইট্রোজেনযুক্ত বেস একটি পাঁচ-কার্বনযুক্ত শর্করার সঙ্গে যুক্ত থাকে। **DNA-তে** শর্করাটি হলো **ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)**। **RNA-তে** শর্করাটি হলো **রাইবোজ (Ribose)**। এই দুই শর্করার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো: **ডিঅক্সিরাইবোজের ২′ (দ্বিতীয়) কার্বনে একটি অক্সিজেন পরমাণু অনুপস্থিত থাকে**, আর রাইবোজে সেটি উপস্থিত থাকে। এই কারণেই এর নাম **Deoxy-ribose**, অর্থাৎ "অক্সিজেনবিহীন রাইবোজ"।

নিউক্লিওসাইড (Nucleoside): যখন একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বেস একটি শর্করার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন যে যৌগ তৈরি হয় তাকে **নিউক্লিওসাইড (Nucleoside)** বলা হয়। অর্থাৎ,

বেস + শর্করা = নিউক্লিওসাইড

উদাহরণ:

- অ্যাডেনিন + রাইবোজ = অ্যাডেনোসিন (Adenosine)
- গুয়ানিন + রাইবোজ = গুয়ানোসিন (Guanosine)

নিউক্লিওটাইড (Nucleotide): নিউক্লিওসাইডের শর্করার **৫′ (পঞ্চম) কার্বনের** সঙ্গে এক, দুই বা তিনটি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হলে **নিউক্লিওটাইড** গঠিত হয়। অর্থাৎ,

নিউক্লিওসাইড + ফসফেট গ্রুপ = নিউক্লিওটাইড

যদি একটি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত থাকে, তবে তাকে **নিউক্লিওসাইড মনোফসফেট** (Nucleoside Monophosphate) বলা হয়, যা সাধারণত **নিউক্লিওটাইড** নামেই পরিচিত।

সহজে মনে রাখার জন্য: নিউক্লিক অ্যাসিড → পলিনিউক্লিওটাইড → নিউক্লিওটাইড

এবং

নিউক্লিওটাইড = নাইট্রোজেনযুক্ত বেস + পেন্টোজ শর্করা + ফসফেট গ্রুপ

যেখানে,

- **পিউরিন:** অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G)
- **পাইরিমিডিন:** সাইটোসিন (C), থাইমিন (T), ইউরাসিল (U)
- **DNA-এর শর্করা:** ডিঅক্সিরাইবোজ
- **RNA-এর শর্করা:** রাইবোজ

এই নিউক্লিওটাইডগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে DNA ও RNA-এর দীর্ঘ শৃঙ্খল (Polynucleotide Chain) গঠন করে।

- *নিউক্লিওটাইডের পলিমার (Nucleotide Polymer)।*

নিউক্লিওটাইডগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide)** গঠন করে। এই সংযোগ একটি **ঘনীভবন বিক্রিয়া (Condensation Reaction)** বা **ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া (Dehydration Reaction)**-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেখানে একটি পানির (H_2O) অণু অপসারিত হয়।

পলিনিউক্লিওটাইডে পাশাপাশি থাকা দুটি নিউক্লিওটাইড **ফসফোডাইএস্টার বন্ধন (Phosphodiester Linkage)** দ্বারা যুক্ত থাকে। এই বন্ধনে একটি **ফসফেট গ্রুপ (Phosphate Group)** দুটি নিউক্লিওটাইডের শর্করা (Sugar) অংশকে সমযোজী বন্ধনের (Covalent Bond) মাধ্যমে সংযুক্ত করে। এর ফলে পুরো অণুতে শর্করা ও ফসফেটের একটি পুনরাবৃত্ত বিন্যাস (Repeating Pattern) তৈরি হয়, যাকে **শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড (Sugar–Phosphate Backbone)** বলা হয়। **গুরুত্বপূর্ণ:** নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলো (Nitrogenous Bases) এই মেরুদণ্ডের অংশ নয়; তারা শর্করার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় মেরুদণ্ডের পাশ থেকে বেরিয়ে থাকে।

পলিনিউক্লিওটাইডের দিকনির্দেশনা (Directionality): একটি পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের দুটি প্রান্ত একে অপরের থেকে ভিন্ন।

- এক প্রান্তে শর্করার **৫′ (ফাইভ-প্রাইম) কার্বনের** সঙ্গে একটি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত থাকে। এটিকে **5′ প্রান্ত (5′ End)** বলা হয়।
- অন্য প্রান্তে শর্করার **৩′ (থ্রি-প্রাইম) কার্বনের** সঙ্গে একটি হাইড্রক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে। এটিকে **3′ প্রান্ত (3′ End)** বলা হয়।

ফলে পলিনিউক্লিওটাইডের একটি নির্দিষ্ট দিক থাকে—

$5' \rightarrow 3'$

5′ প্রান্ত থেকে **3′ প্রান্ত**-এর দিকে। এটিকে অণুর **দিকনির্দেশনা (Directionality)** বলা হয়। এটি অনেকটা একমুখী রাস্তার (One-way Street) মতো, যেখানে চলার একটি নির্দিষ্ট দিক রয়েছে।

বেসের ক্রম (Base Sequence) ও জিনগত তথ্যঃ ডিএনএ (DNA) বা mRNA-এর শৃঙ্খলে নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলোর বিন্যাস বা **বেস সিকোয়েন্স (Base Sequence)** প্রতিটি জিনের জন্য আলাদা এবং অনন্য। এই বেসগুলোর ক্রমই কোষের জন্য নির্দিষ্ট জিনগত তথ্য বহন করে। যেহেতু একটি জিনে শত শত থেকে হাজার হাজার নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে, তাই সম্ভাব্য বেস বিন্যাসের সংখ্যা প্রায় অসীম।

উদাহরণস্বরূপ,

- **5′-AGGTAACTT-3′**
- **5′-CGCTTTAAC-3′**

এই দুটি সিকোয়েন্সে একই ধরনের বেস থাকলেও তাদের বিন্যাস ভিন্ন। ফলে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনগত তথ্য বহন করে।

বেসের ক্রম কীভাবে প্রোটিন নির্ধারণ করে? একটি জিনে বেসগুলোর সরলরৈখিক ক্রম (Linear Sequence) নির্ধারণ করে একটি প্রোটিনের অ্যামিনো

অ্যাসিডগুলোর ক্রম বা **প্রাথমিক গঠন (Primary Structure)**। অ্যামিনো অ্যাসিডের এই নির্দিষ্ট ক্রমের উপর নির্ভর করে প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক (3-D) গঠন তৈরি হয়। আর প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনই তার কার্যকারিতা (Function) নির্ধারণ করে। সুতরাং তথ্যের প্রবাহকে এভাবে দেখানো যায়—

DNA-এর বেস সিকোয়েন্স → অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্স → প্রোটিনের 3-D গঠন → প্রোটিনের কার্যকারিতা

- *DNA ও RNA অণুর গঠন (The Structures of DNA and RNA Molecules)।*

একটি **ডিএনএ (DNA)** অণু দুটি **পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল বা স্ট্র্যান্ড (Polynucleotide Strand)** নিয়ে গঠিত। এই দুটি শৃঙ্খল একটি কাল্পনিক অক্ষকে কেন্দ্র করে পরস্পরকে পেঁচিয়ে **দ্বি-সর্পিল (Double Helix)** গঠন তৈরি করে। DNA-এর দুটি শৃঙ্খলের **শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড (Sugar–Phosphate Backbone)** বিপরীত দিকে অবস্থান করে। অর্থাৎ, একটি শৃঙ্খল 5′ → 3′ দিকে চললে অন্যটি 3′ → 5′ দিকে চলে। এই বিন্যাসকে **অসমান্তরাল** বা **অ্যান্টিপ্যারালেল (Antiparallel)** বিন্যাস বলা হয়। অনেকটা দুইমুখী মহাসড়কের (Divided Highway) মতো, যেখানে দুটি রাস্তা বিপরীত দিকে চলে।

ডাবল হেলিক্সের বাইরের অংশে থাকে শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড এবং ভেতরের অংশে থাকে নাইট্রোজেনযুক্ত বেসগুলো। দুটি শৃঙ্খল পরস্পরের সঙ্গে **হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bond)** দ্বারা যুক্ত থাকে। DNA-তে বেস জোড়া গঠনের (Base Pairing) নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে **(চিত্র ৬.৫.৩ক)**—

- **অ্যাডেনিন (A)** ↔ **থাইমিন (T)**
- **গুয়ানিন (G)** ↔ **সাইটোসিন (C)**

অন্য কোনো বেসের সঙ্গে এদের জোড়া গঠিত হয় না।

উদাহরণস্বরূপ,

যদি একটি স্ট্র্যান্ড বা শৃঙ্খলের সিকোয়েন্স হয়—

5′-AGGTCCG-3′

তাহলে অপর স্ট্র্যান্ড বা শৃঙ্খলের সিকোয়েন্স হবে—

3′-TCCAGGC-5′

কারণ A-এর বিপরীতে T এবং G-এর বিপরীতে C বসবে।

এ কারণে DNA-এর দুটি শৃঙ্খলকে **পরিপূরক (Complementary)** বলা হয়। একটি শৃঙ্খলের সিকোয়েন্স জানা থাকলে অন্যটির সিকোয়েন্স সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

DNA-এর গঠন ও প্রতিলিপি (Replication): DNA-এর পরিপূরক গঠনই কোষ বিভাজনের সময় DNA-এর সঠিক প্রতিলিপি (Replication) তৈরি করতে সাহায্য করে। কোষ বিভাজনের আগে DNA-এর দুটি শৃঙ্খল আলাদা হয়ে যায় এবং প্রতিটি শৃঙ্খল নতুন একটি পরিপূরক শৃঙ্খল তৈরির ছাঁচ (Template) হিসেবে কাজ করে। ফলে দুটি অভিন্ন DNA অণু তৈরি হয়, যা পরে দুটি কন্যা কোষে (Daughter Cells) বণ্টিত হয়। এই কারণে নতুন কোষগুলো জিনগতভাবে (Genetically) মাতৃকোষের (Parent Cell) অনুরূপ হয়। অতএব, DNA-এর গঠনই তার প্রধান কাজ—**জিনগত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে স্থানান্তর**—ব্যাখ্যা করে।

DNA-এর বিপরীতে **RNA (Ribonucleic Acid)** সাধারণত **একক শৃঙ্খল (Single-Stranded)** হিসেবে বিদ্যমান থাকে। তবে RNA-তেও পরিপূরক বেস জোড়া (Complementary Base Pairing) গঠিত হতে পারে—

- দুটি পৃথক RNA অণুর মধ্যে, অথবা
- একই RNA অণুর ভিন্ন অংশের মধ্যে।

এই অভ্যন্তরীণ বেস জোড়া RNA-কে একটি নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক (3-D) গঠন প্রদান করে, যা তার কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

RNA-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হলো **ট্রান্সফার RNA (tRNA) (চিত্র ৬.৫.৩খ)**। tRNA প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় অ্যামিনো অ্যাসিডকে রাইবোসোমে নিয়ে আসে। একটি tRNA অণুতে প্রায় ৮০টি নিউক্লিওটাইড থাকে। এর বিশেষ ত্রিমাত্রিক গঠন তৈরি হয় একই অণুর পরিপূরক নিউক্লিওটাইড অংশগুলোর মধ্যে বেস জোড়া গঠনের মাধ্যমে, যেখানে শৃঙ্খলের কিছু অংশ অ্যান্টিপ্যারালেলভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়।

চিত্র ৬.৫.৩: DNA এবং tRNA অণুর গঠন (ক) DNA অণু (DNA Molecule) সাধারণত একটি দ্বি-সর্পিল (Double Helix) গঠন ধারণ করে। এতে অ্যান্টিপ্যারালেল (Antiparallel) পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলগুলোর শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড (Sugar–Phosphate Backbones) হেলিক্সের বাইরের দিকে অবস্থান করে (এখানে নীল ফিতার মাধ্যমে প্রতীকীভাবে দেখানো হয়েছে)। নাইট্রোজেনযুক্ত বেসের (Nitrogenous Bases) জোড়াগুলোর মধ্যে গঠিত হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bonds) দুটি শৃঙ্খলকে একত্রে ধরে রাখে। এখানে বেসগুলোকে প্রতীকী আকারে দেখানো হয়েছে। অ্যাডেনিন (A) শুধুমাত্র থাইমিন (T)-এর সঙ্গে এবং গুয়ানিন (G) শুধুমাত্র সাইটোসিন (C)-এর সঙ্গে জোড়া গঠন করতে পারে। এই চিত্রে প্রদর্শিত প্রতিটি DNA শৃঙ্খল, চিত্র **চিত্র ৬.৫.২**ক-এ চিত্রিত পলিনিউক্লিওটাইডের গঠনগত সমতুল্য (Structural Equivalent)। (খ) একটি tRNA অণু (tRNA Molecule)-এর গঠন মোটামুটি L-আকৃতির (L-shaped Structure) হয়, যা RNA-এর অ্যান্টিপ্যারালেল অংশগুলোর মধ্যে পরিপূরক বেস-জোড়া গঠন (Complementary Base Pairing)-এর ফলে সৃষ্টি হয়। RNA-তে A (Adenine), U (Uracil)-এর সঙ্গে জোড়া গঠন করে।

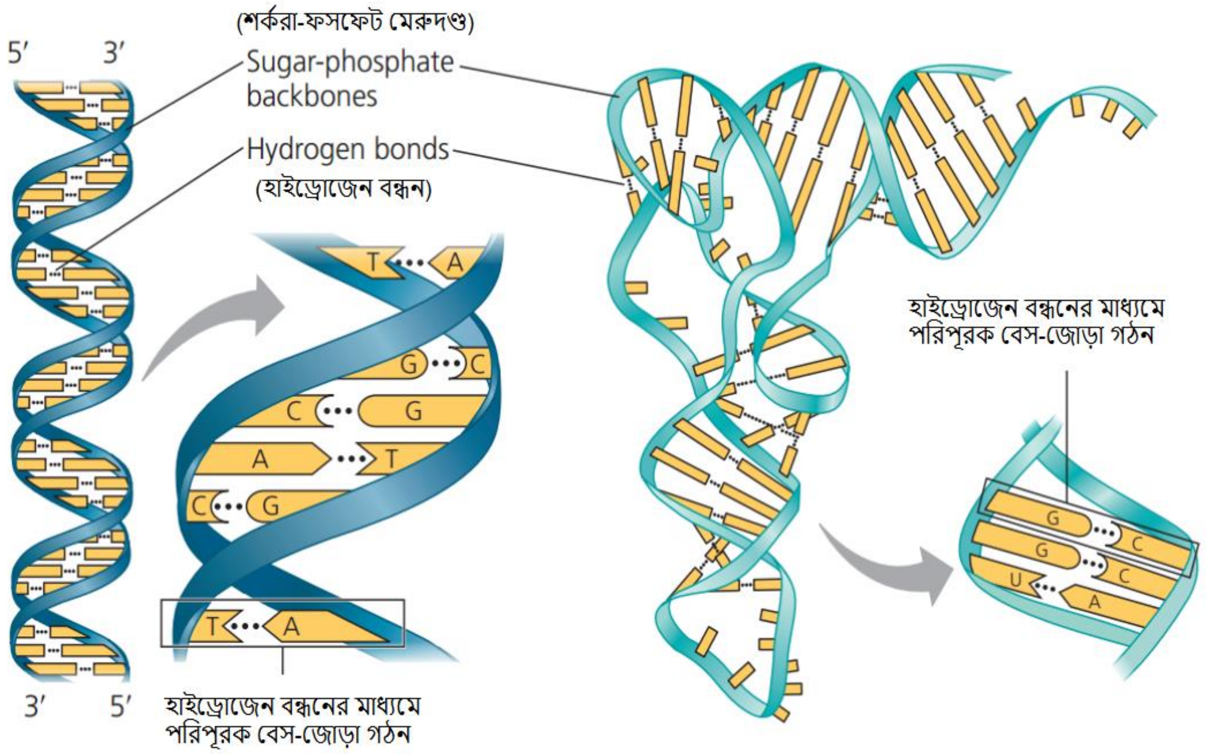

(ক) DNA অণু **(খ) tRNA অণু**

DNA ও RNA-এর প্রধান পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	**DNA**	**RNA**
শৃঙ্খলের সংখ্যা	দ্বি-শৃঙ্খল (Double-Stranded)	একক শৃঙ্খল (Single-Stranded)
শর্করা	ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)	রাইবোজ (Ribose)
বেস	A, T, G, C	A, U, G, C
A-এর জোড়া	T	U
গঠন	সাধারণত ডাবল হেলিক্স	বিভিন্ন রকম ত্রিমাত্রিক গঠন
প্রধান কাজ	জিনগত তথ্য সংরক্ষণ	জিনগত তথ্যের প্রকাশ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ

RNA বেস জোড়াতে থাইমিন (T) থাকে না। তাই RNA-তে বেস জোড়া গঠনের নিয়ম হলো—

- **অ্যাডেনিন (A) ↔ ইউরাসিল (U)**
- **গুয়ানিন (G) ↔ সাইটোসিন (C)**

DNA সাধারণত একটি স্থিতিশীল ডাবল হেলিক্স গঠন করে, কিন্তু RNA বিভিন্ন ধরনের জটিল আকৃতি ধারণ করতে পারে। এই বহুমুখী গঠনের কারণে RNA অনেক ধরনের কাজ করতে সক্ষম। অনেক জীববিজ্ঞানীর ধারণা, পৃথিবীর আদিম জীবজগতে জিনগত তথ্য বহনের জন্য প্রথমে RNA-ই ব্যবহৃত হতো এবং পরে DNA বিবর্তিত হয়েছে। এই ধারণাকে আরএনএ-ভিত্তিক বিশ্বের অনুকল্প বা আরএনএ ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস (RNA World Hypothesis) বলা হয়। আরএনএ ওয়ার্ল্ড হাইপোথিসিস (RNA World Hypothesis) হলো জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীতে ডিএনএ (DNA) এবং প্রোটিন (Protein) আসার আগে সমস্ত জৈবিক কাজ আরএনএ (RNA) একাই পরিচালনা করতো। সহজ কথায়, আরএনএ-ই ছিল আদি পৃথিবীতে জীবনের ভিত্তি।

৬.৬ জিনোমিক্স (Genomics) ও প্রোটিওমিক্স (Proteomics) জীববিজ্ঞান গবেষণা ও এর প্রয়োগে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ডিএনএ (DNA)-ই বংশগত তথ্যের বাহক। এই তথ্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং জীবকোষ ও জীবদেহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৫৩ সালে ডিএনএ (DNA)-এর গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পর আরও বোঝা গেলে যে DNA-এর নিউক্লিওটাইড বেসগুলোর সরলরৈখিক বিন্যাস প্রোটিনেরও অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম নির্ধারণ করে। তাই, এই সূত্র ব্যবহার করে, তখন জীববিজ্ঞানীরা জিনের নিউক্লিওটাইড অনুক্রম (Base sequence) বের করার মাধ্যমে জিনের "সংকেত বা কোড (Code)" যা প্রোটিনের নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড নির্ধারণ করে তা উন্মোচনের চেষ্টা শুরু করেন।

DNA সিকোয়েন্সিং বা DNA-এর একটি শৃঙ্খলে নিউক্লিওটাইডগুলোর ক্রম একে একে নির্ধারণ করার প্রথম রাসায়নিক পদ্ধতিগুলো ১৯৭০-এর দশকে উদ্ভাবিত হয়। গবেষকেরা এককেটি জিনের সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। কিন্তু যতই তারা নতুন তথ্য জানতে থাকেন, ততই নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হতে থাকে। যেমন—

- জিনের প্রকাশ (Gene expression) কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

- জিন ও তাদের উৎপাদিত প্রোটিনগুলো পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে ক্রিয়া করে?
- DNA-এর যে অংশগুলো জিন নয়, সেগুলোর কোনো কাজ আছে কি?

একটি জীবের জিনগত কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য তার সমগ্র DNA-এর অনুক্রম, অর্থাৎ তার **জিনোম (Genome)**, জানা সবচেয়ে কার্যকর ও তথ্যবহুল হতো। যদিও ধারণাটি তখন অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হয়েছিল, তবুও ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে কয়েকজন খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী একটি সাহসী প্রস্তাব দেন—সমগ্র মানব জিনোমের প্রায় ৩ বিলিয়ন নিউক্লিওটাইডের ক্রম বা সিকোয়েন্স নির্ধারণ করা হবে। এই বিশাল প্রকল্প ১৯৯০ সালে শুরু হয় এবং ২০০০-এর দশকের শুরুতে কার্যত সম্পন্ন হয়।

এই **মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project)**-এর একটি অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল দ্রুততর এবং কম ব্যয়বহুল DNA সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তির বিকাশ। এই উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ২০০১ সালে যেখানে ১০ লক্ষ (১ মিলিয়ন) বেস সিকোয়েন্স করতে খরচ হতো ৫,০০০ ডলারেরও বেশি (প্রায় ৫ লক্ষ টাকা), সেখানে ২০১৭ সালে সেই খরচ কমে দাঁড়ায় ০.০২ ডলারেরও কম (প্রায় ২ টাকা)। একইভাবে, যে মানব জিনোমের প্রথম সিকোয়েন্স সম্পন্ন করতে ১০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আজ তা এক দিনেরও কম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব।

ফলস্বরূপ, সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সকৃত জিনোমের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য (Data) সৃষ্টি হয় এবং এই তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য **বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)** নামক শাখার বিকাশ ঘটে। বায়োইনফরমেটিক্সে কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য গণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বৃহৎ জৈবিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়।

এই অগ্রগতিগুলো জীববিজ্ঞান ও এর সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোর গবেষণায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বর্তমানে জীববিজ্ঞানীরা প্রায়ই একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক জিন বিশ্লেষণ করেন কিংবা বিভিন্ন প্রজাতির সম্পূর্ণ জিনোমের তুলনা করেন। এই ধরনের গবেষণাকে **জিনোমিক্স** (Genomics) বলা হয়।

একইভাবে, বিপুল সংখ্যক প্রোটিনের গঠন, ক্রম এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমষ্টিগত গবেষণাকে **প্রোটিওমিক্স (Proteomics)** বলা হয়। প্রোটিনের অনুক্রম সরাসরি জৈবরাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যায় অথবা যে DNA সেগুলোর জন্য সংকেত বহন করে, তার সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ করেও জানা যায়।

বর্তমানে জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স জীববিজ্ঞানের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে জীববিজ্ঞানের ওপর এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্ভবত বিবর্তন (Evolution) সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। জীবাশ্ম এবং বর্তমান জীবের গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে প্রাপ্ত বিবর্তনের প্রমাণকে সমর্থন করার পাশাপাশি, জিনোমিক্স বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে যেসব বিবর্তনীয় সম্পর্ক স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না, জিনোমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলো আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন জীবের বিবর্তনীয় ইতিহাস পুনর্গঠন ও ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ হয়েছে।

বিবর্তনের পরিমাপক হিসেবে DNA ও প্রোটিন। (DNA and Proteins as Tape Measures of Evolution)

বিবর্তন (Evolution) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত জীবদের মধ্যে বিদ্যমান অভিন্ন বৈশিষ্ট্য—যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোম এবং দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা—কে তাদের অভিন্ন পূর্বপুরুষের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করি। সহজ ভাষায়, আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে কিছু জীবের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। যেমন, সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে লোম থাকে

এবং তারা বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়। এই ধরনের মিল থেকে ধারণা করা যায় যে তারা একসময় একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে, DNA-তে সংরক্ষিত বংশগত তথ্যও জীবদের পারস্পরিক বিবর্তন বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

DNA জিনের মাধ্যমে বংশগত তথ্য বহন করে। DNA-এর নিউক্লিওটাইডগুলোর সরলরৈখিক ক্রম (Sequence) এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং এই ক্রমই প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম নির্ধারণ করে। ফলে একই পিতা-মাতার সন্তানদের DNA ও প্রোটিনের মধ্যে মিল সাধারণত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি হয়। এই ধারণার ভিত্তিতে আণবিক বংশতালিকা বা মলিকুলার জিনিয়োলজি (Molecular Genealogy) তৈরি করা যায়। আণবিক বংশতালিকা বংশ পরিচয় খোঁজার এমন একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেখানে বংশের ইতিহাস জানার জন্য মানুষের ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে বংশ তালিকা তৈরি করতে পুরনো পারিবারিক নথিপত্র, জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড বা মানুষের স্মৃতি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এতে অনেক সময় ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকে। আণবিক বংশ তালিকায় ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই শূন্যতা পূরণ করা হয় এবং নিখুঁতভাবে পূর্বপুরুষদের সন্ধান বের করা সম্ভব হয়।

বিবর্তনীয় ধারণার ভিত্তিতে এই "আণবিক বংশতালিকা" বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। যদি দুটি প্রজাতি অঙ্গসংস্থানগত (Anatomical) বৈশিষ্ট্য বা জীবাশ্ম প্রমাণের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়, তাহলে তাদের DNA ও প্রোটিনের সিকোয়েন্সেও অধিক মিল থাকার কথা। বাস্তব গবেষণায়ও ঠিক তাই দেখা যায়।

এর একটি উদাহরণ হলো বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হিমোগ্লোবিনের β (বিটা) পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের তুলনা। এই শৃঙ্খলে মোট ১৪৬টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে।

- মানুষ ও গরিলার মধ্যে এই শৃঙ্খলে মাত্র **১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য** রয়েছে।
- অন্যদিকে, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে **৬৭টি অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্থক্য** দেখা যায়।

এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষ ও গরিলা বিবর্তনীয়ভাবে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি, আর মানুষ ও ব্যাঙের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে অনেক দূরের।

একই নীতি সম্পূর্ণ জিনোমের তুলনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ—

- মানুষের জিনোমের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির জিনোমের **প্রায় ৯৫–৯৮% মিল** রয়েছে।
- কিন্তু মানুষের জিনোমের সঙ্গে ইঁদুরের জিনোমের মিল **প্রায় ৮৫%**, যা তুলনামূলকভাবে কম।

অতএব, DNA ও প্রোটিনের সিকোয়েন্স বিশ্লেষণ জীবদের বিবর্তনীয় আত্মীয়তার মাত্রা নির্ণয়ের একটি শক্তিশালী উপায়। আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular Biology) জীববিজ্ঞানীদের জন্য এমন একটি নতুন "পরিমাপক" (Tape measure) প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক বিবর্তনীয় সম্পর্ক আরও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

জিনোম সিকোয়েন্সের তুলনার ব্যবহার কেবল বিবর্তন গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ নয়; এর গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রয়োগও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, DNA বা জিনোম বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য, ওষুধ বা অন্যান্য পণ্যে ভেজাল ও প্রতারণা (Consumer fraud) শনাক্ত করা সম্ভব। ফলে জিনোমিক বিশ্লেষণ আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং ভোক্তা সুরক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চিত্র ৬.৬.১: স্বয়ংক্রিয় DNA সিকোয়েন্সিং যন্ত্র বা মেশিন (Machine) এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার

প্রযুক্তির সাহায্যে জিন ও সম্পূর্ণ জিনোমের সিকোয়েন্স
দ্রুত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

অনুশীলনী ৫

ধারণা যাচাই (Concept Check):

১। বৃহৎ জৈব অণুর (Biological macromolecules) চারটি প্রধান শ্রেণি কী কী? এদের মধ্যে কোন শ্রেণিটি পলিমার দ্বারা গঠিত নয়?

২। ১০টি মনোমারযুক্ত একটি পলিমারকে সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোলাইসিস করতে কতটি পানির অণু প্রয়োজন হবে?

৩। যদি তুমি মাছের একটি টুকরা খাও, তাহলে মাছের প্রোটিনে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড মনোমারগুলো তোমার শরীরে নতুন প্রোটিনে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য কী কী বিক্রিয়া ঘটতে হবে?

৪। তিনটি কার্বনবিশিষ্ট একটি মনোস্যাকারাইডের রাসায়নিক সংকেত (Formula) লিখ।

৫। একটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ায় দুটি গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে ম্যালটোজ গঠন করে। গ্লুকোজের সংকেত $C_6H_{12}O_6$ হলে, ম্যালটোজের সংকেত কী হবে?

৬। একটি গরুকে সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর পশুচিকিৎসক তাকে বিভিন্ন প্রোক্যারিওটসমৃদ্ধ “Gut Culture" (গাট কালচার)” খাওয়ান। কেন এটি প্রয়োজনীয়? ("Gut Culture" (গাট কালচার) বা "Gut Microbiome Culture" হলো পরিপাকতন্ত্র বা পাকস্থলীতে বসবাসকারী কোটি কোটি অণুজীব—যেমন ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং ভাইরাসের সমষ্টিগত জগত। এরা সরাসরি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজম প্রক্রিয়া এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে)

৭। একটি চর্বি (ট্রাইগ্লিসারাইড)-এর গঠনের সাথে একটি ফসফোলিপিডের গঠন তুলনা কর।

৮। মানবদেহের যৌন হরমোনগুলোকে কেন লিপিড হিসেবে গণ্য করা হয়?

৯। ধরো, একটি ঝিল্লি (Membrane) কোনো তেলের ফোঁটাকে ঘিরে রেখেছে, যেমন উদ্ভিদের বীজকোষ বা কিছু প্রাণিকোষে দেখা যায়। ঝিল্লিটি কী ধরনের গঠন গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

১০। পলিপেপটাইডের কোন অংশগুলো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারকে স্থিতিশীল রাখার বন্ধনে অংশগ্রহণ করে? আর কোন অংশগুলো টারশিয়ারি স্ট্রাকচারে অংশগ্রহণ করে?

১১। এই অধ্যায়ে গ্রিক অক্ষর α (আলফা) এবং β (বিটা) অন্তত তিন জোড়া ভিন্ন গঠন নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১২। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি কার্বক্সিল গ্রুপ ও একটি অ্যামিনো গ্রুপ থাকে। একটি পলিপেপটাইডে কেন এই গ্রুপগুলো উপস্থিত থাকে? ব্যাখ্যা কর।

১৩। একটি ভাঁজকৃত (Folded) পলিপেপটাইডে ভ্যালিন, লিউসিন ও আইসোলিউসিন যামিনো অ্যাসিড-সমৃদ্ধ অঞ্চল কোথায় অবস্থান করবে বলে তুমি আশা কর? ব্যাখ্যা কর।

১৪। চিত্র ৬.৫.৩ক-এ উপরের তিনটি নিউক্লিওটাইডের সব কার্বন (prime ব্যবহার করে) নম্বর দাও, নাইট্রোজেনঘটিত বেসগুলো বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত কর এবং ফসফেটগুলো তারকা (*) চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

১৫। DNA-এর একটি শৃঙ্খলে নাইট্রোজেনঘটিত বেসের ক্রম হলো:

5′-TAGGCCT-3′

এর পরিপূরক (Complementary) শৃঙ্খলটি লিখ এবং 5′ ও 3′ প্রান্ত চিহ্নিত কর।

১৬। কোনো জীবের সম্পূর্ণ জিনোমের সিকোয়েন্স জানা থাকলে বিজ্ঞানীরা কীভাবে সেই জীবের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন?

১৭। DNA-এর কাজ বিবেচনা করলে কেন আশা করা যায় যে খুব মিলযুক্ত বৈশিষ্ট্যের দুটি প্রজাতির জিনোমও খুব মিল হবে?

১৮। ডিহাইড্রেশন (Dehydration) এবং হাইড্রোলাইসিস (Hydrolysis)-এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

১৯। তিন থেকে ছয় কার্বনবিশিষ্ট সরল শর্করার (Simple sugar) গঠন বর্ণনা কর।

২৬। যদি একটি RNA অণু DNA থেকে অনুলিপিত বা অনুলিখিত (Transcribed) হয়, তাহলে RNA-এর বেস ক্রমের সঙ্গে DNA-এর প্রতিটি শৃঙ্খলের সম্পর্ক কী হবে?

২৭। নিচের চিত্রটি দেখে প্রোটিন গঠনের বিভিন্ন স্তর (Levels of protein structure) বর্ণনা কর।

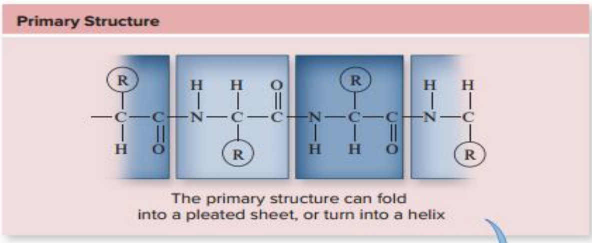

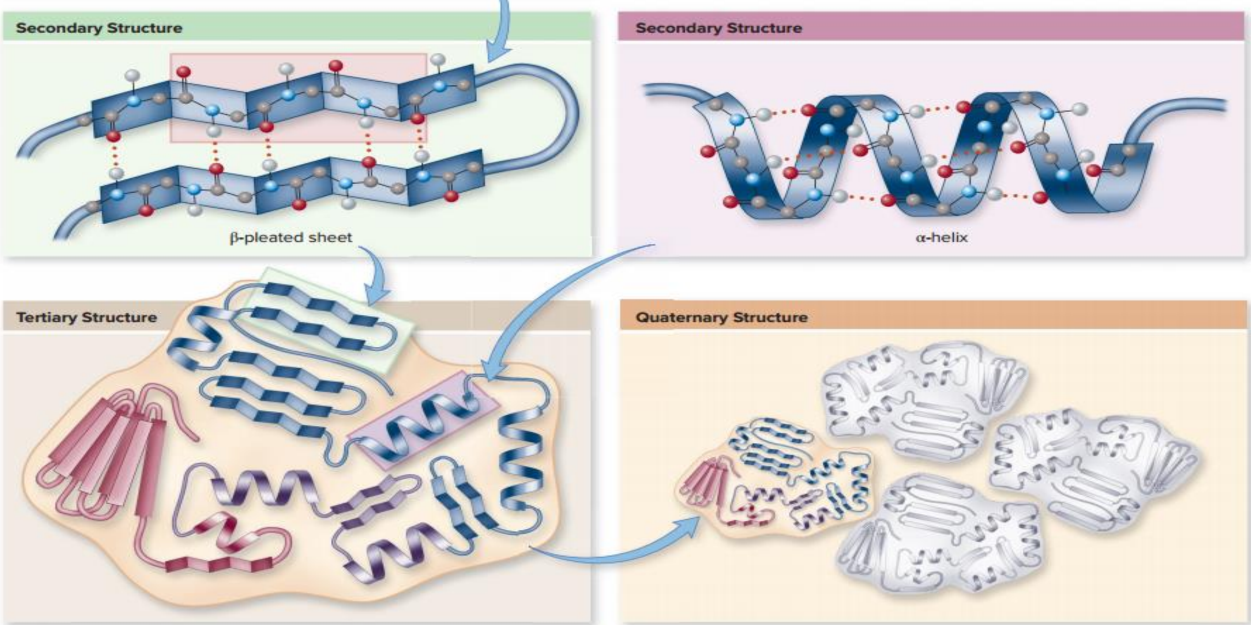

২০। পলিস্যাকারাইডের গঠন কীভাবে তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত?

২১। স্টার্চ, গ্লাইকোজেন এবং সেলুলোজের গঠন কীভাবে তাদের কাজকে প্রভাবিত করে?

২২। নিউক্লিওটাইডের গঠন বর্ণনা কর।

২৩। DNA ও RNA-এর গঠনের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

২৪। DNA ও RNA-এর কাজ আলোচনা কর।

২৫। শক্তি বিপাকে (Energy metabolism) অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নিউক্লিওটাইড চিহ্নিত কর।

২৮। মোটিফ (Motif) ও ডোমেইন (Domain) কীভাবে প্রোটিনের গঠনে অবদান রাখে?

২৯। ট্রাইগ্লিসারাইডের গঠন বর্ণনা কর।

৩০। চর্বি (Fat) কীভাবে শক্তি সঞ্চয়কারী অণু হিসেবে কাজ করে?

৩১। ফসফোলিপিডের গঠন সম্পর্কে জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যাখ্যা কর যে কীভাবে ঝিল্লি (Membrane) গঠিত হয়।

৩২। ফসফোলিপিড ঝিল্লি তৈরি করলেও ট্রাইগ্লিসারাইড কেন পানিতে অদ্রবণীয় ফোঁটা (Droplet) তৈরি করে?

৩৩। স্টার্চ বা গ্লাইকোজেনকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সেলুলোজকে না। কেন?

৩৪। একাধিক মনোমার থেকে একটি পলিমার কীভাবে গঠিত হয়?

৩৫। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কার্বোহাইড্রেট কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩৬। RNA-এর অংশ হিসেবে কোন কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়?

৩৭। সেলুলোজকে স্টার্চ থেকে কী আলাদা করে?

৩৮। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কোন অংশটি প্রোটিনের সামগ্রিক গঠনের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে?

৩৯। ট্রাইগ্লিসারাইডের কোন গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি পানিতে অদ্রবণীয়?

৪০। চার ধরনের জৈব ম্যাক্রোমোলিকিউল একে অপরের থেকে কীভাবে ভিন্ন? তাদের গঠন কীভাবে তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত?

৪১। হাইড্রোজেন বন্ধন ও হাইড্রোফোবিক আন্তঃক্রিয়া (Interaction) জৈব ম্যাক্রোমোলিকিউলগুলোর গঠন ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চার ধরনের ম্যাক্রোমোলিকিউলের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব বর্ণনা কর। হাইড্রোজেন বন্ধন নষ্ট হলে কী হবে? হাইড্রোফোবিক আন্তঃক্রিয়া নষ্ট হলে কী হবে?

৪২। উদ্ভিদ স্টার্চ এবং সেলুলোজ উভয়ই তৈরি করে। তুমি কি মনে করো স্টার্চ সংশ্লেষকারী এনজাইমগুলো সেলুলোজ তৈরিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে? এনজাইম ও উৎপন্ন পলিমারের গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন কর।

৪৩। DNA ভাঙার এনজাইমগুলো নিউক্লিওটাইডগুলোর মধ্যে থাকা সমযোজী (Covalent) বন্ধনের হাইড্রোলাইসিস ঘটায়। DNA-কে এ ধরনের এনজাইম দিয়ে প্রক্রিয়াজাত, অর্থাৎ বিক্রিয়া করালে করলে কী ঘটবে?

৪৪। গ্লুকোজের আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ১০টি গ্লুকোজ যুক্ত হয়ে গঠিত পলিমারের আণবিক সংকেত কী হবে?

৪৫। চিত্র ৬.৫.৩ক-এর পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলটি অনুলিপি কর এবং 5′ প্রান্ত থেকে শুরু করে G, T, C এবং T বেসগুলো চিহ্নিত কর। ধরে নাও এটি একটি DNA শৃঙ্খল (Strand)। এখন এর পরিপূরক শৃঙ্খল ফসফেট (বৃত্ত), শর্করা (পঞ্চভুজ) ও ক্ষার বা বেসসহ অঙ্কন কর। উভয় শৃঙ্খলের 5′→3′ দিক তীরচিহ্ন দিয়ে দেখাও এবং নিশ্চিত কর যে দুটি শৃঙ্খল অসমান্তরাল (Antiparallel)।

৪৬। অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমের তুলনা একই ধরনের প্রজাতিগুলোর বিবর্তনীয় বিচ্যুতি (Evolutionary divergence) সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। দুটি জীবিত প্রজাতির সব প্রোটিন কি সমান মাত্রায় বিচ্যুতি প্রদর্শন করবে? কেন বা কেন নয়? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৪৭। তুমি যদি DNA-বাইন্ডিং প্রোটিন, অর্থাৎ যে প্রোটিনগুলো DNA-তে বাঁধে তা নিয়ে গবেষণা করে এমন একটি ল্যাবের সহকারী হও এবং তোমাকে সম্ভাব্য DNA-বাইন্ডিং প্রোটিন শনাক্ত করতে বলা হয়, তাহলে DNA-বাইন্ডিং অঞ্চলে কী ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকার আশা করবে? ব্যাখ্যা কর।

৪৮। প্রোটিনের বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকা সত্ত্বেও সব প্রোটিন একই ধরনের মনোমার—অ্যামিনো অ্যাসিড—দিয়ে গঠিত। ১০০-১৫০ শব্দে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ, যেখানে ব্যাখ্যা করবে কীভাবে স্বল্প সংখ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন পলিমারকে এত বৈচিত্র্যময় কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়।

৪৯। ডিমের কুসুমের কাজ হলো বিকাশমান ভ্রূণকে পুষ্টি ও সহায়তা প্রদান করা। এই তথ্যের ভিত্তিতে

ব্যাখ্যা কর কেন ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে চর্বি, প্রোটিন এবং কোলেস্টেরল থাকে।

৫০। নিম্নের চিত্রে এক ধরনের শ্যাপেরন (Chaperone) প্রোটিন কীভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে। শ্যাপেরন (Chaperone বা Chaperon)-এর আক্ষরিক বাংলা অর্থ হলো অভিভাবক, রক্ষক, সঙ্গী বা তত্ত্বাবধায়ক। এক্ষেত্রে শ্যাপেরন (Chaperone) প্রোটিন হলো কোষের বিশেষ একদল সহায়ক প্রোটিন। এদের প্রধান কাজ হলো নবসংশ্লেষিত প্রোটিনগুলোকে সঠিকভাবে ত্রিমাত্রিক আকারে ভাঁজ (Fold) হতে সাহায্য করা। কোষের ভেতরে ভুলভাবে ভাঁজ হওয়া প্রোটিনগুলোকে জটলা পাকানো থেকে রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হলে পুনরায় ভাঁজ করে সঠিক আকৃতি প্রদান করে। ছবিতে দেখানো ব্যারেল-আকৃতির শ্যাপেরোনিন (chaperonin) হলো GroE পরিবারভুক্ত একটি শ্যাপেরন প্রোটিন। এটি দুটি অভিন্ন (Identical) রিং দ্বারা গঠিত, এবং প্রতিটি রিংয়ে সাতটি করে অভিন্ন উপএকক (Subunit) থাকে। প্রতিটি উপএককে আবার তিনটি স্বতন্ত্র ডোমেইন (Domain) রয়েছে। ভুলভাবে ভাঁজ হওয়া (Misfolded) একটি প্রোটিন শ্যাপেরোনিনের ব্যারেলসদৃশ গহ্বরের (Chamber) একটিতে প্রবেশ করে। এরপর একটি টুপি বা ক্যাপ (Cap) এসে সেই গহ্বরটি বন্ধ করে দেয়। ATP-এর হাইড্রোলাইসিস থেকে প্রাপ্ত শক্তি গহ্বরটির গঠনে পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে গহ্বরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হাইড্রোফোবিক (জলবিমুখ) অবস্থা থেকে হাইড্রোফিলিক (জলপ্রিয়) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে প্রোটিনটি পুনরায় সঠিকভাবে ভাঁজ হওয়ার (Refolding) সুযোগ পায়। কিছু সময় পরে প্রোটিনটিকে গহ্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়। তখন প্রোটিনটি হয় সঠিকভাবে ভাঁজকৃত (Folded) অবস্থায় থাকে, অথবা এখনও ভাঁজহীন (Unfolded) থাকতে পারে। যদি সঠিকভাবে ভাঁজ না হয়, তবে একই প্রক্রিয়া পুনরায় সংঘটিত হতে পারে যতক্ষণ না প্রোটিনটি তার সঠিক ত্রিমাত্রিক গঠন অর্জন করে।

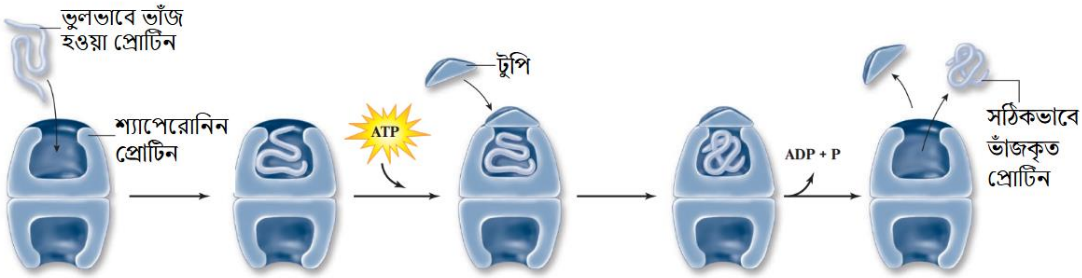

ক। শ্যাপেরোনিনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হাইড্রোফোবিক থেকে হাইড্রোফিলিক হয়ে যাওয়া প্রোটিনের পুনঃভাঁজকরণে কীভাবে সাহায্য করে?

খ। ATP-এর হাইড্রোলাইসিস ছাড়া শ্যাপেরোনিন কি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে? ব্যাখ্যা কর।

গ। কেন ভুলভাবে ভাঁজ হওয়া প্রোটিনকে শ্যাপেরোনিনের একটি পৃথক গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়?

ঘ। কোষে শ্যাপেরন প্রোটিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলে কোষীয় কার্যকলাপে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে?

ঙ। অনেক স্নায়ুবিক রোগে (Neurodegenerative diseases) অস্বাভাবিকভাবে ভাঁজ হওয়া প্রোটিন জমা হতে দেখা যায়। শ্যাপেরনের কার্যকারিতা কমে যাওয়া কীভাবে এ ধরনের রোগের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে?

চ। শ্যাপেরোনিনের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তন করা হলে প্রোটিন ভাঁজকরণের দক্ষতা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে?

আরিফ জীববিজ্ঞান (Arif Biology)

১ম খণ্ডঃ জীবনের রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি

(The Chemical and Molecular Basis of Life)

জীবনের রহস্য লুকিয়ে আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু, পরমাণু এবং জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। তাই জীবন বা জীবকে বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে জীবনের মৌলিক রাসায়নিক ও আণবিক ভিত্তি সম্পর্কে। জীবদেহ গঠিত হয়েছে বিভিন্ন পরমাণু, অণু এবং জৈব যৌগের সমন্বয়ে, যা একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই জীববিজ্ঞানের যেকোনো বিষয় গভীরভাবে বুঝতে এই ধারণাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‘আরিফ জীববিজ্ঞান’-এর প্রথম খণ্ড *“জীবনের রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি”* শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাবে জীবনের মৌলিক নির্মাণ উপাদানের জগতে। ১ম খণ্ডে জীববিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো, বিবর্তন, পরমাণু ও অণুর গঠন, রাসায়নিক বন্ধন, পানির বৈশিষ্ট্য, অম্ল-ক্ষার, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, এবং কোষে শক্তির ব্যবহার ও রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা কেবল তথ্য মুখস্থ না করে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক চিত্র, উদাহরণ, গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনীগুলতে চিন্তামূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও জটিলতার পেছনে যে রাসায়নিক ও আণবিক প্রক্রিয়াগুলো কাজ করে, সেই মৌলিক বিষয়গুলোর পরিচয় এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই উচ্চতর জীববিজ্ঞানের আরও বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নের জন্য এই বইটি একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। ‘আরিফ জীববিজ্ঞান’ জীববিজ্ঞানকে যুক্তি, অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের আলোকে বোঝার একটি পথপ্রদর্শক।

জীবদ্যুতি বা বায়োলুমিনেসেন্স (Bioluminescence) হলো জীবন্ত প্রাণীর শরীর থেকে যে ‘আলো’ তৈরি এবং নির্গমন হয়। সমুদ্রের গভীরতম অংশে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য এই আলো প্রাণীদের প্রধান ভরসা। গবেষকদের মতে, গভীর সমুদ্রের প্রায় ৭৫% থেকে ৭৬% প্রাণী নিজের আলো নিজেই তৈরি করতে পারে। পাশের ছবিতে দেখানো ‘জেলিফিশ (Jellyfish)’, যারা গভীর সমুদ্রের ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিজেদের শরীর থেকে উজ্জ্বল নীল আলো নির্গমন করে, বায়োলুমিনেসেন্স বা জীবদ্যুতির একটি চমৎকার বাস্তব উদাহরণ।

প্রশ্নঃ গভীর সমুদ্রের জীবদ্যুতি সাধারণত নীল বা নীলচে সবুজ রঙের হয়। কেন?

GGKEY:TN8GEZP8PXJ